আনুগত্যের শিরক সংক্রান্ত উৎকর্ষ বিবরণ
১ম খণ্ড

সংবিধানের বাস্তবতা

মূলঃ
শাইখ আবু আলী আল-আনবারী
আল-কুরাইশী (রহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদঃ
আবু ইবরাহীম আত-তামিমী

আনুগত্যের শিরক সংক্রান্ত উৎকর্ষ বিবরণ
১ম খণ্ড

সংবিধানের বাস্তবতা

মূলঃ শাইখ আবু আলী আল-আনবারী
আল-কুরাইশী (রহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদঃ আবু ইবরাহীম আত-তামিমী

البراعة في تبيان شرك الطاعة

للشيخ أبي علي الأنباري القريشي رحمه الله

المترجم: أبو إبراهيم التميمي

الناشر: مكتبة المنهل

محرم ١٤٤٥هـ

أغسطس ٢٠٢٣م

আনুগত্যের শিরক সংক্রান্ত উৎকর্ষ বিবরণ

১ম খণ্ড

সংবিধানের বাস্তবতা

মূলঃ শাইখ আবু আলী আল-আনবারী
আল-কুরাইশী (রহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদঃ আবু ইবরাহীম আত-তামিমী

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুল মানহাল

প্রথম প্রকাশঃ মুহাররাম ১৪৪৫ হিজরী আগস্ট ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

Excellent description of Shirk of obedience

by Abu Ali Al-Anbari Al-Qurashi

Translated by: Abu Ebrahim At-Tamimi

Published by: Maktabatul Manhal

Muharram 1445

August 2023

দৃষ্টি আকর্ষণঃ

মাকতাবাতুল মানহাল কর্তৃক প্রকাশিত বক্ষমান পুস্তিকাসহ অন্যান্য প্রকাশনাসমূহের টিকাসহ যেকোন প্রকার সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ব্যতীত যেকোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান দাওয়াহ'র উদ্দেশ্যে বিতরণ ও পরিবেশন করতে পারবে। সাথে সাথে ন্যায্যমূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ও করতে পারবে।

'মাকতাবাতুল মানহাল'

সূচিপত্রঃ

প্রকাশকের ভুমিকাঃ

الحَمْدُ لله ربِّ العٰلمِينَ والصّلاةُ والسّلامُ على خَاتمِ الأنبِيَاءِ والمُرسَلِينَ، قَالَ رَبُّنَا ﷻ : اِنِ الْحُكْمُ اِلا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلا تَعْبُدُوآ اِلا اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُوْنَ، أما بعد،

বিধান প্রণয়নের মালিক একমাত্র আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - আমাদের রব আমাদের আদেশ করেছেন আমরা যেন তারই ইবাদাত করি। পরিপূর্ণ শিরক মুক্ত হওয়া ব্যতীত কখনোই ইবাদাত এককভাবে আল্লাহর জন্য হবে না। সম্মানিত ভাই! উম্মাতে মুসলিমাহ বর্তমান যুগে যে ভয়াবহ ফিতনার সম্মুখীন তা হল - আনুগত্যের শিরক। আমাদের এই সময়ে আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক অনেক বিস্তৃত হয়েছে। এর থেকেও বড় আফসোসের বিষয় যে, মুসলিমগণ এব্যাপারে বড়ই গাফেল। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ আমাদের সঠিক পথের দিশা দিন! আমীন!

হালে শিরকের বিভিন্ন প্রকার নিয়ে কম-বেশি আলোচনা হয়, আলোচনা হয় অনেক কিছু নিয়েই। কিন্তু এই সিরিজে আমরা শিরকের যে প্রকার নিয়ে আলোচনা করব তা খুব বেশি আলোচিত হয় না। আমাদের আলোচনা আনুগত্যের শিরক সংক্রান্ত মাস'আলার ব্যাপারে। আনুগত্যের শিরক সংক্রান্ত উৎকর্ষ বিবরণ সিরিজের এই পর্ব সাজানো হয়েছে সংবিধান কেন্দ্রিক বিভিন্ন বিষয়বস্তু দিয়ে। সঙ্গত কারণেই বক্ষ্যমাণ বইটির নামকরণ করা হয়েছে 'সংবিধানের বাস্তবতা'। আনুগত্যের শিরক সংক্রান্ত উৎকর্ষ বিবরণ সিরিজটি মুজাহিদ শাইখ আবু আলী আল-আনবারী رَحِمَهُ الله -এর এক সুদীর্ঘ লেকচার সিরিজ। মাসুল শহরের এক শারয়ী ইনিষ্টিটিউটে তিনি আনুগত্যের শিরক নিয়ে ধারাবাহিক দারস দিয়েছেন।[1] বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমসাময়িক ফিতনা মোকাবেলায় 'মাকতাবাতুল মানহাল' কর্তৃপক্ষ আনুগত্যের শিরক সংক্রান্ত মাস'আলা-মাসাইল বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে–আলহামদুলিল্লাহ। আমি আশা করছি, আনুগত্যের শিরক সংক্রান্ত উৎকর্ষ বিবরণ সিরিজটি মোট চার খণ্ডে প্রকাশিত হবে–ইনশা'আল্লাহ!

[1] শাইখ رَحِمَهُ الله ১৪৩৫ হিজরীর শেষের দিকে এই দারসগুলো দিয়েছেন।

যার প্রথমটি সংবিধানের বাস্তবতা। এই সিরিজের শুরুতেই একটি ভূমিকা ছিল যা আমরা সংবিধানের বাস্তবতা আলোচনার পরে নিয়ে আসা সমীচীন মনে করেছি। আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা সৌভাগ্যবান যে, শাইখ আবু আলী আল-আনবারী رَحِمَهُ الله -এর মত একজন মহান শাইখের রেখে যাওয়া ইলমী খিদমত নিয়ে কাজ করছি। চমৎকার এক অনুভূতি—আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু যেন আমাদেরকে এই সিরিজটি সুহুলতের সাথে শেষ করার এবং উম্মাতে ইসলামীর জন্য অসংখ্য অগণিত ইলমী খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার তাওফীক্ব দান করেন।

আমার জানামতে, তাগুতী কুফরি সরকার ব্যবস্থার সংবিধান প্রসংঙ্গে বাংলায় এতটা বিস্তারিত, সাবলীল এবং বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপিত বই বা লেকচার অন্য আরেকটি নেই। এক কথায় অসাধারণ অনবদ্য একটি বই। এই বই পঠনের মাধ্যমে পাঠকবৃন্দ কুরআন-সুন্নাহ'র মানদণ্ডে সংবিধানের বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারবেন—ইনশা'আল্লাহ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের এই প্রচেষ্টা মুসলিমগণের শিরক থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে এবং ঈমান-আমল হেফাজতের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে—বি-ইযনিল্লাহ। আমি আশা করি, 'সংবিধানের বাস্তবতা' বইটি পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলবে, আলোড়ন সৃষ্টি করবে তাদের হৃদয় জগতে।

পরিশেষে বলতে চাই, অনুবাদ থেকে শুরু করে পাঠক পর্যন্ত পৌঁছে দিতে যে বা যারাই আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন। বিশেষভাবে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যেন তার শান অনুযায়ী এর অনুবাদককে উত্তম প্রতিদান দান করেন। আল্লাহ সুবহানাহু যেন আমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে এই ইলমী খিদমত চালিয়ে যাওয়ার তাওফীক্ব দান করেন, এগুলোকে আমাদের নাযাতের উসিলা বানান এবং এই কাজগুলোকে কবুল করে নেন। প্রিয় পাঠক! আপনি আপনার কল্যাণকর দু'আয় আমাদের ভুলবেন না।

আবু লাইছ আল-হিন্দী
মুহাররাম - ১৪৪৫ হিজরী
মাকতাবাতুল মানহাল

লেখক পরিচিতিঃ

নাম আব্দুর রহমান। তিনি আবু আলী আল-আনবারী নামে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ। এছাড়াও তার আরো একাধিক কুনিয়াত রয়েছে। যেমন আবু আলা, আব্দুল্লাহ রশীদ আল-বাগদাদী, আবু ছুহাইব আল-ইরাকী।

শাইখ আব্দুর রহমান ১২ ই রবিউল আওয়াল রোজ বৃহস্পতিবার ১৩৭৯ হিজরী মোতাবেক পহেলা অক্টোবর ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে নিনাওয়া প্রদেশের অন্তর্গত খারাইজ গ্রামে মুসলিম পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। শাইখ সরাসরি আহলে-বাইতের বংশের। তিনি হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবী তালিবের নাতী। শাইখ এক ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইসলামী রীতিনীতির উপর বেড়ে উঠেন। শাইখ رَحِمَهُ اللهُ চার বছর বয়স থেকে নিয়মিত সালাত আদায় করা শুরু করেন। শাইখ প্রাথমিক শিক্ষালাভ করার পর তেলআফারে ইসলামিক ইনিষ্টিটিউটে ভর্তি হন। অতঃপর সেখান থেকে সনদ লাভ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য বাগদাদের শারয়ী অনুষদে ভর্তি হন। তিনি সেই অনুষদ থেকে ১৪০২ হিজরী মোতাবেক ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে ডিগ্রীলাভ করেন। শাইখ رَحِمَهُ اللهُ শিক্ষা জীবন শেষ করে ইসলামী দাওয়াহ'র কাজে নিমগ্ন হন। পাশাপাশি তেলআফারে জামে মাসজিদের খতিব ছিলেন। শাইখ ইরাকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পরিপূর্ণভাবে জিহাদের কাজে শামিল হয়ে যান। তিনি ইরাকে মাজলিসু শুরাল-মুজাহিদীনের আমীর ছিলেন। এরপর ক্রুসেডারদের হাতে বন্দি হন এবং শাইখকে বিচারিক আদালতে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়। শাইখ দীর্ঘ সময় কারাগারে অবস্থান করেন। শাইখ কারাগারে থাকা অবস্থায় দাওয়াহ'র কাজ চালিয়ে যান। ইরাকের আবু গারিব এবং বুকা নামক কারাগারে শাইখকে রাখা হয়। দীর্ঘ ছয় বছর কারাগারে অবস্থান করার পর আল্লাহর অনুগ্রহে ২০ ই মার্চ ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণের মাধ্যমে আল্লাহ তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন।

শাইখ رَحِمَهُ اللهُ কারাগার থেকে বের হয়ে পুনরায় জিহাদের ময়দানে ফিরে যান। এর ফলে শামের মুসলিমদের সাহায্য করার জন্য তৎকালীন দাওলাতুল

ইসলামের আমীর তাকে দায়িত্ব দিয়ে শামে প্রেরণ করেন। শাইখ رَحِمَهُ الله দাওলাতুল ইসলামের বিভিন্ন দিওয়ানে দায়িত্ব পালন করেন। এর পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন মাসজিদে এবং ইনিষ্টিটিউটে দারস প্রদান করতেন। শাইখ তার পুরো সময় দ্বীনের কাজে ব্যায় করতেন।

শাইখ رَحِمَهُ الله রোজ বৃহস্পতিবার ১৩ ই জামাদিউল আখিরাহ ১৪৩৭ হিজরী মোতাবেক ২৪ ই মার্চ ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে ইরাক-সিরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে আমেরিকান বাহিনীর সাথে এক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন–আমরা তার ব্যাপারে এমনটাই মনে করি আর আল্লাহই তার হিসাব গ্রহণকারী। আল্লাহ শাইখকে ইল্লিয়্যীনে কবুক করুন! আমীন!

আনুগত্যের শিরক সংক্রান্ত উৎকর্ষ বিবরণ

শাইখ আবু আলী আল-আনবারী
আল-ক্কুরাইশী رحمه الله

প্রথম দারসঃ

আনুগত্যের শিরক

الحَمدُ للّه والصّلاةُ والسّلامُ على رسُولِ اللّه؛

হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে হক্বকে হক্ব হিসেবে দেখান এবং হক্ব অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করুন, বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখান এবং বাতিল বর্জন করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদের এমন বিষয় শিক্ষা দিন যা আমাদের উপকার করবে এবং আপনি আমাদের যা শিক্ষা দেন এর মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে আমাদের ইলম অনুযায়ী আমলকারী বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন আমাদের ইলমকে আমাদের জন্য দলিল বানিয়ে দিন এবং আমাদের বিরুদ্ধে দলিল বানাবেন না - - ইয়া আরহামার-রহিমীন! হে আমার রব! আপনি আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিন, আমার বিষয়াদি সহজ করে দিন এবং আমাদের মুখের জড়তা দূর করে দিন যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে। হে আল্লাহ আপনি আমার কর্মকে সৎ বানিয়ে দিন, আপনার সন্তুষ্টির জন্য খালিছ করে দিন এবং আপনার সৃষ্টির কারো জন্য এতে কোন অংশ রাখবেন না।

অতঃপর,

ইনশা'আল্লাহ আজ প্রথমে আমাদের আলোচনা হবে 'শিরকুত ত্বআহ' তথা আনুগত্যের শিরক সম্পর্কে। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাহায্য নিয়ে আমি বলি, আপনি যেমনটা জানেন যে, এই বিশেষণটি দুই অংশে গঠিতঃ শিরক এবং আনুগত্য। সুতরাং শিরকের পরিচয় কী? আনুগত্যের পরিচয় কী? এবং আনুগত্যের শিরকের পরিচয় কী?

শিরকের পরিচয়ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আল্লাহর রাসুল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেছেন, সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি? রাসুল ﷺ বলেছেন, "তুমি আল্লাহর জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করবে অথচ তিনি

তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।”[2] অংশীদারের অর্থ হচ্ছেঃ অনুরূপ, সদৃশ এবং সমকক্ষ। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে তার জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করল সে শিরক করল, যে ব্যক্তি আল্লাহর উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রে তার জন্য অংশীদার ও সমকক্ষ সাব্যস্ত করল সে শিরক করল এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম ও সিফাতসমূহের ক্ষেত্রে তার জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করল সে শিরক করল। সুতরাং এই হল শিরকের পরিচয়।

আনুগত্যঃ আরবদের নিকট এই শব্দের অর্থ হলঃ বশ্যতা স্বীকার করা এবং অনুগত হওয়া।

আনুগত্যের শিরকের পরিচয়ঃ গঠনকৃত সংবিধান ও আইনসমূহ এবং গোত্রীয় প্রথাসমূহকে স্বীকৃতি দেওয়া।

যে ব্যক্তি এই সকল সংবিধানকে এবং এই সংবিধানের অনুগামী আইনসমূহকে স্বীকৃতি দেয় যেগুলোর মাধ্যমে দেশ ও মানুষদের শাসন করা হয়, এমনিভাবে গোত্রীয় প্রথাসমূহকে স্বীকৃতি দেয় সে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাথে শিরক করল। এখানে শিরকের এ প্রকারকে বলা হয়ঃ আনুগত্যের শিরক। শিরকের এই প্রকারের ব্যাপারে দলিল পেশ করার পূর্বে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজনঃ

ক্বিয়ামতের দিন মানুষের আমলনামায় শিরকের উপস্থিতির মানে কী?

ক্বিয়ামতের দিন মানুষের আমলনামায় শিরকের বিদ্যমানতা তিনটি বিষয়কে আবশ্যক করেঃ

প্রথম বিষয়ঃ পাপের এই প্রকারটি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ক্ষমা করবেন না। এটা ক্ষমার অনুপযুক্ত একটি পাপ। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى সুরা নিসার এক আয়াতে বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যান্য

[2] মুত্তাফাক্বুন আলাইহি

অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন।”[3] সুতরাং শিরক ব্যতীত অন্য পাপ ক্ষমার উপযুক্ত ইচ্ছাধীন। আর শিরক আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর পক্ষ থেকে নিশ্চিতভাবেই ক্ষমার অনুপযুক্ত... “নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন।”[4] এটাই প্রথম বিষয়।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ মানুষের আমলনামায় শিরকের বিদ্যমানতার অর্থ হল - আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে এর থেকে রক্ষা করুন - মানুষের সকল আমলের প্রতিদান বিনষ্ট হওয়া।

অর্থাৎ যে মানুষ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাথে শিরক করে—দু’আর শিরক, আনুগত্যের শিরক, ভালবাসার শিরক, ইচ্ছা ও সঙ্কল্পের শিরক, সিফাত বিলুপ্তকরণের শিরক, সাদৃশ্যকরণের শিরক, শাফা’আতের শিরক, ভয়ের শিরক - আপনি এই শিরকগুলোর যেটার ইচ্ছা নাম নিন - যখন তার আমলনামায় কোন শিরক পাওয়া যাবে এবং তার অনেক আমল রয়েছে যেগুলো সৎকর্ম দ্বারা পরিপূর্ণ। যেমন ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তি সিয়াম পালন করত, সালাত আদায় করত, হজ্জ ও ওমরা পালন করত, বরং কখনো কখনো সে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাব হিফজ করে-এই সকল কাজের জন্য নেকি রয়েছে। কিন্তু শিরকের উপস্থিতি এই সকল আমলের প্রতিদান নষ্ট করে দিবে। এর দলিল আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাবে রয়েছে - যেমন সুরা আনআমে রয়েছে। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ১৮ জন নাবীর নাম উল্লেখ করেছেন। অতঃপর এই সকল বরকতময় নাম উল্লেখ করার শেষে তিনি বলেছেন,

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

“আর যদি তারা শিরক করত, তবে তারা যা আমল করেছিল তা অবশ্যই বিনষ্ট হয়ে

---

[3] সুরা নিসাঃ ৪৮

[4] সুরা নিসাঃ ৪৮

যেত।”[5] ‘বিনষ্ট হয়ে যাওয়া’—এর অর্থ হচ্ছে তাদের সকল আমলের প্রতিদান নষ্ট হয়ে যাবে। এমনিভাবে আল্লাহ তার রাসুল ﷺ -এর ব্যাপারে বলেছেন,

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾

“যদি আপনি শিরক করেন তবে আপনার সমস্ত আমল তো বিনষ্ট হবে এবং অবশ্যই আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।”[6] আল্লাহর নাবীগণের ব্যাপারে তো কল্পনাও করা যায় না যে, তারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাথে শিরক করবেন। আল্লাহর রাসুল ﷺ এর ব্যাপারেও তো কল্পনা করা যায় না যে, তিনি আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর সাথে শিরক করবেন; এটা কেবলমাত্র নাবীগণের মাধ্যমে উম্মাহ’কে সম্বোধন করা।

এই সকল আয়াত থেকে আমি যা উপলব্ধি করিঃ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর নিকট মানুষের যতই মর্যাদা হোক - যেমন নবুওয়াতের মর্যাদা এবং এছাড়া অন্যান্য মর্যাদা - যখন কোন শিরক পাওয়া যাবে তখন এই মর্যাদা কোন অবস্থাতেই মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকে সুপারিশ করবে না। শিরক এমন এক পাপ যা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ক্ষমা করেন না। এখানে প্রশ্ন আসে যে; আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى তো ন্যায়বিচারক। যখন এই মানুষ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাথে কোন প্রকার শিরক করবে উপরন্তু তার অনেক আমল রয়েছে যাতে ভালো আমল রয়েছে - যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি। সুতরাং এই সকল ভালো আমলের সাথে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর ন্যায়বিচার কেমন হবে? অথচ এই শিরক এই সকল আমলের প্রতিদান নষ্ট করে দিবে!

উত্তর আল্লাহর রাসুল ﷺ এর হাদিসে রয়েছে। তিনি বলেন, “কাফিরকে দুনিয়াতে তার ভালো কর্মের কারণে খাওয়ানো হয়। আর আখিরাতে তার এমন কোন ভালো কর্ম থাকবে না যার কারণে তাকে কল্যাণ দেওয়া হবে।”[7] অতএব এই

---

[5] সুরা আনআমঃ ৮৮

[6] সুরা যুমারঃ ৬৫

[7] সহীহ ইবনে হিব্বান

সকল ভালো কাজের মোকাবেলায় আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ফায়সালা দিয়েছেন যে, শিরক বিদ্যমান থাকার কারণে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য কোন অংশ থাকবে না। কিন্তু এই সকল ভালো কাজের মোকাবেলায় আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى তাকে দুনিয়ার বিষয়াদি বিনিময় হিসেবে দিবেন। সেটা কখনো সম্পদের ক্ষেত্রে হবে, কখনো স্ত্রীর ক্ষেত্রে হবে, কখনো স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে হবে এবং এছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে। বড় বিষয় হচ্ছে ক্বিয়ামতের দিন তার আমলনামায় তার কোন নেকি থাকবে না। কারণ শিরক আমলের প্রতিদানকে বাতিল করে দেয়। এটা হল দ্বিতীয় বিষয়।

তৃতীয় বিষয়ঃ যার আমলনামায় শিরক পাওয়া যাবে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা হারাম করেছেন। আয়াতে কারীমাতে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

“নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে আল্লাহ তার জন্য অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। আর জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।”[৪] “নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম।” আপনি জানেন যে, আখিরাতে দার বা আবাসস্থল হচ্ছে হয়তো স্বাচ্ছন্দ্যময় দার অথবা আযাব ও শাস্তির দার। অন্য আর কোন দার পাওয়া যায় না। সুতরাং যেহেতু আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এমন ব্যক্তির জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা হারাম করেছেন যার শিরকী কর্মকাণ্ড রয়েছে তাই তার জন্য কেবলমাত্র জাহান্নামই রয়েছে–ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্। “নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম।”[৯] সুতরাং আমরা যখন এই সকল আয়াতের ব্যাপারে জানতে পারব যেগুলো আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর নিকট মানুষের পরিণাম নির্ধারণ করে তখন শিরকের মাস’আলা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ও অনুসন্ধান

---

[৪] সুরা মায়িদাহঃ ৭২

[৯] সুরা মায়িদাহঃ ৭২

করা আমাদের জন্য আবশ্যক এবং শিরকের পরিভাষা, এর মাস'আলা ও এর সুক্ষ্ম বিষয়গুলো জানাও আবশ্যক হয়ে পড়ে। কারণ যখন আমি এই পাপ থেকে মুক্ত থাকব তখন অন্যান্য পাপ ক্ষমার যোগ্য হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমি শিরকে আকবার থেকে মুক্ত থাকব। বস্তুত আমার পুরো আলোচনা শিরকে আকবার কেন্দ্রীক। আমার আলোচনা শিরকে আসগারে প্রবেশ করবে না।

অতএব দু'আর শিরক সম্পর্কে আমার বিস্তারিত জানা উচিৎ, আমার বিস্তারিত জানা উচিৎ আনুগত্যের শিরক সম্পর্কে। এরপর আমি আমার নিজেকেই জিজ্ঞাসা করবঃ আমি কি এই সকল শিরক থেকে মুক্ত হয়েছি নাকি হইনি? কারণ মানুষ যখন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাথে শিরক না করা অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে অবশ্যই সে জাহান্নাম থেকে বের হবে। কেননা মানুষ কখনো কখনো পাপ ও অপরাধের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করে। কিন্তু সবশেষে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى তাদের উপর অনুগ্রহ করবেন এবং তারা বের হয়ে যাবে। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমার যেন কোন শিরক না থাকে। এমনকি যদি আমি জাহান্নামে প্রবেশ করি তাহলে আমি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর রহমতের মাধ্যমে অনুগ্রহপ্রাপ্ত হব, আমি জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকব না। এ পর্যায়ে শিরকের মাস'আলায় অনুসন্ধানের বিস্তারিত আলোচনা এবং এর মাস'আলা-মাসায়েলের ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। এখন আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ে উপনীত হচ্ছি।

আমরা বলেছিলাম, আনুগত্যের শিরক হলঃ স্বীকৃতি দেওয়া। যে ব্যক্তি এই সকল আইনকে স্বীকৃতি দিবে এবং এই সকল বিধানের জন্য এই স্বীকৃতি দিবে যে, এই সকল আইনে বিচার-ফায়সালা করা বৈধ অথবা এই সকল আইনে শাসন করা হবে–এই ব্যক্তি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাথে শিরক করল। এর দলিল আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর কিতাবে রয়েছে। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ সুরা আনআমে বলেন,

وَ لَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ وَ اِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰۤى اَوْلِيٰٓـِٕهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَ اِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ﴿۱۲۱﴾

“আর যাতে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়নি তা থেকে তোমরা ভক্ষণ কর না; নিশ্চয়ই তা ফিসক্ব তথা গর্হিত কাজ। নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা (ওহী) দেয়; আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক।”[10] এই আয়াতের বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে জরুরী হচ্ছে এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ জানা। কেননা নাযিল হওয়ার কারণ জানা আপনাকে এই আয়াত বুঝতে সাহায্য করবে।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণঃ ইমাম তিরমিযী رَحِمَهُ الله -এর বর্ণনায় রয়েছে তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস رَضِيَ الله عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, কিছু লোক নাবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমরা যা হত্যা করি তা ভক্ষণ করব অথচ আল্লাহ যেটাকে হত্যা করেছেন সেটা ভক্ষণ করব না?! অতঃপর আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ নাযিল করলেনঃ “আর যাতে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়নি তা থেকে তোমরা ভক্ষণ কর না।”[11]

ইবনে কাসীর এক বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, ইবনে আব্বাস رَضِيَ الله عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন এই আয়াত “আর যাতে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়নি তা থেকে তোমরা ভক্ষণ কর না” নাযিল হল তখন কিছু লোক নাবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল, তিনি বলেন, মাজুসীরা ক্বুরাইশদের বলল, তোমরা মুহাম্মাদের সাথে গিয়ে বিতর্ক করে বল, আপনি ছুরি দিয়ে যা যবেহ করেন তা হালাল। আর আল্লাহ যা যবেহ করেন -তারা মৃত উদ্দেশ্য করেছে- তা হারাম? অতঃপর আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ নাযিল করলেন, “নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা (ওহী) দেয়; আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক।”

---

[10] সুরা আনআমঃ ১২১

[11] ইমাম তিরমিযী এই হাদিস সম্পর্কে বলেন, হাসান গারীব। এগুলো ইমাম তিরমিযীর শব্দ। এমনিভাবে এ হাদিস ইমাম ইবনে আরাবী رَحِمَهُ الله একই শব্দে তার তাফসীরে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু আবি হাতিম رَحِمَهُ الله থেকে নাযিল হওয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে। তিনি সাঈদ ইবনে যুবাইর থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "ইহুদীরা নাবী ﷺ এর সাথে বিতর্ক করেছিল।" আবু দাউদের এক বর্ণনা সাঈদ ইবনে যুবাইর থেকে যুক্ত হয়ে ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, "ইহুদীরা নাবী ﷺ -এর সাথে বিতর্ক করেছিল।" অতএব আমাদের নিকট দুইটি বর্ণনা নতুন হিসেবে এসেছে যার ভাষ্য হচ্ছে - ইহুদীরা বিতর্ক করেছিল মাজুসীরা নয় তারা মক্কার মুশরিকদের শিক্ষা দিত।

ইবনে কাসীর رَحِمَهُ الله উক্ত বর্ণনার জবাব দিয়েছেন যার ভাষ্য হচ্ছে - ইহুদীরাই প্রশ্নের কারণ ছিল। তিনি বলেন, এ বিষয়টিতে তিন দিক থেকে ত্রুটি রয়েছে - অর্থাৎ ইহুদীরা নাবী ﷺ -এর সাথে বিতর্ক করেছিল। এই বিষয়টিতে তিন দিক থেকে ত্রুটি রয়েছেঃ

প্রথম দিকঃ ইহুদীরা মৃত বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করে। তাহলে কিভাবে তারা মৃত বস্তু সম্পর্কে নাবী ﷺ -এর সাথে বিতর্ক করবে? সুতরাং এটা সম্ভব নয় যে, ইহুদীরা এই বিষয়ে নাবী ﷺ -এর সাথে বিতর্ক করবে। এটা হল ইবনে কাসীরের প্রথম জবাব। দ্বিতীয় জবাবঃ তিনি বলেন, আয়াতটি মাক্কী - অর্থাৎ আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। আর আপনি জানেন যে, মক্কাতে–আল্লাহ একে মর্যাদাবান এবং সম্মানিত করুন- মক্কাতে একজন ইহুদীও পাওয়া যাবে না। অতঃপর ইবনে কাসীর رَحِمَهُ الله তৃতীয় কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, বর্ণনাটি তিরমিযী থেকে এ শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিছু মানুষ নাবী ﷺ -এর নিকট এসেছিল। তিনি ইহুদীদের কথা উল্লেখ করেননি।

এই তিনটি দিক উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, ত্ববারী - অর্থাৎ ইবনে জারীর আত-ত্বাবারী رَحِمَهُ الله ইবনে আব্বাস থেকে একাধিক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাতে ইহুদীদের কথা উল্লেখ নেই। অতঃপর ইবনে কাসীর বলেন, "এটাই সংরক্ষিত।" অতএব যারা এসেছিল তারা হল মাজুসীদের থেকে শিক্ষা নিয়ে আসা এবং তাদের থেকে উদ্দীপ্ত হয়ে আসা কুরাইশ।

নাযিল হওয়ার কারণঃ ইমাম শানক্বীতী رَحِمَهُ الله এব্যাপারে বলেন, আহলুল ইলমগণের মধ্য থেকে যাদের গণ্য করা হয় তারা একমত হয়েছেন যে, নাযিল হওয়ার কারণ হল - তিনি নাযিল হওয়ার কারণ উল্লেখ করেছেন যে, কিছু লোক নাবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল,...- অতঃপর আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ নাযিল করেছেন, "আর যাতে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়নি তা থেকে তোমরা ভক্ষণ কর না।" সুতরাং আলেমগণের ইজমা হল এটা এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ। কেননা মুশরিকরা আল্লাহর রাসুল ﷺ কে বলেছিল, আপনারা যবেহ করেন এমন বকরী কিভাবে ভক্ষণ করেন অথচ আল্লাহ হত্যা করেন এমন বকরী আপনারা ভক্ষণ করেন না? অতঃপর আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى নাযিল করেছেন, "আর যাতে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়নি তা থেকে তোমরা ভক্ষণ কর না।" সুতরাং এখন আয়াতের সূচনায় আপনি জানতে পারলেন, আয়াতটি দু'টি বিধানের ইঙ্গিত করেঃ

আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বিধানঃ "আর যাতে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়নি তা থেকে তোমরা ভক্ষণ কর না।" আর জাহিলী বিধান যা মক্কায় সার্বভৌম ছিলঃ তারা মৃত বস্তু ভক্ষণ করত। এটা মুশরিকদের বিধান। তার নিকট এখন দুইটি শারীয়াহ তথা বিধান রয়েছেঃ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শারীয়াহঃ "আর যাতে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়নি তা থেকে তোমরা ভক্ষণ কর না।" এবং মুশরিকদের শারীয়াহঃ তোমরা মৃত বস্তু ভক্ষণ কর। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى আমাদের নিষেধ করেছেন অতঃপর তিনি ঐ ব্যক্তির অবস্থা উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর বিধান অমান্য করে এবং মুশরিকদের বিধানের আনুগত্য করে। যে ব্যক্তি এই বিপরীত বিধানের আনুগত্য করে তার অবস্থা কী?

আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেছেন, "নিশ্চয়ই তা ফিসক্ব তথা গর্হিত কাজ।" অর্থাৎ তোমরা আমার বিধান অমান্য করেছো এবং মুশরিকদের বিধান মেনে মৃত বস্তু ভক্ষণ করেছো। তোমাদের এই কাজ ফিসক্ব... "নিশ্চয়ই তা ফিসক্ব তথা গর্হিত কাজ।" **আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র আলেমগণের নিকট ফিসক্বের অর্থ হলঃ**

ইয ইবনে আব্দুস সালাম رَحِمَهُ الله তার তাফসীরে বলেন, "ফিসক্ব হল পাপ

অথবা কুফর।” পাপ অথবা কুফর ইবনে জারীর رَحِمَهُ الله তার তাফসীরে এমনটিই বলেছেন।

ইমাম কুরতুবী رَحِمَهُ الله তার তাফসীরে বলেছেন, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে নকল করেছেন। তিনি বলেছেন, “ফিসক্ব হল পাপ।” তার থেকে অন্য আরেকটি বর্ণনা রয়েছেঃ ফিসক্ব হল ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া।

ইমাম শানক্বীতী رَحِمَهُ الله তার তাফসীরে সুরা শুরার ব্যাখ্যায় ফিসক্বের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, “ফিসক্ব হচ্ছেঃ আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং শয়তানের বিধানের অনুসরণ করা।”

অতএব যে ফলাফল বের হল তা হচ্ছেঃ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’র আলেমগণ ফিসক্ব সম্পর্কে বলেছেন, তা পাপ অথবা কুফর। সুতরাং এই শব্দের এই ব্যাখ্যা কেন? আর কেনইবা তা কখনো পাপ এবং কখনো কুফর? কারণ হল ফিসক্ব দুই ভাগে বিভক্তঃ

হয়তো ফিসক্বে আসগার তথা ছোট ফিসক্ব হবে যা ফিসক্ব সম্পাদনকারীকে মিল্লাহ থেকে বের করে দেয় না। নতুবা ফিসক্বে আকবার তথা বড় ফিসক্ব যা ফিসক্ব সম্পাদনকারীকে মিল্লাহ থেকে বের করে দেয়। ফিসক্বে আসগারের দলিল আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাবে সুরা বাকারায় আয়াতুদ-দাইন তথা ২৮২ নং আয়াতে রয়েছে। তিনি বলেন,

﴿وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۬ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ﴾

“আর কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতি করা হবে না। আর যদি তোমরা (ক্ষতি) কর, তবে তা হবে তোমাদের জন্য গুনাহের কাজ।” এই আয়াতের ব্যাখ্যা হলঃ কোন ব্যক্তি যখন অন্য আরেক ব্যক্তিকে ঋণ দিবে এবং তারা একজন কাতেব ও দুইজন সাক্ষী নিয়ে আসবে - আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেন, ঋণদাতা এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য জায়েয নেই যে, তারা কাতেবের ক্ষতি করবে অথবা দুই সাক্ষীর মধ্য থেকে কারো ক্ষতি করবে।

আর যদি তারা ক্ষতি করে? তিনি বলেন, যখন তোমরা কাতেবের অথবা সাক্ষীর ক্ষতি করবে তখন তোমাদের এই কাজ ফিসক্ব হবে। নিশ্চিতভাবেই এই ফিসক্ব–ফিসক্ব সম্পাদনকারীকে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের করে দিবে না। তাহলে এই প্রকার ফিসক্বকে কী হিসেবে অভিহিত করা হবে? ফিসক্বে আসগার হিসেবে অভিহিত করা হবে। আর ফিসক্বে আকবারের দলিল হল আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর বাণীঃ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَ ذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِىْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿۵۰﴾

"আর স্মরণ করুন, যখন আমরা ফিরিস্তাদেরকে বলেছিলাম, সিজদা কর আদমকে, তখন ইবলীস ব্যতীত তারা সবাই সিজদা করল ; সে ছিল জ্বীনদের একজন আর সে তার রবের আদেশ অমান্য করল। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু। জালিমদের বিনিময় কতই না নিকৃষ্ট!"[12]

ইবলীস যখন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর অবাধ্য হল এবং আদমকে সিজদা করার ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করল না তখন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তার পাপকে ফিসক্ব হিসেবে অভিহিত করলেন; ফিসক্বের এই প্রকারটি ফিসক্ব সম্পাদনকারীকে মিল্লাহ থেকে বের করে দেয়। অতএব ফিসক্ব কখনো পাপ হয় অথবা ফিসক্ব কখনো এমন কাজ হয় যা মিল্লাহ থেকে বের করে দেয়।

আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট মৃত বস্তুর মাস'আলা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলামঃ এক লোক এসে মৃত বস্তু থেকে ভক্ষণ করল এবং বলল, আমি জানি যে, আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তা হারাম করেছেন। তার এই ফিসক্ব–ফিসক্বে আসগার, সে কবিরাহ গুনাহ সম্পাদনকারী। কেন? কারণ সে হারাম স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু সে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আদেশের অবাধ্যতা করে তা ভক্ষণ করে। এটাই ফিসক্বে আসগার বা ছোট

[12] সুরা কাহাফঃ ৫০

পাপ। অন্য আরেক লোক মৃত বস্তু থেকে ভক্ষণ করেনি। কিন্তু সে বলল, মৃত বস্তু ভক্ষণ করা হালাল। এটা মিল্লাহ থেকে বের করে দেয়। কেন? কারণ সে এমন বিষয়কে হালাল করেছে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যা হারাম করেছেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র নিকট মূলনীতি হচ্ছে যা ইমাম ত্বহাবী رَحِمَهُ الله তার আক্বীদাহ'তে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "আমরা আহলুল ক্বিবলাহ'র কাউকে কোন গুনাহের কারণে তাকফীর করি না যতক্ষণ না সে এটাকে হালাল মনে করে।"

আমরা পাপের নিকট আসি। মুসলিম যখন এই সকল পাপ সম্পাদন করে তখন সে ইসলামের গণ্ডির মধ্যে থাকে। তবে তার মাঝে ফিসক্ব রয়েছে। আর যখন সে হালালকে হারাম বলবে অথবা হারামকে হালাল বলবে তখন এই ব্যক্তি মিল্লাহ থেকে বের হয়ে যাবে। কারণ সে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর বিধান অমান্য করল এবং এমন বিধান নিয়ে আসল যা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বিধানের বিপরীত।

আর আবু মুহাম্মাদ আল-মাক্বদিসী এই মূলনীতির সাথে একটি শর্ত যুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, "আমরা আহলুল ক্বিবলাহ'র কাউকে 'কাফির সাব্যস্ত করে না' এমন কোন গুনাহের কারণে তাকফীর করি না যতক্ষণ না সে এটাকে হালাল মনে করে।" আমরা যখন স্বল্প পরিসরে বিশ্লেষণে যাব তখন এই শর্তের ফায়েদা উল্লেখ করব–ইনশা'আল্লাহ।

অতএব "নিশ্চয়ই তা ফিসক্ব তথা গর্হিত কাজ।"[13] এখন যে ব্যক্তি গঠনকৃত আইন ও সংবিধান দ্বারা শাসন করার ব্যাপারে সম্মতি দেয়–তার ফিসক্ব কি ফিসক্বে আসগার নাকি ফিসক্বে আকবার? এটা ফিসক্বে আকবার; এর দলিল আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণী। তিনি বলেন, "আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক।"[14] আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাকে শিরকের হুকুম দিয়েছেন। আর আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى যাকে শিরকের হুকুম দেন তার শিরক

[13] সুরা আনআমঃ ১২১

[14] সুরা আনআমঃ ১২১

শিরকে আসগার নয়। **এটা হল প্রথম দলিল।**

অন্য আরেকটি দলিল হলঃ যে ব্যক্তি এই সকল গঠনকৃত আইনকে স্বীকৃতি দেয় সে এই সকল আইন প্রণয়নকারীদেরকে আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** -এর জন্য সমকক্ষ সাব্যস্ত করল। কিভাবে?

বিধান প্রণয়ন করা আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** -এর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** ব্যতীত অন্য কারো জন্য কোন বিধান প্রণয়ন করা জায়েয নেই; এর দলিল সুরা ইউসুফের ৪০ নং আয়াতে রয়েছে। আল্লাহ **تَبَارَكَ وَتَعَالَى** বলেন,

﴿اِنِ الْحُكْمُ اِلا لِلّٰهِ ۚ اَمَرَ اَلا تَعْبُدُوٓا اِلا اِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُوْنَ﴾

“বিধান দেয়ার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, কেবলমাত্র তারই ইবাদাত করতে, এটাই সুদৃঢ় দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না।” আল্লাহ তা’আলার অনুমতিক্রমে আমরা সামনে এই আয়াতের বিস্তারিত আলোচনা করব।

অতএব এই আয়াতটি আইন প্রণয়নকে আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** -এর সাথে খাছ করে দিয়েছে। তাই আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** ব্যতীত অন্য কারো জন্য আইন প্রণয়ন করা জায়েয নেই। যখন সংবিধান প্রণয়ন কমিটি একটি সংবিধান প্রণয়ন করে আর একজন মানুষ এই সংবিধানের ব্যাপারে সম্মতি দেয় তখন সে সংবিধান প্রণয়নকারীদেরকে ইলাহ তথা উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে; কারণ আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন করে একজন ইলাহ। হয়তো তিনি হবেন আমাদের রব অথবা যে আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** -এর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য থেকে একটি বৈশিষ্ট্য তার নিজের জন্য প্রদান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** -এর বিধানকে স্বীকৃতি দেয় এবং মানব রচিত আইনকে স্বীকৃতি দেয় সে তার নিজের জন্য দুইজন ইলাহ নির্ধারণ করল। আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** কে তার আইনের ক্ষেত্রে এবং ঐ সকল লোকদেরকে তাদের আইন ও তাদের সংবিধানের ক্ষেত্রে; এখানেই তার কাজটি ফিসক্বে আকবার হবে যা মিল্লাহ থেকে বের করে দেয়। বাকি বিস্তারিত ব্যাখ্যা ইনশা’আল্লাহু তা’আলা আমাদের বৈঠকগুলোতে

আলোচনা করব।

অতএব “নিশ্চয়ই তা ফিসক্ব তথা গর্হিত কাজ।” অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, “নিশ্চয়ই শয়তানরা।” তাহলে এখানে ‘শয়তানরা’ দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

কুরতুবী رَحِمَهُاللهُ উল্লেখ করেছেন, ইকরামা رَحِمَهُاللهُ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “এখানে শয়তানরা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ পারস্যের অগ্নিপূজারী মানুষ উদ্দেশ্য।” ইবনে আব্বাস رَضِيَاللهُعَنْهُما থেকে অন্য আরেকটি রিওয়াতে উল্লেখিত হয়েছে তিনি বলেছেন, “এখানে শয়তানরা উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ জ্বীন।”

এখানে শয়তানকে মানুষ শয়তান এবং জ্বীন শয়তানের মাঝে আরোপ করার ক্ষেত্রে এই বৈপরীত্য কেন? কারণ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এই দুই শ্রেণীকে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন,

﴿شَيٰطِيۡنَ الۡاِنۡسِ وَ الۡجِنِّ يُوۡحِيۡ بَعۡضُهُمۡ اِلٰى بَعۡضٍ زُخۡرُفَ الۡقَوۡلِ غُرُوۡرًا ؕ﴾

“মানব ও জ্বীনের মধ্য থেকে শয়তানরা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চমকপ্রদ বাক্যের কুমন্ত্রণা দেয়।”[15] অতএব এখানে শয়তান মানুষ হবে এবং শয়তান জ্বীনও হবে।

আর ত্ববারী رَحِمَهُاللهُ তার তাফসীরে বলেন, “এক্ষেত্রে এটা বলা সঠিক যে, মানুষ শয়তানরা তাদের মানুষ বন্ধুদের নিকট ওহী করে এবং এটা বলাও বৈধ যে, জ্বীন শয়তানরা মানুষের নিকট ওহী করে।” তাহলে কী স্পষ্ট হল?

মানুষ শয়তানরা মানুষের নিকট ওহী করে। আর জ্বীন শয়তানরাও মানুষের নিকট ওহী করে। তিনি বলেন, “বিষয়টি দুই শ্রেণীর থেকেই হওয়া সম্ভব।” অর্থাৎ জ্বীন শয়তানরা ও মানুষ শয়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট ওহী করে।

অতএব এই আয়াতে কারীমায় শয়তান দ্বারা উদ্দেশ্য কী–তা আমরা জানলাম। অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, “তারা প্ররোচনা (ওহী) দেয়।” অর্থাৎ

---

[15] সুরা আনআমঃ ১১২

শয়তানরা ওহী করে “তাদের বন্ধুদেরকে।” আওলিয়া তথা বন্ধুঃ তারা সাহায্যকারী এবং মুহাব্বাতকারী। ওয়ালী হলঃ সাহায্যকারী এবং মুহাব্বাতকারী। আর এখানে শয়তানের পক্ষ থেকে তার বন্ধুদের নিকট ওহী করার অর্থ হলঃ

ওহী শব্দটি যেমন ‘মুখতার আছ-ছিহাহ’এ এসেছে - আর আপনি যেমনটি জানেন, এটা আরবী ভাষার একটি ডিকশনারি - লেখক বলেন, “ওহী হলঃ এলহাম পাঠানো তথা অন্তরে অনুপ্রেরণা দেওয়া অথবা গোপনে যে কথা বলা হয় সেটাকেও ওহী হিসেবে অভিহিত করা হয়।”

এই অর্থে ওহী দুই ভাগে বিভক্তঃ আল্লাহ প্রদত্ত ওহী যা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর পক্ষ থেকে তার সৃষ্টির মধ্যে যার নিকট ইচ্ছা করেন। শয়তানী ওহী যা শয়তানের পক্ষ থেকে তার বন্ধুদের নিকট করা হয়। এর দলিল কী?

আল্লাহ প্রদত্ত ওহী সম্পর্কে যা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর পক্ষ থেকে তার বান্দাদের মধ্যে যার নিকট ইচ্ছা ওহী করেনঃ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর পক্ষ থেকে নাবী ও রাসুলগণের নিকট ওহী করা। যেমন আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর বাণীতে রয়েছেঃ

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ ﴿﴾

“নিশ্চয়ই আমরা আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম যেমন নুহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম। আর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম।”[16] এটাকে কী হিসেবে অভিহিত করা হবে? এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাবী ও রাসুলগণের নিকট আল্লাহ প্রদত্ত ওহী।

কিন্তু কখনো কখনো আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ নাবীগণ ব্যতীত অন্যের নিকট ওহী করেন। যেমন আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর বাণীতে রয়েছেঃ

[16] সুরা নিসাঃ ১৬৩

﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي﴾

"আরো স্মরণ করুন, যখন আমি হাওয়ারীদের মনে ইলহাম করেছিলাম, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসুলের প্রতি ঈমান আনো।"[17] হাওয়ারিয়্যুন হল ঐ সকল লোক যারা আল্লাহর নাবী ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام -এর ঘনিষ্ঠ ছিল। ফলে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ঐ সকল লোকদের নিকট ওহী করলেন যে, তোমরা আমার প্রতি এবং আমার রাসুলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর। ওহীর অর্থ কী? অর্থাৎ আল্লাহ তাদের অন্তরে এই কথা নিক্ষেপ করেছিলেন।

এখানে তৃতীয় আরেক প্রকার ওহী আছে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কতিপয় সৃষ্টির নিকট করা হয়। যেমন সুরা নাহালের ৬৮ নং আয়াতে রয়েছেঃ

﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾

"আর আপনার রব মৌমাছিকে তার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন যে, ঘর তৈরী কর পাহাড়ে।" এটা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর পক্ষ থেকে এই মাখলুকের প্রতি একটি নির্দেশ। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এটাকে ওহী হিসেবে অভিহিত করেছেন। অতএব আল্লাহ প্রদত্ত ওহী হল আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর পক্ষ থেকে তার সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা ওহী করেন।

ওহীর দ্বিতীয় প্রকারঃ শয়তানের পক্ষ থেকে তার বন্ধুদের নিকট ওহী করা। এর দলিল হল আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণীঃ "নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্ররোচনা (ওহী) দেয়।"[18] এমনিভাবে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণীঃ "মানব ও জ্বীনের মধ্য থেকে শয়তানরা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চমকপ্রদ বাক্যের কুমন্ত্রণা দেয়।"[19]

কিছু মানুষ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -এর নিকট এসে বলল, মুখতার আস

[17] সুরা মায়িদাহঃ ১১১

[18] সুরা আনআমঃ ১২১

[19] সুরা আনআমঃ ১১২

-সাক্বাফী দাবি করে তার নিকট ওহী আসে। এই মুখতার আস-সাক্বাফী উবাইদ আস-সাক্বাফীর পুত্র। তার পিতা ক্বাদিসীয়্যাহ'র ময়দানে সেতুর যুদ্ধের সেনাপতি ছিল - কিন্তু এরপর সে হুসাইনের প্রতিশোধ চাইতে বের হয়েছিল। অতঃপর সে নবুওয়াতের দাবি করে। তাই সে দাবি করত তার নিকট ওহী আসে। ফলে ইবনে আব্বাস বললেন, "হ্যাঁ"। অর্থাৎঃ এটা সঠিক যে, মুখতার আস-সাক্বাফীর নিকট ওহী আসে। অতঃপর তিনি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর বাণী তিলাওয়াত করলেন,

﴿وَإِنَّ الشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِهِمۡ﴾

"নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্ররোচনা (ওহী) দেয়।"

শয়তানের মাঝে এবং এই সকল লোকদের মাঝে এই বন্ধুত্ব কিভাবে প্রতিষ্ঠা হয়?; কারণ শয়তান যখন মানুষের কোন দলকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে অথবা যখন তারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তখন এই সকল লোকদের উপর শয়তানের একটি কর্তৃত্ব এবং প্রভাব তৈরি হয়। তাহলে শয়তানের প্রবেশের দরজা কী—যার মাধ্যমে কিছু মানুষ শয়তানের বন্ধু হয়?

এখানে শয়তানের সম্ভাব্য চারটি দরজা রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে সে কতিপয় মানুষের নিকট প্রবেশ করে এবং তাদেরকে বন্ধু বানায়ঃ

প্রথম দরজাঃ যখন ঈমানের মধ্যে কোন ফাঁটল থাকে। এটা একটি প্রশস্ত দরজা যা দিয়ে শয়তান ঐ সকল লোকদের নিকট প্রবেশ করে এবং তাদেরকে তার বন্ধু বানায়। ঈমানের মধ্যে কোন ফাঁটল অথবা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর উপর ভরসা করার মধ্যে কোন ফাঁটল অথবা ঈমান ও তাওয়াক্কুলের মধ্যে কোন ফাঁটল...এগুলো হচ্ছে শয়তানের প্রবেশদ্বার; ঈমানের মধ্যে কোন ফাঁটল, তাওয়াক্কুলের মধ্যে কোন ফাঁটল, ঈমান ও তাওয়াক্কুলের মধ্যে কোন ফাঁটল। চতুর্থ দরজাঃ যখন মানুষের মাঝে কোন শিরক পাওয়া যায়। আর এটা শয়তানের জন্য একটি প্রশস্ত দরজা যা দিয়ে সে প্রবেশ করে এই ব্যক্তিদেরকে তার বন্ধু বানায়। পঞ্চম দরজাঃ পাপ এবং অবাধ্যতা শয়তানের একটি দরজা যা দিয়ে সে এই সকল লোকদেরকে বন্ধু বানায়। এই কথাগুলোর দলিল কী যা আমি বললাম?

আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى শয়তান সম্পর্কে বলেন,

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ إِنَّمَا سُلْطَٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ ۝

“নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের উপর ভরসা করেছে, তাদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই। তার আধিপত্য তো শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে।”[20] যখন সে ঈমান খুঁজে পাবে তখন মানুষ শয়তানের বন্ধু হওয়ার ব্যাপারে তা একটি বাধা হবে। যখন সে বিশুদ্ধ তাওয়াক্কুল খুঁজে পাবে... তখন মানুষ শয়তানের বন্ধু হওয়ার ব্যাপারে তা একটি বাধা হবে; যখন এ বিষয় দু'টি বাস্তবায়িত হবে তখন মানুষ শয়তানের বন্ধু হওয়া সম্ভব হবে না। এমনিভাবে যখন মানুষের থেকে শিরক দূর হয়ে যাবে তখন সে শয়তানের বন্ধু হওয়া অসম্ভব। এ হল চারটি মাধ্যম।

পঞ্চম মাধ্যমঃ আমি যেমন উল্লেখ করেছিলাম পাপ এবং অবাধ্যতা শয়তানের দরজাসমূহের মধ্য থেকে একটি দরজা। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণীঃ

﴿فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

“কিন্তু শয়তান তাদের কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সজ্জিত করেছিল; কাজেই সে-ই আজ তাদের বন্ধু আর তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।”[21] অতএব পাপ ও অবাধ্যতার মাধ্যমে শয়তান প্রবেশ করে। সে একটি পাপ কাজ করে অতঃপর সে মনে করে যে, যেই পাপ সে নিয়ে এসেছে তা গ্রহণযোগ্য ও বিশুদ্ধ আমল এবং সে এর প্রশংসা করে। এই সকল লোকদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে তারা শয়তানের বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যে শারীয়াহ বিরোধী কোন মুনকার বা মন্দ কাজ সম্পাদন করে অতঃপর সে মনে করে এই শারীয়াহ বিরোধী কাজটি গ্রহণযোগ্য

---

[20] সুরা নাহলঃ ৯৯-১০০

[21] সুরা নাহলঃ ৬৩

সজ্জিত এই ব্যক্তিই শয়তানের বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত।

তাহলে আপনি জেনেছেন যে, শয়তান ওহী করে, আপনি জেনেছেন যে, শয়তানের বন্ধু আছে এবং আপনি আরো জেনেছেন যে, শয়তান কিভাবে বন্ধু বানায়।

এরপর আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى এই আয়াতে আলোচনা করেছেন শয়তানরা কেন তাদের বন্ধুদের নিকট ওহী পাঠায়? আর এই ওহীর উদ্দেশ্যই-বা কী? আল্লাহ বলেছেন, "لِيُجَادِلُوكُمْ" "তারা যেন তোমাদের সাথে বিবাদ করে।" আপনি যেমন জানেন, এখানে "لام" অব্যয়টি কারণ বর্ণনা করার জন্য।

"لِيُجَادِلُوكُمْ" 'মুখতার আছ-ছিহাহ'এ "جدال" শব্দের অর্থ রয়েছে - লেকখ বলেন, "جدل" হচ্ছে প্রচণ্ড বিতর্ক করা।

ইমাম কুরতুবী رَحِمَهُ اللهُ "جدال" এর পরিচয় এরকমভাবেই দিয়েছেন। তিনি বলেন, "প্রমাণ এবং শক্তির মাধ্যমে কথা প্রতিরোধ করা।" এই উক্তির অর্থ কী?

হয়তো লোকটি হক্বপন্থী হবে অথবা বাতিলপন্থী হবে। যখন তাদের একজন হক্বপন্থী তার সঙ্গীকে প্রতিরোধ করতে চায় তখন সে বাতিলপন্থীকে প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিরোধ করতে চায়। এরপর শক্তির মাধ্যমে। এটাকে বিতর্ক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এমনিভাবে যখন বাতিলপন্থী হক্বপন্থীকে প্রমাণ অথবা শক্তি দ্বারা প্রতিরোধ করতে চায় তখন এটাকেও বিতর্ক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

অতএব "جدال" তথা বিতর্ক বিশেষণটি উত্তম বিতর্ক এবং নিকৃষ্ট বিতর্কের মাঝে যৌথ একটি শব্দ। সুতরাং বিতর্ক বিশেষণটি উত্তম বিতর্কের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এবং নিকৃষ্ট বিতর্কের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। এই ভাগকরণের ব্যাপারে দলিল কী?

"উত্তম বিতর্কঃ" আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেন,

﴿اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ﴾

"আপনি আপনার রবের পথে হিকমাহ ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করুন

এবং উত্তম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করুন।”[22]

অতএব উত্তম বিতর্ক হচ্ছে আপনি প্রমাণের মাধ্যমে তাদের কথা প্রতিরোধ করবেন। এরপর যখন বিষয়টি তলব করা হবে তখন আপনি শক্তির মাধ্যমে প্রতিরোধ করবেন এমনটিই আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন,

﴿وَ لَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ﴾

“আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না।”[23]

রাসুল ﷺ কি প্রমাণ এবং শক্তির মাধ্যমে তার নিকট থাকা হক্বের জন্য মুশরিকদের বাতিলের প্রতিরোধ করেছিলেন? হ্যাঁ। তের বছর তিনি মক্কার মুশরিকদেরকে প্রমাণের মাধ্যমে দাওয়াহ দিয়েছেন। অতঃপর হিজরতের পর আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাকে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন। ফলে তিনি শক্তির মাধ্যমে ঐ বাতিলকে প্রতিরোধ করা শুরু করেছেন; সুতরাং আমরা মুসলিমরা সীমাবদ্ধ নই। আমরা বাতিল প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার উপর সীমাবদ্ধ নই। এরপর বিষয়টি যখন এ দাবি করবে যে, উক্ত বাতিল প্রতিরোধ করার জন্য আমরা শক্তির শরণাপন্ন হব তখন আমাদের জন্য এটা জায়েয। কারণ এটা আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর কর্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। অতএব উত্তম বিতর্ক হচ্ছে হক্বপন্থী বাতিলপন্থীকে প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিরোধ করবে অতঃপর যখন বিষয়টি আরো তলব করবে তখন শক্তির মাধ্যমে প্রতিরোধ করা হবে।

নিন্দিত নিকৃষ্ট বিতর্কঃ তা হচ্ছে বাতিলপন্থী এসে তার বাতিলের মাধ্যমে হক্বপন্থীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। অতএব এই সকল বাতিলপন্থীদের কাজ - যখন তারা হক্বকে প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিরোধ করবে অথবা তারা শক্তির মাধ্যমে হক্বকে প্রতিরোধ করবে তখন তাদের কাজকেও বিতর্ক হিসেবে নামকরণ করা হয়।

---

[22] সুরা নাহলঃ ১২৫

[23] সুরা আনকাবুতঃ ৪৬

এর দলিল আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাবে সুরা কাহাফের ৫৬ নং আয়াতে রয়েছে। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾

"কিন্তু কাফিররা বাতিল দ্বারা বিতর্ক করে, যাতে তার মাধ্যমে সত্যকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।" এমনিভাবে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

﴿وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾

"প্রত্যেক উম্মত নিজ নিজ রাসুলকে পাকড়াও করার সংকল্প করেছিল এবং তারা অসার তর্কে লিপ্ত হয়েছিল যেন এর দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করতে পারে।"[24]

অতএব হয়তো সেটা উত্তম বিতর্ক হবে–আপনি হক্বের জন্য বাতিলকে প্রতিরোধ করবেন অথবা সেটা বাতিল বিতর্ক হবে–সে বাতিলের জন্য হক্বকে প্রতিরোধ করবে।

এটা বর্তমানে এই ভূমিতে ঘটছে। আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদগণ আমরা যে হক্বের উপর রয়েছি সে ব্যাপারে তারা প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমাদের অভিপ্রায় হচ্ছে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শারীয়াহ দ্বারা শাসন করা এবং কেবল আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হওয়া। এব্যাপারে তারা প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতঃপর তারা প্রমাণ প্রতিষ্ঠার সাথে শক্তি যুক্ত করেছেন। তাদের নিকট যা আছে তা দিয়ে তারা বাতিলকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছেন। অতএব তারা উত্তম পন্থায় বিতর্ক করেছেন। এমনিভাবে এর বিপরীতে বাতিলপন্থীরা তাদের বাতিলের ব্যাপারে প্রমাণ দিয়ে এবং শক্তির মাধ্যমে বিতর্ক করে। প্রমাণ হচ্ছেঃ শাসকদের উলামাদের এবং মিডিয়ার আলেমদের মাধ্যমে। তাই আপনি তাদের কাউকে দেখতে পাবেন, আমাদের নগরীতে তাদের দুইজন রয়েছেঃ আবু হারিছ এবং আবু সফওয়াহ। তারা বাতিলের জন্য হক্বকে প্রতিহত করতে চায়। কিভাবে?

---

[24] সুরা গাফিরঃ ০৫

তারা মনে করে এই সকল তাগুতরা হচ্ছে উমারা তথা শাসক। আর তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব। ঐ সময়ে ছিল আয়াদ আল্লাভী এবং আয়াদ আল্লাভী ছারাও অন্যরা। মুরজিয়ারা বলত, এই লোকদের আনুগত্য করা ওয়াজিব। অতঃপর তারা এর সাথে সংযুক্ত করে বলত, প্রতিরক্ষা এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাকে সৈনিক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে তাদের মুজাহিদ ও মুরাবিত তথা রিবাতকারী হিসেবে গণ্য করা হবে! আর যারা এই সকল শাসকদের বিরুদ্ধে বের হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করে তাদেরকে খারিজি হিসেবে অভিহিত করা হবে।

আমরা যখন মুরজিয়াদের সম্পর্কে আলোচনা করব তখন আল্লাহর অনুমতিক্রমে বিস্তারিত আলোচনা করব। কিন্তু এখন আমাদের বিষয় হচ্ছে এটা প্রমাণ করা যে, বাতিলপন্থীরা হক্বপন্থীদেরকে প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে এরপর শক্তির মাধ্যমে।

তাই তারা বলে, শাসকদের আনুগত্য করা ওয়াজিব। এই সকল শাসকদের সৈনিক ও পুলিশরা আল্লাহর রাস্তার মুরাবিত বা পাহারাদার। আর যারা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে বের হয় তারা হচ্ছে খারিজি। অতঃপর তারা বলে, এই সৈন্যবাহিনী এবং পুলিশের মধ্য থেকে যে নিহত হবে তার দুই শহীদের প্রতিদান রয়েছে! আর এই সকল ব্যক্তিরা বলে, খারিজিদের মধ্য থেকে যারা নিহত হবে তারা জাহান্নামের কুকুর। অতঃপর তারা ঐ সকল হাদিস নিয়ে আসে যেগুলো আল্লাহর রাসুল ﷺ খারিজিদের ব্যাপারে বলেছিলেন!

সুতরাং তারা এই বাতিলের মাধ্যমে চেষ্টা করেছে প্রমাণ দিয়ে হক্বকে প্রতিরোধ করতে। অতঃপর তারা প্রমাণের সাথে শক্তি যুক্ত করেছে, তারা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে নিয়ে এসেছে, তারা আমেরিকাকে নিয়ে এসেছে, পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে এসেছে, গুপ্তচর বাহিনীকে নিয়ে এসেছে, তারা তাদের সাহায্যকারীদের নিয়ে এসেছে এবং তারা এই হক্বকে প্রতিরোধ করতে শক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছে।

অতএব "নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্ররোচনা (ওহী) দেয়।" উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ "তারা যেন তোমাদের সাথে বিবাদ করে।" যাতে তারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ

-এর বিধিবিধানকে এই শয়তানী বিধিবিধান দ্বারা প্রতিরোধ করতে পারে যা সে তার বন্ধুদের নিকট ওহী করে।

আয়াতের শেষে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾

“আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক।” অর্থাৎঃ যদি তোমরা আমার বিধিবিধান অমান্য কর যে বিধিবিধান আমি প্রণয়ন করেছি - আমি বলেছি তোমরা এমন বস্তু ভক্ষণ করবে না যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না - ও যদি তোমরা ঐ সকল মুশরিকদের বিধিবিধানের আনুগত্য করে মৃত বস্তু ভক্ষণ কর তখন তোমরা এই কাজের কারণে এবং তোমাদের ঐ আইনের আনুগত্যের কারণে মুশরিক হয়ে যাবে।

“আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক।” আয়াতের এই অংশের ব্যাপারে ইমাম শানক্বীতী رَحِمَهُ اللهُ -এর একটি চমৎকার দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছেঃ তিনি বলেন, আয়াতে একটি কসম উহ্য রয়েছে। আয়াতের এই অংশের মধ্যে একটি কসম উহ্য আছে। সেটা কী? তিনি বলেন, - অর্থাৎ এটা তার উক্তির অর্থ যা আমি অর্থের মাধ্যমে বর্ণনা করছি সরাসরি বক্তব নয়ঃ "إن" এর ক্ষেত্রে শর্তের অব্যয় ফে’য়েলে শর্ত এবং জওয়াবে শর্ত দাবি করে। যেমন আপনি বললেন, “যদি তুমি অধ্যয়ন কর তাহলে সফল হবে।” এই ফে’য়েলটি যখন আপনি নিয়ে এসেছেন তখন এই জওয়াব হচ্ছে আল্লাহ তা’আলার অনুমতিক্রমে সফলতা নিশ্চিত হবে। এই আয়াতের ব্যাপারে তিনি বলেছেন,

﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ﴾

“যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর।” "إن" হচ্ছে শর্তের অব্যয়। “যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর” এটা একটি ফে’য়েলে শর্ত। এই আনুগত্যের জন্য প্রস্তুতকৃত ফলাফল কী? তিনি বলেছেন,

﴿إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾

“তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক।”—এটা শর্তের জওয়াব নয়। “তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক”—এটা শর্তের কোন জওয়াব নয়। কেন? তিনি বলেন, - এটা আমার বক্তব্য, আমি শানক্বীতী থেকে হুবহু বর্ণনা করছি না। আমি কেবল তার বক্তব্য ব্যাখ্যা করছি - কারণ জওয়াবের শর্ত যদি ফে’য়েলে মুদারে হয় তাহলে সেটা ফা’য়েলকে দাবি করে না। শুধু ফে’য়েলে মুদারে দাবি করে। আর যদি ফে’য়েলে মাদী অথবা আমর বা শিবহে জুমলা অথবা এই প্রকারের কোন কিছু হয় তাহলে আরবী ভাষার ক্ষেত্রে আবশ্যক হচ্ছে একটি "فاء" যুক্ত করা; যদি আয়াতটি "وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون" এমন হয় তাহলে আমাদের এটা বলা বৈধ যে, শর্তের জওয়াব হচ্ছে এটা– "فإنكم لمشركون" - এক্ষেত্রে এখানে "فاء" উল্লেখ করা হয়নি। তাই "إنكمْ لمُشْرِكونَ" এটা শর্তের জওয়াব নয়। তাহলে শর্তের জওয়াব কোথায়? তিনি বলেন, শর্তের জওয়াব হচ্ছে মাহযুফ তথা উহ্য কসম। উহ্য কসমের নিরূপণ হচ্ছেঃ

"وإن أطعتموهم فوالله إنكم لمشركون"

অর্থঃ “যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর তাহলে আল্লাহর কসম! তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে।” অতএব এখন আয়াতটি কয়েকটি মাস’আলার দিকে নিয়ে যায়ঃ

প্রথম মাস’আলাঃ এই আয়াতটি মুসলিমদেরকে উদ্দেশ্য করে। এই আয়াতের মুখাতাব হচ্ছে মুসলিমরা মুশরিকরা নয়; কারণ কোন মুশরিককে আমার এটা বলা সম্ভব নয় যে, “যদি তুমি মুশরিকদের আইনের ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য কর তাহলে তুমি মুশরিক হয়ে যাবে।” এটা একটি বাতিল উক্তি। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এ থেকে অনেক দূরে যে, তার উক্তি এরকম বাতিল হবে। নিশ্চিতভাবেই এই আয়াতটি মুসলিমদেরকে উদ্দেশ্য করে। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى মুসলিমদেরকে বলেন, তোমরা আমার আইন বর্জন করে অন্য আইনের আনুগত্য করো না—যেগুলো অন্যদের পক্ষ থেকে প্রণয়ন করা হয়; কারণ যদি তোমরা এই সকল বিধিবিধানের আনুগত্য কর “তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক।” অতএব আয়াতটি শুধুমাত্র মুসলিমদেরকে

উদ্দেশ্য করে।

এই আয়াতের অন্য আরেকটি বিষয় যা থেকে আমরা উপকৃত হবঃ আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, এমন প্রতিটি আইন যা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আইনের বিপরীতে প্রণয়ন করা হয়—সেটা যে দিক থেকে বা যে উৎস থেকেই হোক না কেন—তা শয়তানী আইন; কেননা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন, "নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা (ওহী) দেয়।" এই ফায়েদা অথবা দ্বিতীয় মাস'আলার ব্যাপারে আমরা এই আয়াতের সামনে অবস্থান করি।

তৃতীয় মাস'আলাঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আইন ব্যতীত অন্য আইনকে স্বীকৃতি দিবে অথবা সম্মতি দিবে অথবা সন্তুষ্ট হবে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ কুরআনে ওহী করে তাকে শিরকের হুকুম দিয়েছেন। কারণ আয়াতের শেষে তিনি বলেছেন,

﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾

"আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক।"[25] অতএব এখানে শিরকের হুকুম দেওয়া হয়েছে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর পক্ষ থেকে কুরআনের ওহীর মাধ্যমে। তাই যখন আমি বলব, যারা গঠনকৃত আইন ও সংবিধানসমূহের আনুগত্য করবে তারা মুশরিক। এটা আমার কথা নয়। এটা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর কথা। আমি কেবলমাত্র আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যা বলেছেন তা নক্বলকারী, ফায়সালা তো আল্লাহর ফায়সালা। আমরা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর হুকুম বর্ণনা করি এবং হুজ্জাহ তথা প্রমাণ প্রতিষ্ঠার জন্য নক্বল করি।

সর্বশেষ মাস'আলা আমি উল্লেখ করছিঃ যে ব্যক্তি অতীতে এবং বিগত বছরগুলোতে এই সকল গঠনকৃত আইনের মাধ্যমে শাসন করার ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছে তার উপর আবশ্যক হচ্ছে নিজেকে সংশোধন করা। কারণ সে শিরক সম্পাদন করেছে। যে ব্যক্তি এই প্রকার শিরকে পতিত হয়েছে তার উপর আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর অনুগ্রহের একটি হচ্ছে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাকে দীর্ঘ বয়স দিয়েছেন যেন তার

[25] সুরা আন আমঃ ১২১

জন্য তাওবার সুযোগ তৈরি হয়। তাই যে ব্যক্তি সংবিধানের ব্যাপারে “হ্যাঁ” সূচক বলেছে সে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাথে শিরক করেছে। আর এ শিরকের প্রকার হচ্ছে আনুগত্যের শিরক। তার উপর আবশ্যক নিজেকে সংশোধন করা এবং আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর নিকট এই শিরক থেকে তাওবা করা যে শিরকে সে পতিত হয়েছিল।

আমি আমার কথা এতোটুকুই বললাম। আমি আল্লাহর নিকট আমার জন্য এবং আপনাদের জন্য ইস্তিগফার করি।

আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন এবং আপনাদের বারাকাহ দান করুন!

আনুগত্যের শিরক সংক্রান্ত উৎকর্ষ বিবরণ

শাইখ আবু আলী আল-আনবারী
আল-কুরাইশী رحمه الله

দ্বিতীয় দারসঃ

সংবিধান প্রণয়ন কমিটির বাস্তবতা

الحَمدُ للّه والصّلاةُ والسّلامُ على رسُولِ اللّه؛

হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে হক্বকে হক্ব হিসেবে দেখান এবং হক্ব অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করুন, বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখান এবং বাতিল বর্জন করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদের এমন বিষয় শিক্ষা দিন যা আমাদের উপকার করবে এবং আপনি আমাদের যা শিক্ষা দেন এর মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে আমাদের ইলম অনুযায়ী আমলকারী বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন আমাদের ইলমকে আমাদের জন্য দলিল বানিয়ে দিন এবং আমাদের বিরুদ্ধে দলিল বানাবেন না - - ইয়া আরহামার-রহিমীন! হে আমার রব! আপনি আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিন, আমার বিষয়াদি সহজ করে দিন এবং আমাদের মুখের জড়তা দূর করে দিন যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে। হে আল্লাহ আপনি আমার কর্মকে সৎ বানিয়ে দিন, আপনার সন্তুষ্টির জন্য খালিছ করে দিন এবং আপনার সৃষ্টির কারো জন্য এতে কোন অংশ রাখবেন না।

অতঃপর,

আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে আমরা আনুগত্যের শিরক সম্পর্কে আলোচনা শেষ করেছি। আমরা এই প্রকার শিরকের ক্ষেত্রে প্রমাণসমূহ উল্লেখ করেছি। আমরা বলেছি, যে ব্যক্তি এই গঠনকৃত আইনসমূহের মাধ্যমে শাসন করার ব্যাপারে সম্মতি দিবে অথবা সন্তুষ্ট হবে সে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাথে শিরক করল। শিরকের এই প্রকারটি হচ্ছে আনুগত্যের শিরক। আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে আজ আমরা আলোচনা করব সংবিধান প্রণয়ন সম্পর্কে।

আমি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাহায্যে বলছিঃ বিষয়টি অপরিচিত বা অস্পষ্ট নয়। আপনি জানেন যে, ইসলামের অঞ্চলগুলো পশ্চিমা শাসকদের দ্বারা শাসন করা হত।

তারা তাদেরকে একনায়কতন্ত্র নাম দিত। তারা এককভাবে শাসনের অধিকারী ছিল। এরপর গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হল। কিছু মানুষ ঐ সকল শাসকদের অপসারণ করতে সক্ষম হল এবং বিভিন্ন দল গঠন করা শুরু করল। অতঃপর এই সকল ব্যক্তিরা বিভিন্ন দল গঠন করে গণতন্ত্রের দিকে আহ্বান করা শুরু করল। তারা যে সকল বিষয়ের দিকে আহ্বান করেছিল-এর মধ্যে ছিল আইন পরিবর্তন এবং শাসকদের পরিবর্তন করা। তারা নতুন করে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করার আহ্বান জানাল। তাই ইরাকে একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি হল, মিসরে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি রয়েছে, তিউনিসিয়ায় সংবিধান প্রণয়ন কমিটি রয়েছে এবং লিবিয়ায় সংবিধান প্রণয়ন কমিটি রয়েছে। এমনিভাবে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি দেশে তারা সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

এই কমিটির বাস্তবতা কী এবং তাদের ব্যাপারে শারীয়াহ'র হুকুম কী?

এই সকল কমিটিকে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সমকক্ষ হিসেবে গণ্য করা হয়। সংবিধান প্রণয়নের জন্য গঠন করা প্রতিটি কমিটিকে আল্লাহর সমকক্ষ গণ্য করা হয়। সুতরাং এই কমিটির ব্যাপারে শারীয়াহ'র হুকুম হচ্ছে এই কমিটি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সমকক্ষ। আরবী ভাষার অভিধানগুলোতে যেমন "الند" তথা সমকক্ষের অর্থ সম্পর্কে এসেছেঃ প্রতিদ্বন্দ্বী, অনুরূপ এবং সদৃশ।

ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে, "সমতুল্য।" যেমন ইমাম মাওয়ারদী رَحِمَهُ اللَّهُ তার তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। ইমাম মাওয়ারদী رَحِمَهُ اللَّهُ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا থেকেও উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন, "সমকক্ষ হচ্ছে সমতুল্য।" কিতাব 'আল-আইন'এর লেখক খলিল ইবনে আহমাদ আল-ফারহাদী উল্লেখ করেছেন, যা কোন বিষয়ের অনুরূপ হয় সেটা তার বিরোধী হয়। সমকক্ষ অনুরূপের বিরোধী হয়। এমনিভাবে 'তাজুল আরুস'এ রয়েছেঃ সমকক্ষ আছলের জায়গা পূরণ করে। এমনিভাবে সমকক্ষ সর্বদাই আছলের বিরোধী হয়।

এটা হচ্ছে আরবের ভাষা এবং এটা হচ্ছে সমকক্ষের অর্থ। অর্থাৎ এটা সদৃশ হবে এবং অনুরূপ হবে, আছলের বিরোধী হবে এবং বিপরীত হবে; তবে সমকক্ষতা

কিভাবে প্রকাশ পাবে যদি সেটা আছলের বিপরীত না হয় এবং আছলের বিরোধী না হয়। এটা সমকক্ষ হওয়ার অর্থ।

আর সংবিধান প্রণয়ন কমিটি আল্লাহ **تبارك وتعالى** -এর সমকক্ষ এব্যাপারে দলিলঃ আল্লাহ **تبارك وتعالى** -এর বাণীতে সুরা ইউসুফের ৪০ নং আয়াতে তিনি **عزوجل** বলেন,

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

“বিধান দেয়ার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা কেবলমাত্র তারই ইবাদাত করবে, এটাই সুদৃঢ় দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না।”[26]

আপনি কিভাবে এই আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করবেন যে, সংবিধান প্রণয়ন কমিটি আল্লাহ **عزوجل** -এর সমকক্ষ? অর্থাৎ তারা তাদের নিজেদেরকে ইলাহ সাব্যস্ত করেছে?

প্রাথমিকভাবে আয়াত শুরু হয়েছেঃ "**إنِ الْحُكْمُ**" এরপর রয়েছেঃ "**إلا لِلَّهِ**" আরবী ভাষার পণ্ডিতগণ বলেন, "**إن**" এরপরে যখন ইছতিছনার হরফ তথা অব্যয় আসে তখন "**إن**" এর অর্থ হয় "**ما نافية**" তথা না বাচক। তাই আয়াতের অর্থ হবেঃ "**ما الحكم إلا لله**" বিধান দেওয়ার ক্ষমতা কেবল আল্লাহর। প্রাথমিকভাবে আমরা আয়াত থেকে এ বিষয়টি বুঝেছি।

যে সময়ে আল্লাহ **عزوجل** অন্যদের থেকে আইন প্রণয়নের বিষয়টি নাকচ করেন তখন ইছতিছনার অব্যয় "**إلا**" উল্লেখ হয়েছে। ইছতিছনার অব্যয়ের পর মহামান্বিত "**الله**" শব্দ রয়েছে। অতএব বিধান দেওয়ার ক্ষমতা নেই - অর্থাৎ মানবজাতির জন্য আল্লাহ **عزوجل** ব্যতীত কেউ আইন প্রণয়ন করবে না।

ইছতিছনার অব্যয়ের পর শুধুমাত্র মহামান্বিত আল্লাহ শব্দ উল্লেখ রয়েছে।

---

[26] সুরা ইউসুফঃ ৪০

অতএব এটা হচ্ছে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্য থেকে একটি বৈশিষ্ট্য; অর্থাৎ আমি এর দ্বারা আইন প্রণয়ন উদ্দেশ্য করছি। কারণ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ইছতিছনার অব্যয়ের পর কেবলমাত্র মহামান্বিত আল্লাহ শব্দ উল্লেখ করেছেনঃ "বিধান দেয়ার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই।" অর্থাৎঃ শুধুমাত্র আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এককভাবে বিধিবিধান প্রণয়ন করেন এবং আইন প্রণয়ন করেন।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একক অধিকার আল্লাহর; আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর এ বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে দলিল কী? আইন প্রণয়ন করা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য থেকে একটি বৈশিষ্ট্য-এ বিষয়টি আপনি কিভাবে প্রমাণ করবেন?

প্রথম দলিলঃ আয়াতে কারীমা থেকে আমি যা উল্লেখ করেছিঃ "বিধান দেয়ার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই।" এখানে আমি একটি বিষয় উল্লেখ করছিঃ না-সূচকের পর ইছতিছনার অব্যয় রয়েছে। আরবী ভাষায় এটা সীমাবদ্ধকরণ হিসেবে পরিচিত। আর সীমাবদ্ধকরণের সর্বোচ্চ উঁচু মানের স্তর হচ্ছেঃ বাক্যটি না বাচক হওয়া আর না -সূচক অব্যয়ের পর ইছতিছনার অব্যয় আসা; অর্থাৎঃ আইন প্রণয়ন করা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাথে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। কেননা এটা আরবী ভাষায় সীমাবদ্ধকরণের মাধ্যমসমূহের একটি মাধ্যম।

দ্বিতীয় মাধ্যম হচ্ছেঃ সীমাবদ্ধকরণের অব্যয় "إنما" ব্যবহার করা;

﴿وَ مَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ﴾

"যে পাপ কামাই করবে, বস্তুত সে তো নিজের বিরুদ্ধেই তা কামাই করবে।"[27] অর্থাৎঃ সে ব্যতীত অন্য কেউ তা অতিক্রম করবে না। তার সাথে নির্দিষ্ট, তার সাথে সীমাবদ্ধ।

আরবী ভাষায় সীমাবদ্ধকরণের মাধ্যমের তৃতীয় মাধ্যম হচ্ছেঃ এমন বিষয়কে আগে নিয়ে আসা যা পরে থাকা সঠিক হয়। যেমন আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণীতে

[27] সুরা নিসাঃ ১১১

রয়েছেঃ

﴿اِيَّاكَ نَعۡبُدُ﴾

“আমরা আপনারই ইবাদাত করি।”[28] আপনি জানেন যে, দমীর তথা সর্বনাম পরে থাকে। যেহেতু এর অবস্থান পরে তাই একে আগে আনা হয়েছে; অতএব এটা সীমাবদ্ধকরণের ফায়দা দিয়েছে। অর্থাৎঃ আমরা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করি না। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর সাথে ইবাদাতকে সীমাবদ্ধ করা কিভাবে আমি বুঝলাম? কারণ যা পরে থাকা সঠিক সেটাকে আগে আনা হয়েছে যেমন আয়াতে রয়েছেঃ "إياك نعبد" মূল বাক্য হচ্ছেঃ "نعبد إياك" “আমরা আপনার ইবাদাত করি।” অতএব আয়াতে রয়েছেঃ "إياك نعبد" “আমরা আপনারই ইবাদাত করি।” এটা আরবী ভাষায় সীমাবদ্ধকরণের সবচেয়ে উঁচু মানের স্তর। তাই আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى এই আয়াতে কারীমায় আইন প্রণয়নকে তার সুউচ্চ সত্তার সাথে সীমাবদ্ধ করেছেন। তাহলে এটা প্রথম দলিল যে, “বিধান দেয়ার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই।” আইন প্রণয়ন করা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।

অন্য আরেকটি দলিলঃ আরো কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى হুকুম বা বিচার-ফায়সালা করার ক্ষেত্রে একক কর্তৃত্ববান। যেমন আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণীতে সুরা শুরার ১০ নং আয়াতে রয়েছেঃ

﴿وَ مَا اخۡتَلَفۡتُمۡ فِيۡهِ مِنۡ شَيۡءٍ فَحُكۡمُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ﴾

“আর তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করা না কেন—এর ফায়সালা তো আল্লাহরই কাছে।” অতএব মতভেদপূর্ণ এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ব্যতীত অন্য কেউ আইন বা হুকুম প্রণয়ন করতে পারবে না। “আর তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করা না কেন।” "شيء" তথা “কোন বিষয়” শব্দটি ছোট-বড় বৃহৎ -সূক্ষ্ম সকল বিষয়কে শামিল করে। তাহলে, “আর তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ

[28] সুরা ফাতিহাঃ ০৫

করা না কেন—এর ফায়সালা তো আল্লাহরই কাছে।” আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দিকে নয়। এটা সুরা শুরাতে রয়েছে। আর সুরা আনআমে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

﴿أَفَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْتَغِي حَكَمًا﴾

“তবে কি আমি আল্লাহ তা’আলা ছাড়া আর কাউকে ফায়সালাকারী হিসেবে তালাশ করব?”[29] তাহলে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ব্যতীত অন্য কারো আইন পাওয়া যায় না। এমনিভাবে সুরা কাহাফে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

﴿وَّ لَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾

“তিনি নিজ কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না।”[30]

অতএব এখন আমার নিকট দুইটি দলিল রয়েছে। প্রথম দলিলঃ “বিধান দেয়ার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই।” আইন প্রণয়ন করা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত—এব্যাপারে দ্বিতীয় দলিল হচ্ছেঃ এই তিনটি আয়াত যেগুলো আমি উল্লেখ করেছি।

আইন প্রণয়ন করা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত—এব্যাপারে **তৃতীয় দলিলঃ** যখন আমি এ আয়াতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিঃ “বিধান দেয়ার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা কেবলমাত্র তারই ইবাদাত করবে।” তখন প্রশ্ন আসে যে,

রাসুল ﷺ আল্লাহ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর পক্ষ থেকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কি আইন প্রণয়ন করতেন নাকি করতেন না? নিশ্চিতভাবেই তিনি আইন প্রণয়ন করতেন। তাহলে কেন এই আয়াতে মহামান্বিত নামের সাথে তার নাম উল্লেখ করা হয়নি? কেন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেননি—“বিধান দেওয়ার ক্ষমতা কেবল আল্লাহর এবং

---

[29] সুরা আনআমঃ ১১৪

[30] সুরা কাহাফঃ ২৬

তার রাসুলের।”? নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর নাম এই স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে অন্যান্য আয়াতে যুক্ত করেছেন। যেমন সুরা নুরের ৬২ নং আয়াতে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰۤى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ﴾

“মু’মিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর ঈমান আনে এবং রাসুলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হলে তারা তার অনুমতি ছাড়া সরে পড়ে না।” অতএব ঈমানের স্থানে মহামান্বিত নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং মহামান্বিত নামের পাশে রাসুলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। “মু’মিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর ঈমান আনে।” এটা হল ঈমান আনয়ন করার স্থানে।

আর আনুগত্যের স্থানেঃ যেমন সুরা আলে-ইমরানের ১৩২ নং আয়াতে রয়েছেঃ

﴿وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ﴾

“আর তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা রহমত লাভ করতে পার।” অতএব আনুগত্যের স্থানে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর নামের সাথে রাসুল ﷺ -এর নাম যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু যখন আমরা বিধান বা আইনের আয়াতে আসি তখন দেখতে পাই যে, আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى তার সম্মানিত নাম উল্লেখ করার উপর সীমাবদ্ধ থেকেছেন এবং তিনি তার নামের সাথে রাসুল ﷺ -এর নাম উল্লেখ করেননি।

কিভাবে আপনি প্রমাণ করবেন যে, রাসুল ﷺ আইন প্রণয়ন করতেন অথচ এই আয়াতে তার নাম উল্লেখ করা হয়নি?

এব্যাপারে অনেক দলিল রয়েছেঃ যেমন সুরা আ’রাফের ১৫৭ নং আয়াতে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্কে বলেন,

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ ۫ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ

وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ﴿١٥٧﴾

"যারা উম্মী নাবী রাসুলের অনুসরণ করে, যার গুণাবলী তারা নিজদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়, যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করেন ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন আর অপবিত্র বস্তু হারাম করেন।" অতএব তাওরাতে আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে এবং ইঞ্জিলে তার গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তার উম্মাতের জন্য হালাল সাব্যস্ত করতেন এবং তাদের জন্য নিকৃষ্ট বিষয়সমূহ হারাম সাব্যস্ত করতেন। এটা আইন প্রণয়ন।

ঠিক আছে... এই আইন প্রণয়ন করার ব্যাপারে দলিল কী? অর্থাৎ কিভাবে আপনি প্রমাণ করবেন যে, রাসুল ﷺ কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হালাল সাব্যস্ত করবেন এবং হারাম সাব্যস্ত করবেন?

প্রথম দলিলঃ আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর বাণীঃ

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ﴾

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী এবং রক্ত।"[31] এটা আমাদের রবের কিতাবে রয়েছে।

আর আমাদের নাবী ﷺ -এর কর্মপদ্ধতিতে এবং আমাদের নাবী ﷺ -এর সুন্নাহ'তে এরকম হাদিস রয়েছেঃ "আমাদের জন্য দুই মৃত বস্তু এবং দুই প্রকার রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত বস্তু দু'টি হলঃ মাছ এবং টিড্ডী। আর রক্ত দুই প্রকার হলঃ কলিজা এবং প্লীহা।"[32]

তাহলে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন, "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী এবং রক্ত।" এটা আমাদের রবের কিতাবের আইন। আর আমাদের নাবীর

---

[31] সুরা মায়িদাহঃ ০৩

[32] ইবনে মাজাহ, দারে-কুতনী এবং বায়হাক্বী رَحِمَهُ الله বর্ণনা করেছেন।

সুন্নাহ'তে রয়েছে তিনি বলেন, না, আমাদের জন্য দুইটি মৃত বস্তু হালাল করা হয়েছেঃ মাছ এবং টিড্ডি এটাতো পরিচিত। আর দুইটি রক্তঃ কলিজা এবং প্লীহা।

ইমাম ছনআনী رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ 'সুবুলাস-সালাম'এ এই হাদিসের ব্যাপারে বলেন, "এটা সঠিক যে, এই হাদিসটি সাহাবী পর্যন্ত মাওকুফ।" অর্থাৎ এটা একজন সাহাবীর উক্তি। কিন্তু আপনি যেমন জানেন, ইমাম ছনআনী বলেছেন, এই ধরনের অনুরূপ হাদিসগুলো মারফুর হুকুমে হবে; কারণ সাহাবী যখন বলেন, "আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে অথবা আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।" এটাকে 'মারফু'এর হুকুমে ধরা হবে। তাই এই হাদিসের ব্যাপারে যদিও বলা হয় মাওকুফ - আর এটা সঠিক যে, এই হাদিস মাওকুফ কিন্তু এর হুকুম হচ্ছে মারফু; কারণ সাহাবীর পক্ষে এটা বলা সম্ভব নয় যে, আমাদের জন্য দুইটি মৃত বস্তু হালাল করা হয়েছে অথবা আমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে বা এরকম। অতএব এটা সঠিক যে, হাদিসটি মাওকুফ কিন্তু আহলুল হাদিস আলেমগণের নিকট এর হুকুম হচ্ছে মারফু।

এমনিভাবে রাসুল ﷺ মৃত বস্তু সম্পর্কে বলেছেন, যখন তাকে সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আমরা কি অযু করব নাকি করব না? তিনি বলেছেন, "এর পানি পবিত্র এবং এর মৃত বস্তু হালাল।"[33] তাহলে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন, "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী এবং রক্ত।" আর আমরা আমাদের নাবীর সুন্নাহ'তে পাই যে, কিছু মৃত বস্তু আমাদের জন্য হালাল। তাহলে "তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন আর অপবিত্র বস্তু হারাম করেন।" এব্যাপারে এটা একটি দলিল যে, কুরআনে আইন হয় এক বিষয় এবং সুন্নাহ'তে কখনো কখনো সেটা অন্য বিষয় হয়।

অন্য আরেকটি দলিলঃ আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ সুরা নিসাতে মাহরাম নারীদের আলোচনার পর বলেন,

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ﴾

---

[33] খামসাহ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন, এই হাদিসটি হাসান সহীহ।

“তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে এবং বোনের মেয়ে।”[34] এরপর আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَ اُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ﴾

“উল্লেখিত নারীগণ ছাড়া অন্য নারীকে অর্থব্যয়ে বিয়ে করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়।”[35] “উল্লেখিত নারীগণ ছাড়া অন্য নারীকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হল।” অর্থাৎ এই সকল শ্রেণীর এবং এই সকল নামের যেগুলো আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ উল্লেখ করেছেন তাদের কাউকে বিবাহ করা মুসলিমের জন্য জায়েয নয়। আপনি দেখবেন যে, আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى এই আয়াতে যে সকল মাহরাম নারীদের কথা উল্লেখ করেছেন সে অনুযায়ী স্ত্রীর ফুফুকে বিবাহ করা যাবে? বা স্ত্রীর খালাকে কি বিবাহ করা যাবে? আয়াতটি মাহরামদের মধ্য থেকে এই দুই শ্রেণীর কাছে যায়নি। তাই আমরা যদি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাবের নিকট সীমাবদ্ধ থাকি তাহলে কোন পুরুষের জন্য তার স্ত্রীর ফুফু বা খালাকে বিবাহ করা জায়েয অথবা স্ত্রীর খালাকে বিবাহ করা জায়েয। এটা তখন হবে যখন আমরা আমাদের রবের কিতাবের উপর সীমাবদ্ধ থাকব। আর আমাদের নাবী ﷺ -এর সুন্নাহ’তে রয়েছে যেমন ইমাম মুসলিম رَحِمَهُ اللهُ বর্ণনা করেছেন, তিনি ﷺ বলেছেন, “স্ত্রীর ফুফুকে বিবাহ করা যাবে না এবং তার খালাকেও বিবাহ করা যাবে না।” অতএব এটাও হচ্ছে একটি আইন প্রণয়ন যে আয়াতে নারীদের মধ্য থেকে যাদের বিবাহ করা হারাম করার আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি। এটা একটি আইন প্রণয়ন এবং সেটাও একটি আইন প্রণয়ন।

আরো একটি দলিলঃ আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى সুরা নিসাতেই মুসলিমের উপর যে সকল নারীদের বিবাহ করা হারাম তাতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْۤ اَرْضَعْنَكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾

---

[34] সুরা নিসাঃ ২৩

[35] সুরা নিসাঃ ২৪

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের দুধমাতা ও দুধবোন।"[36] তাহলে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাবে দুধ পানের মাস'আলায় আপনার আমার উপর ঐ নারীকে বিবাহ করা হারাম যে আপনাকে দুধ পান করিয়েছে। এমনিভাবে ঐ নারীর মেয়েদেরকেও বিবাহ করা হারাম যে আপনাকে দুধ পান করিয়েছে; কারণ এই নারীকে মা হিসেবে গণ্য করা হয় এবং তার মেয়েকে বোন হিসেবে গণ্য করা হয়।

অতএব আমাদের রবের কিতাব দুই প্রকার নারীদের উপর সীমাবদ্ধ থেকেছে - মায়েদের এবং মেয়েদের। এটা আমাদের রবের কিতাবে রয়েছে। আর আমাদের নাবীর সুন্নাহ'তে রয়েছে যেমন ইমাম বুখারি رَحِمَهُ الله আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল ﷺ কে বলা হল, কেন তিনি বিবাহ করবেন না অথবা হামজা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -এর মেয়েকে তিনি কেন বিবাহ করবেন না। তিনি বললেন, "সে আমার জন্য হালাল নয়। বংশের কারণে যা হারাম হয় দুধ পানের কারণেও তা হারাম হয়। আর সে আমার দুধভাইয়ের মেয়ে।"[37]

"সে আমার দুধ ভাইয়ের মেয়ে।" তাহলে আপনি পেলেন যে, আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাবে রয়েছে মা এবং বোন। আর ভাইয়ের মেয়ের কথা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাবে উল্লেখ হয়নি। কোথায় উল্লেখ হয়েছে? আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর হাদিসে উল্লেখ হয়েছে। অতএব এটা একটি আইন প্রণয়ন করা এবং সেটাও একটি আইন প্রণয়ন করা।

আরেকটি দলিলঃ ইমাম বুখারি رَحِمَهُ الله এবং মুসলিম رَحِمَهُ الله ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -এর হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "রাসুল ﷺ খায়াবারের বছর গৃহপালিত গাধার মাংস খেতে নিষেধ করেছেন।" প্রত্যেকের জন্য গৃহপালিত গাধার মাংস খাওয়া হারাম। আপনি যদি গাধার মাংস হারাম হওয়ার ব্যাপারে অনুসন্ধান

---

[36] সুরা নিসাঃ ২৩

[37] এটা বুখারির শব্দ।

করেন তাহলে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাবে আপনি এটা কোন বক্তব্য আঁকাড়ে পাবেন না। আপনি কেবল এটা আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর সুন্নাহ'তে পাবেন। তাহলে এটা একটি আইন প্রণয়ন। এমন একটি হুকুম যা ঐ সকল হুকুমের সাথে যুক্ত হয় যেগুলো আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

অতএব এই দলিলগুলো এখন আমার জন্য এবং আপনার জন্য প্রমাণ করল যে, আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর পক্ষ থেকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাসুল ﷺ আইন প্রণয়ন করতেন। এসত্ত্বেও ঐ আয়াতে তার নাম উল্লেখ করা হয়নিঃ "বিধান দেয়ার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই।" বলা হয়নি এবং তার রাসুলের জন্যও। কেন?

প্রথম কারণঃ কেননা আইন প্রণয়ন করা কেবলমাত্র আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। এটা হচ্ছে আয়াতে রাসুল ﷺ -এর নাম উল্লেখ না করার প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণঃ রাসুল ﷺ -এর মাধ্যমে আমাদের নিকট যা এসেছে তা তিন ভাগে বিভক্তঃ

আমাদের নিকট কুরআনের মাধ্যমে এসেছে। আর এর পরিচয়ঃ শব্দ এবং অর্থ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর পক্ষ থেকে।

আমাদের নিকট নাবী ﷺ -এর মাধ্যমে হাদিসে কুদসী এসেছে। হাদিসে কুদসীর পরিচয় - আলেমগণের দেওয়া একটি পরিচয় হচ্ছেঃ শব্দ এবং অর্থ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর পক্ষ থেকে। হাদিসে কুদসী এবং কুরআনে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আয়াতসমূহের মাঝে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও। তাহলে এটাও আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর পক্ষ থেকে।

আমাদের নিকট রাসুল ﷺ -এর মাধ্যমে হাদিসে নববী এসেছে। এই সকল হাদিসের পরিচয় হচ্ছেঃ শব্দ রাসুল ﷺ -এর পক্ষ থেকে আর অর্থ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর পক্ষ থেকে।

তাহলে এখন প্রাপ্ত ফলাফল হচ্ছেঃ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে, হাদিসে

কুদসী আল্লাহর পক্ষ থেকে। হাদিসে নববীঃ অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে; এই কারণেই ঐ আয়াতে রাসুল ﷺ -এর নাম উল্লেখ করা হয়নি। কারণ প্রতিটি তাবলীগ তথা দাওয়াহ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর পক্ষ থেকে এসেছে। এর দলিল সুরা নাজমের ৩-৪ নং আয়াতে রয়েছে। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

﴿وَ مَا يَنۡطِقُ عَنِ الۡهَوٰی ۞ اِنۡ هُوَ اِلَّا وَحۡیٌ یُّوۡحٰی﴾

“আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরিত হয়।” অতএব এমন প্রতিটি বিষয় যা আমাদের নিকট আসে তা কেবলই ওহী।

এমনিভাবে ইমাম আহমাদ رَحِمَهُ اللهُ আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, “জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আমাকে কুরআন এবং এর সাথে এর অনুরূপ দেওয়া হয়েছে।”

অতএব আমার নিকট প্রমাণিত হল যে, রাসুল ﷺ আইন প্রণয়ন করতেন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর পক্ষ থেকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এজন্য আয়াতে কারীমায় তার নাম উল্লেখ হয়নিঃ “বিধান দেয়ার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই।”

তাহলে এর মাধ্যমে আমরা যে ফলাফল বের করতে পারি তা হলঃ আমি যে বিষয় উল্লেখ করেছি–এর প্রত্যেকটি নিশ্চিত করে যে, আইন প্রণয়ন করা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তিনি স্বতন্ত্রভাবে এই বৈশিষ্ট্য তার সৃষ্টির কারো জন্য নির্ধারণ করেননি। এমনকি আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর জন্যেও না।

এখন আমরা আসব সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রসঙ্গেঃ

এই ব্যক্তিরা আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর জন্য সমকক্ষতার প্রতিচ্ছবির অধীনে তারা এমন কিছু আইন নিয়ে এসেছে যেগুলো আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আইনের বিপরীত এবং বিরোধী। তারা প্রমাণ করেছে যে, তারা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর সমকক্ষ। আপনি কিভাবে এই কথা প্রমাণ করবেন?

এখানে ইরাকী সংবিধানের একটি ধারা রয়েছেঃ আপনি লক্ষ্য করুন, এই ধারাটি কী বলেছে, ইরাকী সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের ১৯ তম ধারা। এই আইনী সংবিধানের উপর ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে ভোটাভুটি হয়েছিল। আর মানুষ এই সংবিধানের ব্যাপারে "হ্যাঁ" বলেছিল। ইরাকী সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের ১৯ তম ধারা বলেছে, **"অধ্যাদেশ** -অর্থাৎ আইনী অধ্যাদেশ- **বহির্ভূত কোন অপরাধ এবং কোন দণ্ড নেই। এমন কাজের ক্ষেত্রে কেবল দণ্ড হবে উক্ত কাজ সম্পাদন কালে আইন যেটাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। অপরাধ সম্পাদন করার মূহুর্তে বাস্তবায়িত দণ্ড থেকে অধিক কঠোর দণ্ড বাস্তবায়ন করা** -অর্থাৎ প্রয়োগ করা- **বৈধ নয়।"**

এই আইনী ধারার মাধ্যমে আপনি কিভাবে প্রমাণ করবেন যে, সংবিধান প্রণয়ন কমিটি নিজেদেরকে আল্লাহ **تَبَارَكَ وَتَعَالَى** -এর সাথে সমকক্ষ স্থির করেছে?

প্রথম সূত্র লক্ষ্য করুনঃ "অধ্যাদেশ বহির্ভূত কোন অপরাধ এবং দণ্ড নেই।" তাদের কিছু পণ্ডিত আছে যাদেরকে তারা আইনজ্ঞ নামে আখ্যায়িত করে–ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্। "অধ্যাদেশ বহির্ভূত কোন অপরাধ এবং দণ্ড নেই" এর অর্থ হল -অর্থাৎ সংবিধান প্রণয়ন কমিটি অপরাধ প্রণয়ন করে। তাই সংবিধান প্রণয়ন কমিটি যে কাজের ব্যাপারে বলবে যে, এই কাজকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে তখন এই কাজকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। আর যখন তারা ঐ কাজের ব্যাপারে বলবে না যে, এটা অপরাধ তখন ইরাকী আইনে সেই কাজকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে না। স্বভাবতই যে সকল আইনের মাধ্যমে এখন মুসলিমদের দেশগুলোতে কাজ করা হয়–এর সবগুলোই এই ধারার ভিত্তিতে।

এরপর যখন সংবিধান প্রণয়ন কমিটি অপরাধসমূহ নির্ধারণ করে তখন তারা এই অপরাধের ব্যাপারে দণ্ড প্রণয়ন করার যথার্থতা তাদের নিজেদের জন্য অর্পণ করে। পরিমাণ নির্ধারণ করার দিক থেকে, সংখ্যা নির্ধারণ করার দিক থেকে অথবা এছাড়াও অন্যান্য দিক থেকে... অর্থাৎ তারা উক্ত অপরাধের ব্যাপারে দণ্ডের প্রকার নির্ধারণ করে।

উদাহরণঃ সালাত পরিত্যাগ করা অপরাধ নয়; অতএব এর কোন শাস্তি নেই।

আইন এর কোন সাজা দেয় না। কারণ সংবিধান প্রণয়ন কমিটি অপরাধসমূহ নির্ধারণ করে। নিশ্চিতভাবেই আপনি যখন ইরাকী সংবিধানে অপরাধ সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন তখন আপনি খুঁজে পাবেন না যে, সালাত পরিত্যাগ করা কোন অপরাধ; অতএব সংবিধান প্রণয়ন কমিটি সালাত পরিত্যাগ করাকে কোন অপরাধ হিসেবে গণ্য করে না। এজন্য তারা এমন ব্যক্তির উপর কোন শাস্তি নির্ধারণ করেনি যে সালাত পরিত্যাগ করে। এটা একটি উদাহরণ।

অন্য আরেকটি উদাহরণঃ দ্বীন পরিবর্তন করা–ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্। একজন মুসলিম ইয়াযিদী হয়ে গেল। ইরাকী সংবিধানে এটাকে কোন অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না। কেন? কারণ এটা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আর গণতন্ত্রের ভিত্তিসমূহের একটি হচ্ছেঃ বিশ্বাসের স্বাধীনতা। অর্থাৎঃ মানুষের ইচ্ছানুযায়ী তারা যেকোনো ধর্ম থেকে মত গ্রহণ করতে পারবে। তাই সংবিধান প্রণয়ন কমিটি ধর্ম পরিবর্তন করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে না; সেক্ষেত্রে এমন কোন মুসলিমের উপর কোন শাস্তি নেই যে তার দ্বীন পরিবর্তন করে অন্য ধর্মে চলে যায়। আর রাসুল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিবর্তন করবে তোমরা তাকে হত্যা কর।”[38]

যিনা-ব্যভিচারঃ কয়েকটি শর্ত ব্যতীত যিনাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না। আর এই সকল শর্ত উদ্ভাবন করেছে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি। তারা বলে যিনা স্বয়ং কোন অপরাধ নয়, সত্তাগতভাবে যিনা কোন অপরাধ নয় যখন শর্তসমূহ পূরণ হবে। আর যখন এই সকল শর্ত থেকে কোন শর্ত ত্রুটিযুক্ত হবে তখন ঐ সময় যিনাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে।।

প্রথম শর্তঃ তারা বলে, নারীটি বালেগা হতে হবে। তাই যখন সে নাবালেগা হবে এবং কেউ তার সাথে যিনা করবে তখন এটা অপরাধ হবে। আর যদি সে বালেগা হয় এরপর সে যিনা করে তাহলে এটাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ প্রথম শর্তটি নারীর ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়।

দ্বিতীয় শর্তঃ তারা বলে, নারীর সম্মতিতে হতে হবে। অর্থাৎ যখন যিনার

[38] মুসনাদে আহমাদ

ব্যাপারে তাকে বাধ্য করা হবে তখন এটা অপরাধ হবে। আর যখন সে এ সম্মতি দিবে, যে ইচ্ছা তার সাথে অশ্লীলতা করতে পারবে তখন আইনে এটাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে না।

তৃতীয় শর্তঃ তারা বলে, উপযোগী স্থানে হতে হবে–সার্বজনীন নৈতিকতার বিবেচনায়। তাহলে নারী বালেগা হতে হবে, তার সম্মতিতে হতে হবে, উপযোগী স্থানে হতে হবে; মিসরী আইনে রয়েছে যার মাধ্যমে মিসরের মুরজিয়ারা এবং ইখওয়ানরা শাসন করে-এই আইনে রয়েছেঃ

আইনের ভাষ্যঃ যখন পুলিশ একজন পুরুষ এবং একজন নারীকে গাড়ির ভিতরে যিনা করতে দেখবে তখন পুলিশের জন্য তাদের দু'জনের উপরের গ্লাসে কড়া নাড়া বৈধ নয়; কারণ গাড়ির নিরাপত্তা বাড়ির নিরাপত্তার মতই। তাহলে হে কমিটি কখন তোমরা যিনাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করবে? ভাই! আপনি শুধু একটি বিষয় লক্ষ্য করুনঃ যখন সে যিনার মজুরী নিবে আর সে আইনগতভাবে অনুমোদিত নয়! যখন একজন মহিলা যিনা করবে এবং সে যিনার মজুরী নিবে আর তার কাছে যিনার পেশাগত লাইসেন্স নেই তখন আইন তাকে শাস্তি দিবে তার লাইসেন্স না থাকার জন্য তার যিনার জন্য নয়। সে পেশাগতভাবে একটি ব্যবসা করছে অথচ সে আইনগতভাবে অনুমোদিত নয়। এই আইন সংবিধান প্রণয়ন কমিটি তৈরি করেছে। এই বক্তব্য মিসরের সংবিধানে রয়েছে। আমি মিসরের ব্যাপারে জোর দিচ্ছি; কারণ অনিষ্টতার উৎপত্তি মিসর থেকে। আমি মিসরবাসীদের উদ্দেশ্য করছি না - তারা এ থেকে অনেক দূরে - কিন্তু এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা সেখান থেকে বের হয়েছে। অনিষ্টতার উৎপত্তি সেখান থেকে–ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ

মিসরে - মিসরের ইখওয়ান–আমরা তাদেরকে ইখওয়ানুল মুসলিমীন নামে আখ্যায়িত করব না... করব ইখওয়ানুল মিসর তথা মিসরের ইখওয়ান, কিবতিদের ইখওয়ান এবং অন্যান্যদের ইখওয়ান - তারা তাদের পাগড়ীধারী নেতাদের একজনকে মিসরীয় পার্লামেন্টে নিয়ে গেল। লোকটিকে পার্লামেন্টে যাওয়ার জন্য প্রার্থী করা হল। আমি ঐ ব্যক্তির ডায়েরী পড়েছি কারণ সে এরপর তাওবা করেছে। সে তার নাগরিকদের খোঁজখবর নেওয়া শুরু করল কে তাকে পার্লামেন্টে যাওয়ার

জন্য ভোট দিবে। তার ঘুরাফেরার স্থানের কারণে সে এক পুলিশ স্টেশনে গেল। এই লোকটি তার ডায়েরীতে এভাবে বলেছেঃ

সে বলেছে, আমি পুলিশ স্টেশনে প্রবেশ করে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করলাম। আমি একটি কামরা দেখতে পেলাম যেটাতে গাদাগাদি করে মহিলা ভরতি ছিল। আমি স্টেশনের এক দায়িত্বশীল অফিসারকে বললাম, এই মহিলাদের সমস্যা কী? সে বলল, হে শাইখ! তারা যিনাকারী। অতঃপর আমি ডানে-বামে তাকালাম কিন্তু পুরুষদের দেখতে পেলাম না। আমি বললাম, তাহলে পুরুষ যিনাকারীরা কোথায়? যদি এই মহিলা যিনাকারী হয় তাহলে পুরুষ যিনাকারী কোথায়? সে বলল, হে শাইখ! আপনি ভুলে গেছেন, আপনিই তো পার্লামেন্টে স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, একজন মহিলা যখন যিনা করবে এবং যিনার জন্য মজুরী নিবে এই অবস্থায় যে, সে আইনগতভাবে অনুমোদিত নয় তখন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। এই সকল মহিলাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে তারা যিনা করেছে এবং যিনার মজুরী নিয়েছে। আর আমরা যখন তাদের নিকট পেশাগত কাজের লাইসেন্স চাইলাম তখন আমরা পেলাম না। তাই আমরা তাদেরকে আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়ার জন্য নিয়ে এসেছি। ঐ স্থান থেকে লোকটি ফিরে এসে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর নিকট তাওবা করেছে এবং পার্লামেন্ট বর্জন করেছে। সে তার ডায়েরীতে এই বিষয়ে লিখেছে।

অতএব যখন সংবিধান প্রণয়ন কমিটি এই সকল আইন প্রণয়ন করে তখন কি এগুলো সমকক্ষতা নয় যার অর্থ আমি আপনার কাছে উল্লেখ করেছি।

অতএব “**অধ্যাদেশ বহির্ভূত কোন অপরাধ নেই এবং কোন শাস্তি নেই।**” - আপনি ধারার বাক্যটি লক্ষ্য করুন - “**এমন কাজের ক্ষেত্রে কেবল শাস্তি হবে উক্ত কাজ সম্পাদন করার সময় আইন যেটাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে।**” এই ধারার এই অংশের অর্থ কী?

কখনো কখনো সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কতিপয় অপরাধের ব্যাপারে গাফেল থাকে। অর্থাৎ কিছু অপরাধ থাকে কিন্তু তারা ঐ কাজকে অপরাধ হিসেবে নির্ধারণ করেনি এবং তারা ঐ অপরাধের জন্য কোন শাস্তিও প্রণয়ন করেনি। একজন মানুষ

এই অপরাধ সম্পাদন করল আর আইন এই অপরাধের ব্যাপারে কোন বক্তব্য দেয়নি এবং শাস্তির ব্যাপারেও না। তাহলে কী বলা হবে? বলা হবে, যে লোকটি এই অপরাধ সম্পাদন করেছে তাকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হবে না; কারণ আইন প্রণেতা এই কাজকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে ভুলে গিয়েছে। এরপর এই অপরাধের ব্যাপারে শাস্তি প্রণয়ন করতে ভুলে গিয়েছিল।

আইনের তৃতীয় ধারা বলেছে, এরপর যখন আইন প্রণেতা এই কাজকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করবে অর্থাৎ এই কাজ উন্মোচিত হওয়ার পর তখন তারা এই কাজকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করবে এবং এই অপরাধের ব্যাপারে শাস্তি প্রণয়ন করবে। আর ঐ ব্যক্তি যে আইন প্রণয়নের পূর্বে এই অপরাধ সম্পাদন করেছে তাকে কি শাস্তি দেওয়া হবে নাকি হবে না? সংবিধান প্রণয়ন কমিটি - ন্যায়বিচার ও ইনসাফের ভিত্তিতে - বলে, না এই ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হবে না। কেন? কমিটি বলে, কারণ আমরা এই কাজকে অপরাধ হিসেবে বর্ণনা করার পূর্বে এবং এই কাজের ব্যাপারে শাস্তি প্রণয়ন করার পূর্বে লোকটি এই কাজ সম্পাদন করেছে। তাই আমরা তাকে শাস্তি দিব না। কারণ তার কাজটি ইতিপূর্বে আমাদের আইনে ছিল না। এই সকল ধারা সংবিধান প্রণয়ন কমিটি লিপিবদ্ধ করে।

এরচেয়ে আরো নিকৃষ্ট একটি ধারা ইরাকী সংবিধানে প্রকাশিত হয়েছে। এই ধারাটি দুই পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। আমি ঐ পত্রিকা সংগ্রহ করেছিলাম। একটি পত্রিকার নাম হচ্ছে 'দারুস-সালাম'। আর আপনি জানেন এই পত্রিকাটি কাদের। পত্রিকাটি 'হিযবুল ইরাকী'এর। আমেরিকান একটি পত্রিকায় ২০০৫ সালে ইরাকী সংবিধানের লিখিত বক্তব্য ছেপেছিল। আমেরিকান বাহিনী কয়েক প্লাটুন সৈন্য নামিয়ে আমেরিকান পত্রিকার একটি কপি মানুষকে নিতে বাধ্য করেছিল। এমনকি তারা ইরাকী সংবিধানের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করেছিল। এমনিভাবে 'দারুস-সালাম' পত্রিকা এই সংবিধান ছাপানোর মর্যাদা নিয়েছিল।

পত্রিকায় বিদ্যমান ধারাটির বক্তব্য ছিল এরকম। আমি ধারাটির ক্রমিক নং স্মরণ করতে পারছি না। বক্তব্য এরকম ছিলঃ

“যখন আইন-সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষ কোন আইন প্রণয়ন করবে তখন এই আইন অন্য যেকোনো আইনের ঊর্ধ্বে অবস্থান করবে–এই দুইয়ের মাঝে অসঙ্গতির সময় সেটা যেকোনো দিক থেকেই হোক না কেন।”

“যখন আইন-সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষ কোন আইন প্রণয়ন করবে।” এখানে আইন -সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্লামেন্টের সদস্যরা। তারাও আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সমকক্ষ হয়। সুতরাং সংবিধান প্রণয়ন কমিটি সমকক্ষতার বিষয়টি পার্লামেন্টের জন্যও দিয়ে দিয়েছে। কারণ বিগত চার বছর ধরে নতুন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা পার্লামেন্টের সদস্যদের অধিকার তাদের - সংবিধান প্রণয়ন কমিটির - অধিকার নয়। কেননা আইন হচ্ছে সীমিত। বিগত চার বছরে অনেক বিষয় ঘটেছে। আর আইন এই সকল ঘটমান বিষয় মিটাতে পারে না। তাই পার্লামেন্টের সদস্যরা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কে তাদেরকে এই ক্ষমতা প্রদান করল? সংবিধান প্রণয়ন কমিটি প্রদান করেছে।

“যখন আইন-সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষ কোন আইন প্রণয়ন করবে তখন এই আইন অন্য যেকোনো আইনের ঊর্ধ্বে অবস্থান করবে–এই দুইয়ের মাঝে অসঙ্গতির সময় সেটা যেকোনো দিক থেকেই হোক না কেন।” এই ধারাটি পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান আছে। যে ২০০৫ সালের পত্রিকা অধ্যয়ন করবে সে আমার উল্লেখিত বক্তব্য পত্রিকায় পেয়ে যাবে। কিন্তু এরপর যখন তারা পুনরায় সংবিধান প্রণয়ন করেছে তখন তারা সংবিধান থেকে এই ধারাটি মুছে ফেলেছে। এখন এই ধারাটি সংবিধানে পাওয়া যাবে না। কিন্তু সংবিধান থেকে এই ধারাটি মুছে ফেলার অর্থ এই নয় যে, এই সকল তাগুত শাসকরা এই ধারা অনুযায়ী কাজ করে না। ধারাটি বিলুপ্ত কিন্তু এটা কার্যকর। কিভাবে?

এখন কিছু মানুষ যদি বলে, আমরা চোরের হাত কাটতে চাই তখন পার্লামেন্টের প্রতিটি সদস্য এর বিরোধিতা করবে। ঐ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের ১৯ তম ধারার ভিত্তিতে - “অধ্যাদেশ বহির্ভূত কোন অপরাধ এবং কোন শাস্তি নেই।” তারা বলবে, ইরাকী আইনে লেখা আছে যে, চুরি করা একটি অপরাধ। কিন্তু চুরি করার শাস্তি হাত কাটা–এটা লেখা নেই। লেখা আছে চুরির শাস্তি হচ্ছে কারারুদ্ধ করা।

অতএব যদিও তারা এই ধারাটি উঠিয়ে দিয়েছে কিন্তু তারা এখনো এই ধারা অনুযায়ী কাজ করছে এবং কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এই ভিত্তিতে যে, সংবিধানের বিপরীত করা কারো জন্য সম্ভব নয়।

কিন্তু সমস্যা কোথায়? যে সকল আইন তারা প্রণয়ন করেছে সেগুলোর ক্ষেত্রে তারা শর্তারোপ করে যে, যখন এই সকল আইন অন্য কোন আইনের সাথে অসঙ্গতি হবে তখন পার্লামেন্টের প্রণয়নকৃত আইন ঐ আইনের উর্ধ্বে অবস্থান করবে। তারা এতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং তারা বলেছে, "সেটা যেকোনো দিক থেকেই হোক না কেন।"

আমি উদাহরণের মাধ্যমে আপনার সামনে চিত্রায়িত করছিঃ আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেছেন,

﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾

"আর পুরুষ চোর ও নারী চোর–তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও; তাদের কৃতকর্মের ফল ও আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[39] সংবিধান প্রণয়ন কমিটি হচ্ছে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সমকক্ষ, তারা তার বিরোধিতা করছে এবং বিপরীত করছে। তারা বলছে, পুরুষ চোর এবং নারী চোরকে কারারুদ্ধ করা হবে অথবা তারা চুরির ক্ষতিপূরণ দিবে।

তাহলে হয়তো কারারুদ্ধ করা হবে অথবা বস্তুগত জরিমানা করা হবে। এখন এই আইন–"আর পুরুষ চোর ও নারী চোর–তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও" এবং "তাদের কারারুদ্ধ করা হবে অথবা জরিমানা পরিশোধ করবে" আইনের মাঝে অসঙ্গতি হয়েছে। যেহেতু এই দু'টি পরস্পর বিরোধ হয়েছে তাই কার আইন উর্ধ্বে অবস্থান করবে? তাগুতের আইন উর্ধ্বে অবস্থান করবে; "তখন এই আইন অন্য যেকোনো আইনের উর্ধ্বে অবস্থান করবে।"

---

[39] সুরা মায়িদাহঃ ৩৮

এরপর আইন বলেছে, “সেটা যেকোনো দিক থেকেই হোক না কেন।” ঠিক আছে... এই আইনটি তো আমাদের রবের পক্ষ থেকে। হে আইন প্রণেতা তুমি কী বলবে? এখন আপনি আমার সাথে সমকক্ষের অর্থ পুনরায় বলুন, তা হচ্ছে অনুরূপ, সদৃশ, প্রতিদ্বন্দ্বী, বিরোধী যে আসলের জায়গা পূরণ করে; তাহলে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি হচ্ছে ইলাহ তথা উপাস্য বরং তারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সমকক্ষ। তাই মনে হয় যেন আয়াতটি তাদের মতে– আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তার রাসুল ﷺ -এর জন্য এই আয়াতে উল্লেখ করার মত কোন ক্ষেত্র রাখেননি কিন্তু কুরআনের বাহিরে এই সকল লোকদের মতে মনে হয় আয়াতটি এরকমঃ

إن الحكم إلا للجنة كتابة الدستور، إن الحكم إلا لأعضاء البرلمان وإن الحكم إلا لبعض شيوخ العشائر

অর্থঃ বিধান দেওয়ার ক্ষমতা কেবলমাত্র সংবিধান প্রণয়ন কমিটির, বিধান দেওয়ার ক্ষমতা কেবলমাত্র পার্লামেন্টের সদস্যদের এবং বিধান দেওয়ার ক্ষমতা কেবলমাত্র গোত্রের কতিপয় মুরুব্বীদের।

অতএব আপনি এখান থেকেই জানতে পারবেন কিভাবে আপনি ইস্তিদলাল তথা এই আয়াত দিয়ে এই দলিল পেশ করতে পারবেন যে, সংবিধান প্রণয়ন কমিটি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সমকক্ষ। আমরা আয়াতের বাকি অংশ পূর্ণ করবঃ

আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ এরপর বলেছেন,

﴿أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾

“তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা কেবলমাত্র তারই ইবাদাত করবে।” “তোমরা ইবাদাত করবে”–এর অর্থ হচ্ছেঃ তোমরা আনুগত্য করবে। অর্থাৎঃ তিনি আদেশ করেছেন তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আনুগত্য করবে।

যেহেতু এখানে আনুগত্যটি শাসন প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছেঃ তাই আমরা আয়াত থেকে এভাবে বুঝব যে, তিনি আদেশ করেছেন তোমরা কেবলমাত্র তার আইনের নিকট বিচার চাইবে। “বিধান দেয়ার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই।” আয়াতটি শাসনের

ব্যাপারে। এরপর তিনি কী বলেছেন? “তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা কেবলমাত্র তারই ইবাদাত করবে।” অর্থাৎঃ তোমরা আইনসমূহের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** -এর আনুগত্য করবে যেগুলো তিনি প্রণয়ন করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন, "ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ" -“এটাই সুদৃঢ় দ্বীন।” আপনি জানেন যে, "**ذلك**" একটি ইসমে ইশারা তথা ইঙ্গিতবাচক বিশেষণ। আর ইসমে ইশারা মুশারুন ইলাইহি দাবি করে। এখানে মুশারুন ইলাইহি হচ্ছেঃ আয়াতের শুরুর অংশগুলো। “বিধান দেয়ার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা কেবলমাত্র তারই ইবাদাত করবে।” তাই যারা আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** -এর জন্য শাসন ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিল অতঃপর আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** -এর আইনের নিকট বিচার প্রার্থী হল আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** তাদের সম্পর্কে বলেন, “এটাই সুদৃঢ় দ্বীন।” অর্থাৎ সুদৃঢ় সরল যাতে কোন বক্রতা নেই; আপনি আল্লাহর জন্য শাসন ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিবেন এবং আল্লাহর বিধানের নিকট বিচার চাইবেন।

তাহলে যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য শাসন ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিবে অতঃপর আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** ব্যতীত অন্যের জন্য শাসন ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিবে নিশ্চিতভাবেই সে সুদৃঢ় সরল দ্বীনের উপর নেই। কারণ আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** বলেছেন, “এটাই সুদৃঢ় দ্বীন।” অর্থাৎ যে ব্যক্তি এককভাবে আল্লাহর জন্য শাসন ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিবে সংবিধান প্রণয়ন কমিটির জন্য নয় অতঃপর আল্লাহ **تَبَارَكَ وَتَعَالَى** -এর আইনের নিকট বিচার চাওয়াকে স্বীকৃতি দিবে।

আয়াতের সর্বশেষ অংশঃ “কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না।” তারা কী জানে না? অর্থাৎ এই তিনটি বাস্তবতা যেগুলো আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছেঃ তারা জানে না - “বিধান দেয়ার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই।” তারা জানে না - “তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা কেবলমাত্র তারই ইবাদাত করবে।” তারা জানে না - “এটাই সুদৃঢ় দ্বীন।”

“কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না।” আপনি জানেন যে, আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** -এর কালাম বাস্তবতার বিরোধী হবে–এ থেকে মুক্ত; আপনি যদি গোলাকার পৃথিবীর

উপর একটি পরিসংখ্যান চালান তাহলে দেখতে পাবেন যে, গোলাকার পৃথিবীর বসবাসকারীদের সংখ্যা সর্বশেষ পরিসংখ্যান আমি জানি সাড়ে সাত বিলিয়ন লোক। এই সাড়ে সাত বিলিয়ন থেকে সোয়া ছয় বিলিয়ন লোক ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের উপর। তারা জানে না - "বিধান দেয়ার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই।" তারা জানে না - "তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা কেবলমাত্র তারই ইবাদাত করবে।" তারা জানে না - "এটাই সুদৃঢ় দ্বীন।" আপনি আমার সাথে সোয়া বিলিয়নের ব্যাপারে আসুন! তাদের কতজন জানে? অতএব আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ সত্য বলেছেন যখন তিনি বলেছেন, "কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না।" এই হল তিনটি বাস্তবতা।

তাদের এই বাস্তবতাগুলো না জানাটা তাদের উপর শিরকের নাম ব্যবহার করতে বাধা দিবে না। তাদের জানা না থাকার উজর গ্রহণ করা হবে না। তাই যে ব্যক্তি শিরকে পতিত হবে তাকে মুশরিক নামে আখ্যায়িত করা হবে; কিন্তু আমরা নামের মাঝে এবং হুকুম প্রয়োগের মাঝে পার্থক্য করি। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি শিরকে পতিত হলে আমরা তাকে মুশরিক নামে আখ্যায়িত করি। কিন্তু আমার কর্তব্য এটা নয় যে, আমি তার উপর আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর হদ বাস্তবায়ন করব। এটা মুসলিমদের আমীরগণের তথা শাসকগণের কাজ। কিন্তু নাম প্রয়োগ করার মাসআলা আমার দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত যে, আমি ঐ ব্যক্তিকে মুশরিক নামে আখ্যায়িত করব যে ব্যক্তি শিরকে পতিত হবে এমনকি যদি সে জাহিল তথা অজ্ঞও হয়।

এর দলিল আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণী সুরা তাওবার ০৬ নং আয়াতে রয়েছেঃ

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

"আর মুশরিকদের মধ্যে কেউ আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আপনি তাকে আশ্রয় দিন; যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিন; কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা জানে না।" সুতরাং তিনি জ্ঞাতসারেই তাদেরকে মুশরিক নামে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি আয়াতের শেষে

বলেছেন যে, “তারা জানে না।” তাহলে যে ব্যক্তি শিরকে পতিত হবে তাকে মুশরিক নামে আখ্যায়িত করা হবে। এমনকি যদিও এটা প্রমাণিত হয় যে, সে জানে না। কারণ আক্বীদাহ’র মূলনীতিতে অজ্ঞতার কোন উজর নেই। বর্তমানে কোন পৃথক করা ছাড়া এই বরকতময় আয়াতের সামনে মানুষ তিন ভাগে বিভক্তঃ

প্রথম শ্রেণীঃ যারা আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** -এর জন্য শাসন ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেয় এবং আল্লাহ **تَبَارَكَ وَتَعَالَى** -এর আইনের নিকট বিচার চায় তারা হল মু’মিন এবং তারা আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** -এর সাক্ষ্য অনুযায়ী সুদৃঢ় দ্বীনের উপর রয়েছেঃ “এটাই সুদৃঢ় দ্বীন।”

দ্বিতীয় শ্রেণীঃ যারা আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** -এর জন্য শাসন ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেয় এবং তারা সংবিধান প্রণয়ন কমিটির জন্যও শাসন ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেয় তারা হল মুশরিক। আর তাদের শিরকের ধরন হচ্ছে আনুগত্যের শিরক। আর যে ঈমানের দাবি করে সে শুধু দাবি করে; এটা তার একটি দাবি। আল্লাহর প্রতি এবং বিধান দেওয়ার ক্ষমতা তার-এব্যাপারে যে ঈমানের দাবি করে সে দাবিই করে এটা একটি নিছক দাবি; এর দলিল সুরা নিসার ৬০ নং আয়াতে রয়েছে। আল্লাহ **تَبَارَكَ وَتَعَالَى** বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

“আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, তারা ঈমান এনেছে আপনার উপর যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে এর প্রতি, আর তারা তাগুতের কাছে বিচার চাওয়ার ইচ্ছা করে। অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন তা অস্বীকার করে। আর শয়তান তাদেরকে ঘোরতর পথভ্রষ্ট করতে চায়।” অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** -এর জন্য শাসন ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিল অতঃপর আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য শাসন ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিল-এই অবস্থায় সে ঈমানের দাবি করে; এদের মত ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** বলেছেন, তুমি দাবি করছ যে, তুমি মু’মিন। তুমি এটা দাবিই করছ। আর আপনি জানেন যে,

দাবি সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তা হল মানুষ এমন বিষয়ের দাবি করে যা তার কাছে নেই। আয়াতের ভিত্তিতে এই হল দ্বিতীয় শ্রেণী।

তৃতীয় শ্রেণীঃ যারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর জন্য শাসন ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেয় না এবং আল্লাহর আইনের নিকট বিচার চায় না তারা হল কাফির–ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্

আমি এতোটুকুই বললাম, আমি আমার জন্য এবং আপনাদের জন্য আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার করছি। আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম জাযা দান করুন এবং আপনাদেরকে বারাকাহ দান করুন!

আনুগত্যের শিরক সংক্রান্ত উৎকর্ষ বিবরণ

শাইখ আবু আলী আল-আনবারী আল-কুরাইশী رحمه الله

তৃতীয় দারসঃ

সংবিধান প্রণয়নের বাস্তবতা [সম্পূরক]

الحَمدُ للّه والصّلاةُ والسّلامُ على رسُولِ اللّه؛

হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে হক্বকে হক্ব হিসেবে দেখান এবং হক্ব অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করুন, বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখান এবং বাতিল বর্জন করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদের এমন বিষয় শিক্ষা দিন যা আমাদের উপকার করবে এবং আপনি আমাদের যা শিক্ষা দেন এর মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে আমাদের ইলম অনুযায়ী আমলকারী বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন আমাদের ইলমকে আমাদের জন্য দলিল বানিয়ে দিন এবং আমাদের বিরুদ্ধে দলিল বানাবেন না - - ইয়া আরহামার-রহিমীন! হে আমার রব! আপনি আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিন, আমার বিষয়াদি সহজ করে দিন এবং আমাদের মুখের জড়তা দূর করে দিন যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে। হে আল্লাহ আপনি আমার কর্মকে সৎ বানিয়ে দিন, আপনার সন্তুষ্টির জন্য খালিছ করে দিন এবং আপনার সৃষ্টির কারো জন্য এতে কোন অংশ রাখবেন না।

অতঃপর,

আমরা বিগত সময়ে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে সংবিধান প্রণয়ন কমিটির বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি যে, তারা হচ্ছে আল্লাহ **تَبَارَكَ وَتَعَالَى** -এর সমকক্ষ। আমরা আল্লাহ **تَبَارَكَ وَتَعَالَى** -এর এবাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করেছিঃ

﴿اِنِ الْحُكْمُ اِلا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلا تَعْبُدُوٓا اِلا اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُوْنَ﴾

“বিধান দেয়ার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা কেবলমাত্র তারই ইবাদাত করবে, এটাই সুদৃঢ় দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা

জানে না।”[40] আজ আমরা আরো কিছু মাস’আলা সম্পর্কে আলোচনা করব যেগুলো সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সাথে সম্পৃক্ত। সেগুলো হচ্ছেঃ

এই কমিটির দ্বিতীয় বাস্তবতাঃ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা রবে পরিণত হয়েছে।

আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর কিতাব থেকে এর দলিল হচ্ছেঃ সুরা তাওবার ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর বাণীঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

“তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও পাদ্রীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়াম তনয় মসীহকেও। অথচ একজন ইলাহের ইবাদাত করার জন্যই তাদের আদেশ করা হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। ওরা তার সাথে যা শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র!”

এই আয়াতের ব্যাখ্যা কী? কিভাবে আপনি এই আয়াতের মাধ্যমে দলিল পেশ করবেন যে, সংবিধান প্রণয়ন কমিটি আল্লাহকে বাদ দিয়ে রবে পরিণত হয়েছে?

আমি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাহায্যে বলছিঃ প্রথমে এই আয়াতঃ “তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও পাদ্রীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে”–এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী–তা জানা আবশ্যক।

এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ ইহুদী এবং খ্রিষ্টানরা। এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য যে ইহুদী এবং খ্রিষ্টানরা-এর দলিল এই আয়াতের পূর্বের আয়াত।

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেন,

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَ قَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝ اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ

[40] সুরা ইউসুফঃ ৪০

اَلْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۳۱﴾

"আর ইহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র। আর খ্রিষ্টানরা বলে, মসীহ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা। আগে যারা কুফরি করেছিল তারা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। তাদেরকে কোন দিকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে! তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও পাদ্রীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়াম তনয় মসীহকেও। অথচ একজন ইলাহের ইবাদাত করার জন্যই তাদের আদেশ করা হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। ওরা তার সাথে যা শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র!"[41]

অতএব এই আয়াতের পূর্বের আয়াতটি স্পষ্ট করে যে, "তারা তাদের পণ্ডিত ও পাদ্রীদেরকে গ্রহণ করেছে"–এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা ইহুদীরা এবং খ্রিষ্টানরা। এটা হল প্রথম দলিল। আর আপনার জন্য এটাই যথেষ্ট হবে। কিন্তু অধিক উপকারিতার জন্য কিভাবে আমরা এই সকল আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করব সেব্যাপারে আমি আরেকটি দলিল বর্ণনা করছিঃ

আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى এই আয়াতে দুইটি নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ধর্ম যাজক এবং পাদ্রী। **الأحبار** তথা ধর্ম যাজক হচ্ছে যেমন 'মুখতার আস-সিহাহ'এ রয়েছেঃ একজন পণ্ডিত। আর তারা হচ্ছে ইহুদীদের পণ্ডিত লোকেরা। অর্থাৎ ইহুদীদের আলেমরা।

এমনিভাবে ইমাম আলুসী رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ তার তাফসীরে বলেন, **الأحبار** হচ্ছে "ইহুদীদের আলেমরা।" ইবনু আবী হাতিম رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ যাহহাক থেকে তার তাফসীরে নকল করেছেন, তিনি বলেছেন, **الأحبار** হচ্ছে "ইহুদীদের আলেমরা অথবা তাদের ক্বারীরা।"

তবে আলুসী رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ তার তাফসীরে অন্য আরেকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন, **حبر** শব্দ যার অর্থ হচ্ছে জ্ঞানী বা পণ্ডিত–এটাকে মুসলিমদের ক্ষেত্রে

[41] সুরা তাওবাঃ ৩০-৩১

ব্যবহার করা যায় এবং যিম্মির ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়; কারণ ইবনে আব্বাস رَضِيَاللهُعَنْهُمَا কে حبر الأمة তথা উম্মাহ'র পণ্ডিত নামে আখ্যায়িত করা হত।

حَبر শব্দকে যবর দিয়ে পড়া জায়েয এবং আপনি যের দিয়ে حِبر বললেও আপনার জন্য জায়েয হবে। এই দুইয়ের অর্থ একই ইনশা'আল্লাহ।

অতএব الأحبار দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যেমন আলুসী رَحِمَهُاللهُ এবং যাহহাক رَحِمَهُاللهُ বলেছেন, তারা হল ইহুদীদের আলেমরা। আর الرهبان হল খ্রিষ্টানদের আলেমরা। এব্যাপারে ইমাম আলুসী رَحِمَهُاللهُ বক্তব্য লিখেছেন।

তাহলে এটা একটি দলিল যে, আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইহুদী এবং খ্রিষ্টান। এই আয়াতের ব্যাপারে আমার জোড় দেওয়ার কারণ হচ্ছে বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত একটি মাস'আলা রয়েছে।

এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য ইহুদী এবং খ্রিষ্টানরা–এব্যাপারে আরো একটি দলিলঃ এই আয়াত দমীর তথা সর্বনাম বর্ণনা করেছে। আর আপনি জানেন যে, সর্বনাম ইসম তথা নামের পরিবর্তে আসে। আমরা যদি সর্বনামগুলোকে নামের দিকে ফিরিয়ে দিতে চাই তাহলে কুরআনের ভাষ্যের বাহিরে আয়াতটি এরকম হবেঃ ইহুদীরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ইহুদীদের পণ্ডিতদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। খ্রিষ্টানরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে খ্রিষ্টানদের পাদ্রীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। অতএব এই সবগুলো দলিলই প্রমাণ করে যে, আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইহুদীরা এবং খ্রিষ্টানরা।

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও পাদ্রীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।" রবের অর্থঃ أرباب হচ্ছে رب এর বহুবচন। তা হল যার ইবাদাত করা হয়, যার আনুগত্য তথা মান্য করা হয়। যখন রব শব্দকে একবচনে উল্লেখ করা হবে, যখন রব শব্দ একবচন হিসেবে আসবে তখন এর অর্থ হবেঃ মা'বুদ তথা যার ইবাদাত করা হয়, এর অর্থ হবেঃ মুত্বা তথা যার আনুগত্য করা হয়।

এর দলিল সুরা মারইয়ামের ৬৫ নং আয়াতে রয়েছে। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ

বলেন,

﴿رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ مَا بَیۡنَهُمَا فَاعۡبُدۡهُ وَ اصۡطَبِرۡ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلۡ تَعۡلَمُ لَهٗ سَمِیًّا﴾

"তিনি আসমানসমূহ ও যমীন এবং এ দুইয়ের মাঝে যা কিছু আছে, সে সবের রব। সুতরাং তারই ইবাদাত করুন এবং তার ইবাদাতে ধৈর্যশীল থাকুন। আপনি কি তার সমনামগুণসম্পন্ন কাউকেও জানেন?" তিনি عَزَّوَجَلَّ বলেছেন, "তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের রব।" অতঃপর তিনি বলেছেন, "সুতরাং তারই ইবাদাত করুন।"

এমনিভাবে সুরা বাকারার ২১ নং আয়াতে রয়েছে। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

﴿یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اعۡبُدُوۡا رَبَّکُمُ الَّذِیۡ خَلَقَکُمۡ وَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَتَّقُوۡنَ﴾

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।" অতএব রব হল যার ইবাদাত করা হয় এবং যার আনুগত্য করা হয়।

কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তারা তাদের জন্য সালাত আদায় করত এবং তাদের উদ্দেশ্যে সিয়াম রাখত। তাদের আনুগত্য অন্য এক প্রকার থেকে হয়েছিল। আমরা যখন সংবিধানের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করব তখন আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে আমরা এই মাস'আলা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তাহলে এখন আপনি জানলেন যে, ইহুদীদের আলেমরা এবং খ্রিষ্টানদের পাদ্রীরা রবে পরিণত হয়েছিল।

কিভাবে এই লোকেরা রব হয়েছিল?

ইমাম মুসলিম رَحِمَهُ ٱللَّهُ বারা ইবনে আযিব থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি বর্ণনা করার পূর্বে আমি একটি বিষয় উল্লেখ করছিঃ ইহুদীদের আলেমরা যারা ছিল الأحبار তারা আল্লাহর নাবী মুসার শারীয়াহ'র কিছু আইন পরিবর্তন করেছিল। খ্রিষ্টানদের আলেমরা আল্লাহর নাবী ঈসার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছিল। তাই যখন এই সকল আলেমরা কিছু আইন পরিবর্তন করেছিল অথবা

পুরো দ্বীনকে তাওহীদ থেকে ত্রিত্ববাদের দিকে পরিবর্তন করেছিল এবং ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাদের আলেমদের আনুগত্য করেছিল তখন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদের সম্পর্কে বলেছেন, এই সকল আলেমরা এখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে রবে পরিণত হয়েছে।

অতএব কারণ হল ইহুদীদের আলেমরা আল্লাহর নাবী মুসার শারীয়াহ'র ক্ষেত্রে পরিবর্তন করেছিল এবং খ্রিষ্টানদের পাদ্রীরা আল্লাহর নাবী ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام - এর শারীয়াহ'র ক্ষেত্রে পরিবর্তন করেছিল।

ইহুদীদের এই পরিবর্তনের ব্যাপারে দলিল কী এবং খ্রিষ্টানদের আলেমদের তাদের দ্বীন পরিবর্তন করার ব্যাপারে দলিল কী?

ইহুদীদের আলেম আহবারদের সম্পর্কেঃ ইমাম মুসলিম رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বারা ইবনে আযিব رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর পাশ দিয়ে এক মাহমুম মাজলুদ ইহুদীকে নেয়া হয়েছিল।" মদিনাতে রাসুল ﷺ -এর পাশ দিয়ে ইহুদীরা অতিক্রম করছিল। আর তাদের সাথে একজন মাহমুম মাজলুদ লোক ছিল। মাহমুম অর্থ হচ্ছেঃ অর্থাৎ তারা তার মুখে ছাই মেখে দিত। আর তা হল ছাই ও পানির সাথে মিশ্রিত আগুনের অবশিষ্টাংশ। মাজলুদ হলঃ তারা তাকে উল্টো করে পশুর উপর আরোহণ করাত। অর্থাৎ তার মাথা থাকত পশুর মুখের দিকে আর তার মুখ থাকত পশুর পিছনের দিকে। অতঃপর রাসুল ﷺ ঐ সকল ইহুদীদের বলেন, "তোমরা কি তোমাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতে যিনার শাস্তি এরূপ পেয়েছ? তারা বলল, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি তাদের এক আলেমকে ডেকে বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, যিনি মুসার উপর তাওরাত নাযিল করেছেন। তোমরা কি তোমাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতে যিনার শাস্তি এরূপ পেয়েছ? তখন সে ব্যক্তি বলেঃ না, ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি আপনি আমাকে এরূপ কঠিন শপথ প্রদান না করতেন, তবে তা আমি আপনার কাছে প্রকাশ করতাম না। আমরা আমাদের ধর্মগ্রন্থে যিনার শাস্তি রজম পাই। কিন্তু যখন আমাদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যিনার প্রচলন অধিক হয়ে যায়, তখন কোন সম্ভ্রান্ত লোক এজন্য

দোষী সাব্যস্ত হলে আমরা তাকে ছেড়ে দেই এবং কোন দুর্বল লোক যিনা করলে তার উপর শারীয়াহ'র নির্দেশিত হদ বাস্তবায়ন করি। আমরা সর্ব সম্মতভাবে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, আমরা নিজেরাই এমন একটি হদ বা শাস্তি নির্ধারণ করে নেই, যা সম্ভ্রান্ত ও দুর্বল ব্যক্তিদের উপর একইভাবে প্রয়োগ করা যায়। তখন আমরা রজমের পরিবর্তে মুখে কালো দাগ ও বেত্রাদণ্ডের ব্যবস্থা নির্ধারণ করি।"

তাহলে এই ইহুদী রাসুল ﷺ কে সংবাদ দিয়েছে যে, তাদের আলেমরা যিনাকারীর হদ রজম তথা পাথর মেরে হত্যা করার থেকে চাবুক মারা এবং কালি মেখে দেওয়াতে পরিবর্তন করেছিল। আর ইহুদীরা তাদের প্রণয়নকৃত এই আইনের ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করেছিল; এখান থেকেই আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদের নাম দিয়েছেন যে, এই সকল পণ্ডিতরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে রবে পরিণত হয়েছে। এটা হচ্ছে ইহুদী আলেমদের সম্বন্ধে।

আর খ্রিষ্টানদের আলেমদের সম্পর্কেঃ আপনি জানেন যে, এই ধর্ম ছিল একত্ববাদের ধর্ম। কিন্তু আমরা এখন এটাকে ত্রিত্ববাদের ধর্ম হিসেবে দেখতে পাই। আমরা দেখি যে, আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর যামানায় এই ধর্ম ছিল ঐ সময়ের নেতৃত্বদানকারী। এর দলিল হল আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তার বাণী নাযিল করেছেনঃ

﴿لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍ﴾

"অবশ্যই তারা কাফির- যারা বলে, আল্লাহ তো তিনজনের মধ্যে তৃতীয়জন।"[42] অতএব এই ধর্ম একত্ববাদ থেকে ত্রিত্ববাদে পরিবর্তন হয়েছে। কিভাবে পরিবর্তন হয়েছে?

সিরাহ এবং ইতিহাসবিদগণ এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ আল্লাহর নাবী ঈসাকে তার রিসালাত দিয়ে বানী-ইসরাঈলের নিকট প্রেরণ করার পর এবং মানুষ এই নতুন ধর্মকে গ্রহণ করার ও আল্লাহর নাবী মুসার ধর্ম পরিত্যাগ করার পর ইহুদীরা আল্লাহর নাবী মুসার ধর্ম পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহর নাবী ঈসা

---

[42] সুরা মায়িদাহঃ ৭৩

যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করা কারো জন্যই মেনে নিত না। ইহুদীদের আলেমরা ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করার ফাতাওয়া দেওয়া শুরু করল, যে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। তাই তাদের মাঝে হত্যা করা ছড়িয়ে পড়ল। খ্রিষ্টানদের প্রতি তাদের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর ছিল একজন ইহুদী যার নাম ছিল 'শাউল'। তারা পরিপূর্ণরূপে কয়েকটি নগরী ধ্বংস করে দিয়েছিল। তবে তারা অনুসন্ধান করে দেখল যে, খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করা থেকে মানুষকে বাধা দেওয়ার ব্যাপারে এই পদ্ধতি উপকারে আসবে না। তাই তারা নিকৃষ্ট চিন্তা-ভাবনার পদ্ধতি গ্রহণ করল। এই শাউল আল্লাহর নাবী ঈসার অনুসারীদের নিকট এসে বলল, আমি মরুভূমিতে পথ চলছিলাম। আমি একজন আহ্বানকারীকে আহ্বান করে আমাকে বলতে শুনেছি, "হে শাউল! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। তুমি আমার অনুসারী হয়ে যাও।" তাই আমি খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতে চাই।

খ্রিষ্টানদের হত্যা করার ক্ষেত্রে এই শাউলের কঠোর সিদ্ধান্ত থাকার কারণে তার খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে তৎকালীন পণ্ডিতরা আপত্তি করল। কিন্তু তাদের মাঝে এক লোক ছিল যার নাম বারনাবা—আপনি যেমন জানেন এই নামটি এখনো বিদ্যমান আছে। কারণ অসমর্থিত সূত্রে তার একটি ইঞ্জিল রয়েছে। মনে হয় যেন সে একজন ভালো লোক ছিল। এই শাউলের খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে সে (বারনাবা) মধ্যস্থতা করল। ফলে এই শাউল ভিতরে থেকে এই ধর্মকে নষ্ট করার ব্যাপারে কাজ শুরু করল এবং সন্দেহ-সংশয় ছুড়া শুরু করল। সর্বপ্রথম যে সংশয় সে ছুড়েছিল তা হলঃ সে বলল, একটি শিশুর পিতা-মাতা ছাড়া জন্ম গ্রহণ করা কি সম্ভব? তারা বলল, না সম্ভব না। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সুন্নাহ হল শিশু একজন পিতা এবং একজন মাতা থেকে জন্ম গ্রহণ করে। সে জিজ্ঞাসা করল, ঈসার পিতা কে? তারা বলল, তার পিতা নেই। তাহলে তোমরা পূর্বের বিষয়ে মতবিরোধ করছ যে ব্যাপারে আমরা একমত হয়েছিলাম। যখন তারা এই প্রশ্নের কোন উত্তর পেল না তখন সে বলল, যেহেতু তার কোন মানুষ পিতা নেই তাহলে তার পিতা হচ্ছে আল্লাহ! তারাও এই সংশয় মেনে নিল—ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্

তাদের মনে এই সংশয় ঢুকিয়ে দেওয়ার পর সে দ্বিতীয় সংশয় নিয়ে আসল।

সে বলল, যেহেতু আমরা একমত হলাম যে, ঈসার পিতা হচ্ছে আল্লাহ - আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى তা থেকে মুক্ত - আর আমরা জানি যে, পিতার থেকে এক অংশ এবং মায়ের থেকে এক অংশ ব্যতীত কোন শিশুর জন্ম হয় না। তাহলে ঈসার মধ্যে মারইয়ামের থেকে একটি অংশ আছে এবং তার মধ্যে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর থেকেও একটি অংশ আছে–জালিমরা যা বলে আল্লাহ তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তারা প্রথম সংশয় মেনে নেওয়ার পর দ্বিতীয় সংশয় তাদের মেনে নেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। তারা বলল, সঠিক। তার মধ্যে আল্লাহর একটি অংশ আছে এবং মারইয়ামের একটি অংশ আছে।

আজ পর্যন্ত খ্রিষ্টানদের আক্বীদাহ-বিশ্বাস এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা বলল, "ঈসার মধ্যে ইলাহী অংশ আছে এবং তার মধ্যে মানবীয় অংশ আছে।" তারা ইলাহী দ্বারা উদ্দেশ্য করে–অর্থাৎ আল্লাহ হচ্ছে তার পিতা এবং আল্লাহর একটি অংশ ঈসার মধ্যে অবস্থান করছে। আর মানবীয় অংশ দ্বারা তারা উদ্দেশ্য করে–মারইয়ামের একটি অংশ আল্লাহর নাবী ঈসার মধ্যে অবস্থান করছে; এই সংশয়টিও তারা মেনে নিয়েছে।

এরপর সে সর্বশেষ সংশয়টি নিয়ে আসল। সে বলল, যেহেতু আমরা একমত হলাম যে, আল্লাহর নাবী ঈসার মধ্যে আল্লাহর একটি অংশ আছে তাই তার ইবাদাত করা উপযুক্ত। আমরা এই ইলাহী অংশের ইবাদাত করব যা ঈসার মধ্যে রয়েছে। এভাবেই সে এই ধর্মকে একত্ববাদের ধর্ম থেকে ত্রিত্ববাদের ধর্মে পরিবর্তন করেছে। অতঃপর সে বলল, আল্লাহ, পুত্র, পবিত্র আত্মা। ফলে ইলাহ হয়ে গেল তিনজন। খ্রিষ্টানরা এই শাউলের আনুগত্য করে অনুসরণ করল সে যে সকল সংশয় নিয়ে এসেছে সে ক্ষেত্রে। আর খ্রিষ্টানদের আলেমরা সর্বদাই এই সংশয়ের দিকে আহ্বান করে এবং খ্রিষ্টানরাও তাদের আনুগত্য করে।

অতএব এই শাউলের কথা ভুলে যাবেন না, সে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার পর নিজেকে "বুলিসুর রাসুল বা প্রেরিত পৌল" হিসেবে আখ্যায়িত করত। ইঞ্জিলে তার কিছু রিসালাহ আছে। রোমবাসীর প্রতি তার কিছু রিসালাহ আছে, অমুক অমুকের প্রতি তার কিছু রিসালাহ আছে, ইঞ্জিলে তার কিছু রিসালাহ আছে। সে তাদের মাঝে

একজন উল্লেখিত ব্যক্তি। কিন্তু সে-ই এই ধর্মকে একতত্ববাদের ধর্ম থেকে ত্রিত্ববাদের ধর্মে পরিবর্তন করেছে। আর খ্রিষ্টানরাও তার আনুগত্য করেছে এবং তারা এখনো তার আনুগত্য করছে; অতএব আলেমরা এই ধর্মকে পরিবর্তন করার মধ্যে ছিল আর খ্রিষ্টানরা তাদের আনুগত্য করেছে। তাই এই সকল আলেমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে রবে পরিণত হয়েছে।

এই বিষয় সম্পর্কে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ টিকা উল্লেখ করছিঃ নিশ্চয়ই যিনি আল্লাহর নাবী মুসার শারীয়াহ এবং আল্লাহর নাবী ঈসার শারীয়াহ পরিবর্তনকারী আলেমদেরকে 'রব' নাম দিয়েছেন তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলা–যিনি কুরআনের মধ্যে ওহী করে এই নাম দিয়েছেন। অর্থাৎ এটা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর একটি বিধান কোন মানুষের বিধান নয়। অর্থাৎঃ আলেমরা যখন কোন নাবীর শারীয়াহ পরিবর্তন করে এবং মানুষ এই পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করে তখন এই আলেমকে ঐ সকল লোকদের রব হিসেবে গণ্য করা হবে। ঠিক আছে... এখন আসিঃ

আমরা যা বললাম–এর সাথে সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সম্পর্ক কী?

সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি উল্লেখ করা হয়েছে কেবলমাত্র ইহুদীদের পণ্ডিত এবং খ্রিষ্টানদের পাদ্রীদের কথা। আর সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কথা আয়াতে উল্লেখ নেই। তাহলে তারা কি এই আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে নাকি হবে না? তারা অন্তর্ভুক্ত হবে। এব্যাপারে দলিল হচ্ছেঃ

প্রথমতঃ আবু সাঈদ খুদরী رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের নীতি-পদ্ধতি পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করবে, বিঘতে বিঘতে ও হাতে হাতে, এমনকি তারা যদি সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে তাহলেও তোমরা তাদের অনুসরণ করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! পূর্ববর্তী উম্মাত বলতে তো ইহুদী ও খ্রিস্টানরাই উদ্দেশ্য?

তিনি বললেন, তবে আর কারা?”[43]

অতএব এমন প্রত্যেক বিষয় যা ইহুদীদের সময় ঘটেছিল এবং খ্রিষ্টানদের সময় ঘটেছিল আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর উম্মাহ’র মধ্যে তা ঘটবে - তারা ঐ সকল লোকদের কাজের মত কাজ করবে। আলেমরা আল্লাহর নাবী মুসার দ্বীনের মধ্যে এবং আল্লাহর নাবী ঈসার দ্বীনের মধ্যে যা করেছিল তা হচ্ছে তারা ঐ দ্বীনকে পরিবর্তন করেছিল; আমরা দেখতে পাই যে, সংবিধান প্রণয়ন কমিটি আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর শারীয়াহ তথা আইন পরিবর্তন করেছে। তাহলে তারা আমাদের দ্বীনের সাথে তাই করেছে যা আল্লাহর নাবী মুসার দ্বীনের সাথে এবং আল্লাহর নাবী ঈসার দ্বীনের সাথে পণ্ডিতরা ও পাদ্রীরা করেছিল।

“তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের নীতি-পদ্ধতি পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করবে, বিঘতে বিঘতে ও হাতে হাতে, এমনকি তারা যদি সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে তাহলেও তোমরা তাদের অনুসরণ করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! পূর্ববর্তী উম্মাত বলতে তো ইহুদী ও খ্রিস্টানরাই উদ্দেশ্য? তিনি বললেন, তবে আর কারা?” অতএব ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের আলেমরা যা করেছিল এই উম্মাতের মধ্যেও তা ঘটবে - কতিপয় আলেমরা আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর শারীয়াহ’র সাথে তাই করবে যা ঐ সকল লোকেরা তাদের নাবীগণের শারীয়াহ’র সাথে করেছিল। **এটা হচ্ছে প্রথম দলিল।**

দ্বিতীয় দলিলঃ আমাদের সত্য শারীয়াহ’তে একটি মূলনীতি রয়েছে। তা হচ্ছেঃ “ইসলামী আহকাম এর কারণসমূহের সাথে ঘুরাফেরা করে। যেখানে কারণ উপস্থিত হবে সেখানে হুকুম উপস্থিত হবে।” ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের আলেমদেরকে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর ‘রব’ নাম দেওয়ার কারণ কোথায়? কারণ হল তারা আল্লাহর নাবীর শারীয়াহ পরিবর্তন করেছে এবং ইহুদীরা তাদের আনুগত্য করেছে, তারা আল্লাহর নাবী ঈসার শারীয়াহ পরিবর্তন করেছে এবং খ্রিষ্টানরা তাদের আনুগত্য করেছে। তাহলে কারণ হচ্ছে আনুগত্যের সাথে পরিবর্তন করার মধ্যে; তারা

[43] হাদিসটি বুখারি এবং মুসলিম বর্ণনা করেছেন। এটা বুখারির শব্দ

পরিবর্তন করেছে এবং কিছু মানুষ এই পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করেছে। এই কারণটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। তারা আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর শারীয়াহ পরিবর্তন করেছে। তারা তা পরিবর্তন করে বিকল্প নিয়ে এসেছে। আর আপনি জানেন যে, এখন তারা যে বিকল্প নিয়ে এসেছে কত মানুষ সে ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করছে।

অতএব ইহুদীদের এবং খ্রিষ্টানদের আলেমদের থেকে যা ঘটেছে তা এই সকল লোকদের থেকেও ঘটেছে। যখন ইহুদীদের এবং খ্রিষ্টানদের আলেমদেরকে 'রব' নামকরণ করার কারণ 'পরিবর্তন করা' ছিল তখন এই কারণ সংবিধান প্রণয়ন কমিটির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত; তারা আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর শারীয়াহ পরিবর্তন করেছে অথচ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ কারো জন্য এই অধিকার দেননি যে, সে উল্লেখিত এই শারীয়াহ' র কোন বিষয় পরিবর্তন করবে। সংবিধান প্রণয়ন কমিটি এই আয়াতের হুকুমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় দলিল।

তৃতীয় দলিলঃ একে বলা হয় 'ক্বিয়াসে আউলা'। 'ক্বিয়াসে আউলা'র পরিচয়- আমি এর অর্থ উল্লেখ করছিঃ কোন নছে (কুরআনের বক্তব্যে) একটি হুকুম আসল। অতঃপর এমন একটি হুকুমের ব্যাপারে নিরব থাকা উল্লেখিত বিষয় থাকে যা উল্লেখ করা বেশি উপযোগী। অর্থাৎ একটি নছে একটি হুকুম বর্ণনা করা হয় এবং উক্ত নছ আরেকটি হুকুমের ব্যাপারে নিরব থাকে। উক্ত নছ যে হুকুমের ব্যাপারে নিরব রয়েছে তা উল্লেখ করা আরো বেশি অগ্রগণ্য ছিল যা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে। উছুলবিদগণ এর নাম দিয়েছেন 'ক্বিয়াসে আউলা'।

এর উদাহরণ - আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণীঃ

﴿فلا تَقُلْ لَّهُمَآ أُفٍّ وَّ لا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا﴾

"আর তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল।"[44] যেহেতু আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন, "আর তাদেরকে 'উফ'

[44] সুরা ইসরাঃ ২৩

বলো না।” তাই এক লোক এসে বলল, হে শাইখ! কারো জন্য তার পিতাকে অথবা তার মাতাকে প্রহার করা কী সম্ভব? আপনি বলবেন, না। যৌক্তিকতার দিক থেকে সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ আপনার ‘উঁফ’ বলাতেই সম্মত হোন না কিভাবে তিনি প্রহার করাতে সম্মত হবেন? তাহলে দলিল ‘উঁফ’ উল্লেখ করেছে কিন্তু প্রহার উল্লেখ করেনি। এটা জানা বিষয় যে, নিষেধ করার ক্ষেত্রে ‘উঁফ’ বলা থেকে প্রহার করা অধিক অগ্রগণ্য। তাই যখন ‘উঁফ’ বলাটা গ্রহণযোগ্য নয় তখন প্রহার করা গ্রহণযোগ্য না হওয়া আরো বেশি অগ্রগণ্য।

এমনিভাবে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণীঃ

﴿وَ لَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ﴾

“আর তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যতার ভয়ে হত্যা করো না।”[45] অর্থাৎ তোমরা দারিদ্রতার ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা কর না। তাহলে সম্পদশালীতার ক্ষেত্রে হত্যা না করা আরো বেশি অগ্রগণ্য। কেননা এর মধ্যে (হত্যা করার) কারণ অপ্রমাণিত। তাহলে এটাকে বলা হয় ‘ক্বিয়াসে আউলা’।

‘ক্বিয়াসে আউলা’র কারণে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি এই আয়াতের হুকুমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ইহুদীদের এবং খ্রিষ্টানদের আলেমদের থেকে বেশি অগ্রগণ্য। এই সকল ব্যক্তিদেরকে তিনটি কারণে রব হিসেবে আখ্যায়িত করা হবেঃ

প্রথম দিকঃ আল্লাহর নাবী মুসার শারীয়াহ এবং আল্লাহর নাবী ঈসার শারীয়াহ নির্দিষ্ট কিছু সম্প্রদায়ের (বানী-ইসরাঈলরে) জন্য ছিল। ঐ সকল শারীয়াহ’র ব্যাপারে আলেমরা ছলনা করেছিল। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ছলনাকারীদের রব নাম দিয়েছেন। এই সকল শারীয়াহ এবং এই ধর্ম একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য ছিল। তারা হল বানী-ইসরাঈল। যেমন সুরা ছ’দের ৫-৬ নং আয়াতে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

[45] সুরা ইসরাঃ ৩১

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِىْ وَ قَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝ وَ اِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

"আর স্মরণ করুন, যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসুল। অতঃপর তারা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিলেন। আর আল্লাহ ফাসিক্ব সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। আর স্মরণ করুন, যখন মারইয়াম-পুত্র ঈসা বলেছিলেন, হে বানী ইসরাঈল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসুল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসুল আসবেন আমি তার সুসংবাদদাতা। অতঃপর যখন তিনি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের কাছে আসলেন তখন তারা বলতে লাগল, এটা তো স্পষ্ট জাদু।" তাহলে আয়াত বক্তব্য দেয় যে, আল্লাহর নাবী মুসা বানী-ইসরাঈলের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আয়াত বক্তব্য দেয় যে, আল্লাহর নাবী ঈসাও বানী-ইসরাঈলের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। এরা ছিল একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়।

পক্ষান্তরে আল্লাহর রাসুলের শারীয়াহ সকল মানুষের নিকট এসেছে। এই শারীয়াহ নির্দিষ্ট কোন সম্প্রদায়ের নিকট আসেনি। যেমন সুরা আ'রাফের ১৫৮ নং আয়াতে রয়েছেঃ

﴿قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا﴾

"আপনি বলুন, হে মানুষ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসুল।" অতএব কোন দল, কোন গোষ্ঠী এবং কোন সম্প্রদায়ের নিকট নয়, সকল মানুষের নিকট - "আপনি বলুন, হে মানুষ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসুল।" অন্য আরেক আয়াতে রয়েছেঃ

﴿وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیۡرًا وَّ نَذِیۡرًا﴾

“আর আমরা তো আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।”[46] অন্য আরেক আয়াতে রয়েছেঃ

﴿وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعٰلَمِیۡنَ﴾

“আর আমরা তো আপনাকে সৃষ্টিকুলের জন্য কেবলই রহমতস্বরুপ পাঠিয়েছি।”[47] তাহলে ঐ সকল ধর্মগুলো নিয়ে আলেমরা ছলনা করেছে এবং পরিবর্তন করেছে যেগুলো নির্দিষ্ট কিছু সম্প্রদায়ের জন্য ছিল। আর এই দ্বীন সকল মানব জাতির জন্য; তাই যে ব্যক্তি সকল মানব জাতির দ্বীন নিয়ে ছলনা করে তার অবস্থা আরো বেশি নিকৃষ্ট হবে ঐ ব্যক্তির চেয়ে যে এমন দ্বীন নিয়ে ছলনা করে যা ছিল একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য খাছ। এটা হল প্রথম দিক।

দ্বিতীয় দিকঃ আল্লাহর রাসুল ﷺ কে প্রেরণ করার মাধ্যমে ঐ সকল শারীয়াহ’ কে রহিত করা হয়েছে। এগুলোর নির্দিষ্ট সময় ছিল। রাসুল ﷺ কে প্রেরণ করার মাধ্যমে তাওরাতের উপর আমল করা শেষ হয়ে যায় এবং ইঞ্জিলের উপর আমল করাও শেষ হয়ে যায়। এর দলিল আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণীঃ

﴿وَ مَنۡ یَّبۡتَغِ غَیۡرَ الۡاِسۡلَامِ دِیۡنًا فَلَنۡ یُّقۡبَلَ مِنۡهُ ۚ وَ هُوَ فِی الۡاٰخِرَةِ مِنَ الۡخٰسِرِیۡنَ﴾

“আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে কখনো তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।”[48] তাহলে যে শারীয়াহ’গুলোর মধ্যে ইহুদীদের এবং খ্রিষ্টানদের আলেমরা পরিবর্তন করেছিল সেগুলো আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর ইচ্ছার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য ছিল। আর এই ধর্ম আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর প্রেরণের সময় থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট

---

[46] সুরা সাবাঃ ২৮

[47] সুরা আম্বিয়াঃ ১০৭

[48] সুরা আলে-ইমরানঃ ৮৫

থাকবে। কারণ আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর পরে কোন নাবী নেই। সুরা আহযাবের ৪০ নং আয়াতে এর দলিল রয়েছেঃ

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ﴾

“মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নাবী।” তাহলে আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর পরে কোন নাবী নেই; অতএব এই শারীয়াহ আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর প্রেরণের সময় থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তাই যে ব্যক্তি এই শারীয়াহ নিয়ে ছলনা করবে যেটাকে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন সে এমন আলেম থেকে অধিক নিকৃষ্ট যে ঐ শারীয়াহ নিয়ে ছলনা করেছে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর ইচ্ছানুযায়ী যার একটি নির্দিষ্ট সময় ছিল। সংবিধান প্রণয়ন কমিটি আয়াতের হুকুমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এটা হল দ্বিতীয় দিক।

তৃতীয় দিকঃ আল্লাহ প্রদত্ত এই শারীয়াহ’কে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ পূর্ণ করেছেন, পরিপূর্ণ করেছেন এবং আমাদের জন্য মনোনীত করেছেনঃ

﴿اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا﴾

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।”[49] যখন সংবিধান প্রণয়ন কমিটি এসে এমন দ্বীন পরিবর্তন করে আল্লাহ যেটাকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং তারা এমন দ্বীনকে পরিবর্তন করে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির জন্য যেটা মনোনীত করেছেন অপরদিকে এই সকল সিফাত তাওরাতের ব্যাপারে বলা হয়নি আর না বলা হয়েছে ইঞ্জিলের ব্যাপারে তখন সংবিধান প্রণয়ন কমিটির এই সকল ব্যক্তিরা ইহুদীদের পণ্ডিতদের থেকে বেশি নিকৃষ্ট হবে এবং খ্রিষ্টানদের পাদ্রীদের থেকে বেশি নিকৃষ্ট হবে। আয়াতের হুকুমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তারা বেশি অগ্রগণ্য।

[49] সুরা মায়িদাহঃ ০৩

তাহলে এর মাধ্যমে আমরা যে ফলাফল পেলাম তা হল সংবিধান প্রণয়ন কমিটি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ কে বাদ দিয়ে রবে পরিণত হয়েছে।

সংবিধান প্রণয়ন কমিটির অন্য আরেকটি বাস্তবতাঃ

এই সকল ব্যক্তিরা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর আইনকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী।

আমরা যে দ্বিতীয় বিষয় আলোচনা করেছি 'তারা পরিবর্তন ও বিকৃত করে'এর দৃঢ়করণে এখন আমি বলছি যে, সংবিধান প্রণয়ন কমিটি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আইনকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ কাউকে এ অধিকার দেননি যে, সে আল্লাহর বিধানের কোন বিষয়কে পশ্চাতে নিক্ষেপ করবে। এর দলিল সুরা র'দের ৪১ নং আয়াতে রয়েছে, আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ বলেন,

﴿وَ اللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ؕ وَ هُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ﴾

"আর আল্লাহই হুকুম করেন এবং তার হুকুম পশ্চাতে নিক্ষেপ করার কেউ নেই এবং তিনিই দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।"

"আর আল্লাহই হুকুম করেন এবং তার হুকুম পশ্চাতে নিক্ষেপ করার কেউ নেই।" "تعقيب" এর অর্থঃ ইমাম বাগাওয়ী رَحِمَهُ الله তার তাফসীরে বলেন, "অর্থাৎ তার ফায়সালার কোন খণ্ডনকারী নেই এবং তার আইনের কোন বিরোধিতাকারী নেই।" এমনিভাবে ইমাম আলুসী অনুরূপ কথাই বলেছেন; তাহলে "تعقيب" এর অর্থ হলঃ খণ্ডন করা, প্রত্যাহার করা, বাতিল করা এবং অকেজো করা।

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ আমাদের জন্য এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গতর এবং একে আমাদের জন্য মনোনীত করার পর তিনি এই অধিকার কাউকে দেননি। আর আপনি যেমন জানেন, সংবিধান প্রণয়ন কমিটি আল্লাহর দ্বীনের এমন কোন বিষয় বাদ রাখেনি যা তারা পিছনে ছুড়ে ফেলেনি– "তিনিই দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।" তাই আমরা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর নিকট কামনা করি তিনি যেন আখিরাতের পূর্বে দুনিয়ায় তাদের হিসাব গ্রহণ ত্বরান্বিত করেন।

প্রত্যাহার করা, খণ্ডন করা, অকেজো করা এবং পরিবর্তন করা-এ সবগুলোই পশ্চাতে নিক্ষেপ করার অন্তর্ভুক্ত। তা হচ্ছে এমন যে, আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ একটি আইনের মাধ্যমে ফায়সালা করলেন, অতঃপর কিছু মানুষ এসে এই আইন ব্যতীত অন্য আরেকটি আইন নিয়ে আসল - হোক সেটা বৃদ্ধি করা অথবা হ্রাস করা অথবা পরিবর্তন করা অথবা প্রত্যাহার করা—এ সবগুলোকে 'পশ্চাতে নিক্ষেপ করা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

অতএব সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সকলে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর আইনসমূহকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছে। বরং তারা এমন কোন বিষয় বাদ রাখেনি যা তারা নষ্ট করেনি। তাদের এ বক্তব্য যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলেঃ "ইসলামী শারীয়াহ আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি উৎস। বিবাহ সংক্রান্ত আইন শারীয়াহ'র আইন, তালাকের আইন শারীয়াহ'র আইন ..." না, আপনাকে যেন এই বক্তব্য ধোঁকা না দেয়; কারণ তারা এটা গ্রহণ করেছে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণের ভিত্তিতে। আমাদের দ্বীনে তারা যা পেয়েছে এর চেয়ে যদি উত্তম কিছু পেত তাহলে তারা তাই গ্রহণ করত।

সংবিধান প্রণয়ন কমিটির বাস্তবতাসমূহের মধ্য থেকে চতুর্থ বাস্তবতাঃ

তারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর অংশীদার।

আমরা বলেছি, তারা সমকক্ষ, তারা রব, তারা পশ্চাতে নিক্ষেপকারী। আমরা এখন বলছি, তারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শরীক বা অংশীদার। এর দলিল সুরা শুরার ২১ নং আয়াতে রয়েছে, আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ﴾

"তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?"

হে ভাইগণ! সংবিধান প্রণয়ন কমিটি যা প্রণয়ন করে তা একটি দ্বীন। এটা

একটি দ্বীন; কারণ আপনি যেমন জানেন, দ্বীন শব্দকে সত্য দ্বীনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় এবং বাতিল দ্বীনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়। সুতরাং বাতিলকে দ্বীন হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং হক্ব তথা সত্যকেও দ্বীন হিসেবে অভিহিত করা হয়। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাব থেকে এর দলিল হচ্ছে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণীঃ "আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত তালাশ করে।" কী তালাশ করে? "অন্য কোন দ্বীন।"[50] তাহলে ইসলাম ছাড়াও দ্বীন তথা ধর্ম রয়েছে। ইসলাম একটি দ্বীন এবং ইসলাম ছাড়া অন্যান্য বাতিল ধর্মকেও আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ দ্বীন হিসেবে অভিহিত করেছেন।

অন্য আরেকটি দলিলঃ সুরা কাফিরূনের ০৬ নং আয়াতে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

"তোমাদের দ্বীন (কর্মফল) তোমাদের, আর আমার দ্বীন (কর্মফল) আমার।" তাহলে মুশরিকরা যার উপর ছিল আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ সেটাকে দ্বীন নাম দিয়েছেন।

এমনিভাবে ফিরআউন বলেছিল,

﴿ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾

"আর ফিরআউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও আমি মূসাকে হত্যা করব এবং সে যেন তার রবকে আহবান করে। নিশ্চয়ই আমি আশঙ্কা করি যে, সে তোমাদের দ্বীন পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে।"[51] সুতরাং সে যার উপর ছিল সেটাকে সে দ্বীন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ আমাদের জন্য কুরআনে ওহী করে এটা বর্ণনা করেছেন।

অতএব সত্য দ্বীনকে দ্বীন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ইসলামকে দ্বীন

[50] সুরা আলে-ইমরানঃ ৮৫

[51] সুরা গাফিরঃ ২৬

হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আর ইসলাম ছাড়া অন্য সকল শারীয়াহ বা আইনকেও দ্বীন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় - হোক সেগুলো আসমানী অথবা যমীনে সৃষ্ট তা সমান। যেহেতু তারা যা প্রণয়ন করে তা মানুষের জীবনে আইন হিসেবে নির্দিষ্ট হয় এবং তাদের জীবন বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে তা প্রবিষ্ট হয় তাই এটাকে দ্বীন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু তা বাতিল দ্বীন যার ব্যাপারে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ অনুমতি দেননি; তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর দ্বীন ব্যতীত কোন দ্বীন তৈরি করে সে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর দ্বীন বাদ দিয়ে বাতিল দ্বীন তৈরি করল। আর আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ এই দ্বীন তৈরি করার ব্যাপারে তাকে অনুমতি দেননি। তাই দ্বীন তৈরিকারী নিজেকে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শরীক সাব্যস্ত করল। এই দ্বীন তৈরিকারী নিজেকে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শরীক সাব্যস্ত করল। আমরা আমাদের প্রথম দারসে বলেছিলাম এটা হচ্ছে সমকক্ষের অর্থ।

তাহলে তারা হচ্ছে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শরীক। কারণ তারা এমন এক দ্বীন তৈরি করেছে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যে ব্যাপারে অনুমতি দেননি। আর এটা একটি বাতিল দ্বীন।

সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সাথে সম্পর্কিত সর্বশেষ বাস্তবতা অর্থাৎ পঞ্চম বাস্তবতাঃ

তারা শয়তানের বন্ধু।

এর দলিল আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি–সুরা আনআমের ১২১ নং আয়াতে রয়েছেঃ

﴿وَإِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ﴾

“নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা (ওহী) দেয়।”

আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ঐ ক্ষুদ্র অংশকে শয়তানের ওহী নাম দিয়েছেন। যখন তারা বলেছিল, “কেন তোমরা তোমাদের যবেহকৃত বকরী ভক্ষণ কর অথচ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যে বকরী হত্যা করেন তোমরা সেটি ভক্ষণ কর না?” তাহলে মৃত বস্তু ভক্ষণ

করা একটি আইন। এই আইন সম্পর্কে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন, এটা শয়তানের পক্ষ থেকে তার বন্ধুদের নিকট একটি ওহী ছিল।

ঠিক আছে, সংবিধান প্রণয়ন কমিটি যখন কামরায় একাকী এই সকল আইন ও সংবিধান প্রণয়ন করা শুরু করে যেগুলো আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আইনসমূহকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে, প্রত্যাখ্যান করে, নষ্ট করে, পরিবর্তন করে এবং বিকৃত করে। এই সকল ধারা যখন তারা লিপিবদ্ধ করে আমি দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত তখন শয়তান তাদের সাথে কামরায় অবস্থান করে। যদিও তাকে দেখা যায় না। সে তাদের নিকট ওহী করে এবং তাদের অবকাশ দেয় আর তারা এই সকল ধারা এবং সংবিধান লিপিবদ্ধ ও প্রণয়ন করে।

এই কামরায় তাদের সাথে শয়তানের অবস্থানের ব্যাপারে আমি কিভাবে নিশ্চিত হলাম? কারণ যার নিকট আসমান এবং যমীনের কোন কিছু গোপন নয় তিনি বলেছেন, "নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা (ওহী) দেয়।" মানুষের মধ্যে শয়তানের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হচ্ছে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি; কারণ একজন ব্যক্তি যে হুকুম বা আইন নিয়ে আসে সেটা শয়তানের নিকট কোন কিছুর সমতুল্য হয় না। তাই সম্ভব যে, সে তার জন্য ক্ষুদ্র একটি বিষয়ের ওহী করে যেমন মৃত বস্তু ভক্ষণ করা এবং মৃত বস্তু ভক্ষণ না করা। আর এই সকল ব্যক্তিরা আইন এবং পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তৈরি করে যা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই এই আয়াতে কারীমার বক্তব্য অনুযায়ী সংবিধান প্রণয়ন কমিটিকে শয়তানের বন্ধু হিসেবে গণ্য করা হয়।

সুতরাং আপনি যখন জানলেন যে, সংবিধান প্রণয়ন কমিটি হচ্ছে সমকক্ষ, রব, পশ্চাতে নিক্ষেপকারী, আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শরীক এবং শয়তানের বন্ধু তখন নিশ্চিতভাবেই আপনার নিকট এই সকল লোকদের হুকুম স্পষ্ট।

উপরন্তু উপকারার্থে আমি বলি, আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যখন কোন ফায়সালা দেন তখন কারো জন্য পছন্দ করেন না সে এই ফায়সালা বা আইনকে পরিবর্তন করবে এবং বিকৃত করবে। এর উদাহরণ সুরা তাওবার ৩৬ নং আয়াতে রয়েছে, আল্লাহ

تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ

“নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর কাছে গণনায় মাস বারটি। তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস। এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন। কাজেই এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না।” এটা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর বিধান যে, তিনি যখন পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী সৃষ্টির বিধানে ছিল মাস হবে বারটি। কিন্তু এই সকল মাসের মধ্যে চারটি মাস হচ্ছে হারাম মাস। এটা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর পক্ষ থেকে একটি আইন বা বিধান। মক্কার মুশরিকরা এই হারাম মাসগুলোকে পরিবর্তন করেছিল। যখন তারা মুহাররাম মাসে আসত আর হারাম মাস হল আপনি যেমন জানেন, রজব, মুহাররাম, যুল-ক্বদ এবং যুল-হাজ্জ। মুহাররাম মাস হল হারাম মাসের অন্তর্ভুক্ত। মক্কার মুশরিকরা এই সকল হারাম মাস সম্পর্কে জানত। কিন্তু তাদের কারো নিকট এ বিষয়ের দায়িত্ব অর্পিত হলে সে বলত, মুহাররাম মাস এই বছর হালাল। সে হারাম মাসকে অন্য আরেক মাসে পরিবর্তন করে দিত।

ফলে তারা হারামকে হালালে পরিণত করত এবং হালালকে হারামে পরিণত করত; সুতরাং এটা হচ্ছে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর বিধানসমূহের মধ্য থেকে একটি বিধানকে পরিবর্তন করা ও বিকৃত করা।

যারা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বিধানসমূহের ক্ষেত্রে পরিবর্তন করে অথবা বিকৃত করে আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন,

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ

“নিশ্চয়ই কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফরি বৃদ্ধি করে, এর দ্বারা কাফিররা পথভ্রষ্ট হয়, তারা এটি এক বছর হালাল করে এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা

আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার সংখ্যা ঠিক রাখতে পারে। ফলে আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা তারা হালাল করে।”[52] তাহলে এটা হল মুশরিকদের ঐ সকল মাসকে হারাম থেকে হালালে পরিবর্তন করা এবং হালালকে হারামে পরিবর্তন করা। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এটা শুধু কুফর বলেননি বরং তিনি বলেছেন, এটা কুফরের ক্ষেত্রে বৃদ্ধিকরণ; কারণ এই কাজকে তোমরা এমন কুফরের সাথে যুক্ত করেছো যা এই কুফরের পূর্বে তোমাদের নিকট ছিল। তাহলে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কেবল মুরতাদ কাফির নয়। বরং তারা কুফরের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি করেছ–ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্

আমার বক্তব্য এতোটুকুই। আমি আল্লাহর নিকট আমার জন্য এবং আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন! এর মাধ্যমে আমরা আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় অংশ শেষ করব তা হল সংবিধান প্রণয়ন কমিটির হুকুম।

---

[52] সুরা তাওবাঃ ৩৭

আনুগত্যের শিরক সংক্রান্ত উৎকর্ষ বিবরণ

শাইখ আবু আলী আল-আনবারী আল-কুরাইশী رحمه الله

চতুর্থ দারসঃ

সংবিধানের বাস্তবতা এবং এব্যাপারে শারীয়াহ’র হুকুম

الحَمدُ لله والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسُولِ الله؛

হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে হক্বকে হক্ব হিসেবে দেখান এবং হক্ব অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করুন, বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখান এবং বাতিল বর্জন করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদের এমন বিষয় শিক্ষা দিন যা আমাদের উপকার করবে এবং আপনি আমাদের যা শিক্ষা দেন এর মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে আমাদের ইলম অনুযায়ী আমলকারী বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন আমাদের ইলমকে আমাদের জন্য দলিল বানিয়ে দিন এবং আমাদের বিরুদ্ধে দলিল বানাবেন না - - ইয়া আরহামার-রহিমীন! হে আমার রব! আপনি আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিন, আমার বিষয়াদি সহজ করে দিন এবং আমাদের মুখের জড়তা দূর করে দিন যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে। হে আল্লাহ আপনি আমার কর্মকে সৎ বানিয়ে দিন, আপনার সন্তুষ্টির জন্য খালিছ করে দিন এবং আপনার সৃষ্টির কারো জন্য এতে কোন অংশ রাখবেন না।

অতঃপর,

আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে আমরা গত দারসে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর হাদিসের মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কতিপয় সিফাত প্রমাণ করেছি। আমরা বলেছি, এই সকল লোকেরা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে। ইনশা'আল্লাহ আজকে আমাদের আলোচনা হবে সংবিধান সম্পর্কে।

সংবিধানের বাস্তবতা কী? এবং এব্যাপারে শারীয়াহ'র হুকুম কী?

আমি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাহায্যে বলছিঃ আপনি জানেন যে, মানুষ সামাজিক। সে তার স্বজাতির লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন-যাপন করতে

সক্ষম নয়। যেহেতু মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে জীবন-যাপন করে তাই এমন আইন বিদ্যমান থাকা আবশ্যক যা এই সকল সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনকে সুশৃঙ্খল করে। সেখানে এমন কোন আইন ছাড়া সমাজবদ্ধ হয়ে তাদের জীবন-যাপন করা সম্ভব নয় যা তাদের জীবনকে সুশৃঙ্খল করে। এই সকল আইন যেগুলো মানুষের জীবনকে সুশৃঙ্খল করে সেগুলো যেখানে পাওয়া যায় - হোক ছোট সমাজে অথবা বৃহৎ সমাজে–তা দুই ভাগে বিভক্তঃ হয়তো তা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত আইন হবে। নতুবা যখন তারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শারীয়াহ'কে কিছুটা বিলোপ করে তখন আপনি দেখতে পাবেন, তারা নিজেদের জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে যতক্ষণ না তারা তাদের জীবনকে সুশৃঙ্খল করে; তাহলে মানুষ শারীয়াহ তথা আইন ব্যতীত স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে না - হোক সেটা আল্লাহ প্রদত্ত আইন অথবা মানুষের প্রণয়নকৃত বা গঠনকৃত আইন। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ সর্বশেষ রিসালাত তার রাসুলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। আর আপনি যেমন জানেন, প্রত্যেক সময় ও প্রত্যেক স্থানের জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই শারীয়াহ বা আইন যথোপযুক্ত।

যে সকল আইন মানুষের পক্ষ থেকে প্রণয়ন করা হয় 'তারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শারীয়াহ'কে কিছুটা অপসারণ করে'। তারা কিছু আইন এবং সংবিধান নিয়ে এসেছে। এই সকল আইনের বাস্তবতা কী? এবং এই সকল সংবিধানের বাস্তবতা কী?

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শারীয়াহ ব্যতীত প্রতিটি আইন এবং প্রতিটি সংবিধান সবগুলোই কোন পার্থক্য ছাড়াই জাহিলী আইন বা বিধিবিধান। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাব থেকে দলিল, সুরা মায়িদাহ'র ৪৯-৫০ নং আয়াতে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণীঃ

وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ۞ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

"আর নিশ্চয়ই অধিকাংশ মানুষ ফাসিক্ব। তবে কি তারা জাহিলিয়্যাতের বিধিবিধান কামনা করে? আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে আর কে শ্রেষ্ঠতর?" আপনি কিভাবে এই আয়াতের মাধ্যমে এই বিষয়ের উপর দলিল পেশ করবেন যে, আল্লাহ প্রদত্ত আইন ব্যতীত সকল আইন জাহিলী আইন বা

বিধিবিধান? আমরা এই আয়াতে কারীমার কতিপয় শব্দের নিকট বিরতি দিচ্ছিঃ

প্রথম শব্দঃ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এই আয়াতে একটি শব্দ উল্লেখ করেছেন, "জাহিলী"। **অতঃপর তিনি অন্য আরেকটি শব্দ উল্লেখ করেছেন,** তিনি বলেছেন, "আইন"। অর্থাৎ এই সকল জাহিলদের কিছু আইন ছিল। এটা হল দুইটি শব্দ। এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন, অধিকাংশ মানুষ এই সকল জাহিলী আইন চায়। **এটা হল তৃতীয় শব্দ।** এই আয়াতে কারীমায় **চতুর্থ শব্দটি হলঃ** ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর ফায়সালা যে এই সকল জাহিলী আইন চায়–তারা ফাসিক্বঃ "আর নিশ্চয়ই অধিকাংশ মানুষ ফাসিক্ব। তবে কি তারা জাহিলিয়্যাতের বিধিবিধান কামনা করে? আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে আর কে শ্রেষ্ঠতর?"[53]

অতএব শুরুতে আমাদের জানা প্রয়োজন যে, জাহিলী দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এরপর আমরা জানব জাহিলিয়্যাতের আইন কী? এরপর আমরা জানব গঠনকৃত আইন এবং সংবিধানসমূহের সাথে এই আয়াতে কারীমার সম্পর্ক কী

জাহিলিয়্যাতের সম্বন্ধেঃ ইমাম ইবনে হাজার رَحِمَهُ اللهُ 'ফাতহুল বারী'তে বলেন, "জাহিলিয়্যাতকে সাধারণত অতীত সময়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ ইসলামের পূর্বের সময়। সম্ভাব্য এর সীমা শেষ হয় মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে।" তাহলে ইবনে হাজার رَحِمَهُ اللهُ জাহিলিয়্যাতের পরিচয় দিয়েছেন যে, জাহিলিয়্যাতের সময় ছিল আল্লাহর রাসুল ﷺ কে প্রেরণের পূর্বের সময়। আর এই জাহিলিয়্যাত এবং এই সময় মক্কা বিজয় হওয়া পর্যন্ত চলমান ছিল। মক্কা বিজয় হওয়ার পর এই যুগ শেষ হয়ে যায়। ইমাম ত্বহাওয়ী رَحِمَهُ اللهُ 'মুশকিলুল আছার' গ্রন্থে মুজাহিদ رَحِمَهُ اللهُ থেকে নকৃল করেছেন, তিনি বলেছেন, "জাহিলিয়্যাত হল ঈসা এবং মুহাম্মাদ ﷺ -এর মধ্যবর্তী সময়।" তাহলে তিনি ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام থেকে আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর আগমন পর্যন্ত এই সময়কে মক্কাবাসীদের দিকে সম্পৃক্ত করে বলেছেন–এটা হল জাহিলিয়্যাতের সময়। অতএব এই সময়কে ইতিহাসে জাহিলী সময় হিসেবে পরিচয়

---

53 সুরা মায়িদাহঃ ৪৯-৫০

দেওয়া হয়।

উপকারার্থে আমি একটি বিষয় উল্লেখ করছিঃ আপনি জানেন যে, বাথ পার্টির সদস্যরা একটা সময় এই দেশ শাসন করেছিল। এই সকল লোকদের মনোভাব ছিল জাতীয়তাবাদী—ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্। যখন ঐ তাগুতী সময়ে তাদের অগ্রগামী নেতা ইতিহাসের কিতাব পুনরায় করণের আদেশ করল তখন তারা কিছু শব্দকে নতুনরূপে ফিরিয়ে আনল। যে সকল শব্দকে তারা নতুনরূপে ফিরিয়ে এনেছে-এর মধ্যে রয়েছেঃ তারা 'জাহিলী যুগ' শব্দকে বিলুপ্ত করে নতুন একটি পরিভাষা নিয়ে আসল। তারা এর নাম দিল 'ইসলাম পূর্ব যুগ'। কারণ তারা যে জাতীয়তাবাদকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করত তা তাদের জন্য ঐ বিগত সময়ের ঐ সকল মুশরিকদের যারা শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে জাহিলী নামে আখ্যায়িত করতে অস্বীকার করে। তারা আরবদের উপর - যদিও ঐ সময়টা শিরকের উপর ছিল - জাহিলী নাম প্রয়োগ করতে নাক ছিটকায়। ফলে তারা এই পরিভাষাকে 'ইসলাম পূর্ব যুগ' পরিভাষায় পরিবর্তন করেছে। তাই মানুষ যেন সতর্ক থাকে যখন সে এই ধরনের পরিভাষা ব্যবহার করবে। কারণ এই পরিভাষাটি হচ্ছে বাথিষ্ট পরিভাষা। আর ইসলামী পরিভাষাগুলোকে আমরা আঁকড়ে ধরব। আমরা ঐ সময় বা যুগকে জাহিলী যুগ নামে আখ্যায়িত করব। তাহলে আপনি এখন জানলেন যে, এই দীর্ঘ সময়টি রাসুল ﷺ -এর পূর্বে ছিল।

এই যুগের অস্তিত্বের ব্যাপারে দলিল কী?

প্রথমে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর কিতাব থেকে; আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর বাণীঃ "তবে কি তারা জাহিলিয়্যাতের বিধিবিধান কামনা করে?"[54] তাহলে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ প্রতিপন্ন করলেন যে, সেখানে জাহিলিয়্যাত রয়েছে। এমনিভাবে সুরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে রয়েছেঃ

﴿وَ قَرْنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى﴾

[54] সুরা মায়িদাহঃ ৫০

“আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না।” উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মায়েদের প্রতি এবং আমাদের মায়েদের মধ্য হতে মুসলিম নারীদের প্রতি, তারা যেন প্রথম জাহিলী যুগের সৌন্দর্য প্রদর্শনের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। নিশ্চিতভাবেই এই জাহিলিয়্যাত আমাদের মায়েদের কাছে পরিচিত ছিল যখন তাদেরকে সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে নিষেধ করা হয়েছে যেমন জাহিলিয়্যাতে তারা সৌন্দর্য প্রদর্শন করত; তাহলে আয়াত নির্দেশ করে যে, জাহিলিয়্যাতের যুগ ইসলামের যুগের নিকটেই ছিল।

আর আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর সুন্নাহ হাদিস থেকে দলিলঃ ইমাম মুসলিম رَحِمَهُ الله বিদায় হজ্জের ভাষণ সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। রাসুল ﷺ বলেছেন, “জাহেলী যুগের সুদও বাতিল হল। আমি প্রথমে যে সুদ বাতিল করছি তা হল আমাদের বংশের আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল হল।” সুতরাং তিনি এটাকে কী নামে আখ্যায়িত করেছেন? তিনি বলেছেন, “জাহেলী যুগের সুদও বাতিল হল।” কিছু মানুষ আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সাথে সুদের মাধ্যমে লেনদেন করত। তার জন্য জাহিলিয়্যাতের সময় এক প্রকার দেওয়া-নেওয়া সুদ ছিল রাসুল ﷺ যেটাকে ইসলাম আসার সাথে বাতিল করেছেন; তাহলে ইসলামের পূর্বে যে সময় ছিল সেটা হচ্ছে জাহিলিয়্যাত। এটা হচ্ছে একটি দলিল।

আরো একটি দলিলঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -এর হাদিস। তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে ভাল কাজ করবে জাহিলী যুগে সে কী করেছে তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর মন্দ কাজ করে তাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাকড়াও করা হবে।”[55]

তাহলে যুগটি নিকটেই ছিল - “যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে ভাল কাজ করবে জাহিলী যুগে সে কী করেছে তার জন্য পাকড়াও করা হবে না।” অতএব ইসলামের পূর্বে যে সময় ছিল সেটা ছিল জাহিলিয়্যাত। এমনিভাবে আবু হুরায়রা

[55] বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

رَضِيَاللهُعَنْهُ -এর হাদিস, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন যখন তাকে সর্বোত্তম মানুষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, "জাহিলিয়্যাতের সময় তোমাদের উত্তমরা ইসলামে তোমাদের মধ্যে উত্তম যখন তারা জ্ঞানার্জন করবে।"[56] তাহলে তখন কিছু মানুষ ছিল যারা জাহিলিয়্যাতের সময় উত্তম ছিল। এই সকল উত্তম লোকেরা যখন ইসলাম গ্রহণ করবে তখন তারা ইসলামের মধ্যেও সর্বোত্তম হবে এ শর্তে যে, তারা জ্ঞানার্জন করবে।

তাহলে আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর এই সকল হাদিস হতে চূড়ান্ত সীমা হচ্ছেঃ জাহিলিয়্যাতের সময় হল ইসলামের পূর্বের সময়। আর ইসলামের পরের সময় হচ্ছে ইসলাম। এটা হল আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর হাদিসসমূহের দিকে সম্পর্কিত দলিল।

সাহাবীগণ আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর সামনে এই অর্থে জাহিলিয়্যাতকে উল্লেখ করতেন। কিন্তু তিনি আপত্তি করেননি। এই সকল হাদিসের মধ্যে রয়েছেঃ

ওমর رَضِيَاللهُعَنْهُ -এর হাদিস ইমাম বুখারি رَحِمَهُاللهُ ও মুসলিম رَحِمَهُاللهُ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি জাহিলিয়্যাতের সময় মানত করেছিলাম যে, মাসজিদুল হারামে আমি এক রাত ই'তিক্বাফ করব। অতঃপর রাসুল ﷺ তাকে বললেন, তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর।"[57]

"আমি জাহিলিয়্যাতের সময় মানত করেছি যে, আমি ই'তিক্বাফ করব;" তাহলে ওমর رَضِيَاللهُعَنْهُ জাহিলিয়্যাতের সময় বেঁচে ছিলেন এবং তিনি ঐ সময়কে যা ইসলামের পূর্বে ছিল সেটাকে জাহিলিয়্যাত নামে আখ্যায়িত করেছেন আর রাসুল ﷺ তার ব্যাপারে কোন আপত্তি করেননি। তাহলে বিষয়টি সাহাবীগণের নিকট স্বীকৃত ছিল যে, ইসলামের পূর্বে তাদের জীবনের সময়টি ছিল জাহিলিয়্যাতের সময়।

[56] সহীহ আল-জামে

[57] মুত্তাফাকুন আলাইহি

এমনিভাবে হাকীম ইবনে হিযাম رَضِيَاللَّهُعَنْهُ -এর হাদিস ইমাম বুখারি ও মুসলিম رَحِمَهُمَاللهُ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! কিছু বিষয়ের মাধ্যমে আমি জাহিলী যুগে পুণ্য কাজ করেছি- যেমন সাদাক্বাহ করা, মুক্ত করা, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা। এগুলোর কি প্রতিদান পাবো?" কিছু বিষয়ের মাধ্যমে আমি জাহিলিয়্যাতের সময় পূণ্য কাজ করেছি... এখন তিনি মুসলিম। কিন্তু তিনি জাহিলিয়্যাতের সময় কিছু কাজ করেছিলেন, যেমন সাদাক্বাহ, মুক্ত করা, আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা। মুক্ত করা মানে হল দাস মুক্ত করা। তিনি বলেছেন, "তুমি পূর্বের ভালো কাজের উপর ইসলাম গ্রহণ করেছো।" এটা হল বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনা। আর মুসলিম رَحِمَهُاللهُ হাকীম ইবনে হিযাম رَضِيَاللَّهُعَنْهُ থেকে বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "আমি বললাম, আমি জাহিলিয়্যাতের সময় যা করেছি ইসলামে এর অনুরূপই করেছি।"[58]

হাকীম ইবনে হিযাম رَضِيَاللَّهُعَنْهُ আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর সামনে স্বীকার করেছেন যে, তিনি জাহিলিয়্যাতের সময় বেঁচে ছিলেন এবং জাহিলিয়্যাতের সময় কিছু কাজ করেছেন। এখন তিনি ইসলামের মধ্যে থেকে ঐ সকল কাজের পরিণাম কী হবে তা জিজ্ঞাসা করছেন যেগুলো তিনি জাহিলিয়্যাতের সময় করেছিলেন। তাহলে সাহাবীগণও ঐ সময়কে জাহিলিয়্যাতের সময় হিসেবে উল্লেখ করতেন।

এমনিভাবে ইমাম বুখারি رَحِمَهُاللهُ তার সহীহ গ্রন্থে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন, তিনি বলেছেন, অধ্যায়ঃ যখন সে জাহিলিয়্যাতের সময় মানত করে অথবা কসম করে যে, সে একজন মানুষের সাথে কথা বলবে না অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করে। এই অধ্যায়টি ইমাম বুখারি রচনা করেছেন। কেমন যেন মনে হয় তিনি প্রমাণ করেছেন যে, তখন জাহিলী সময় ছিল এবং ইসলামে স্থানান্তরিত হওয়ার পর সেটা অন্য আরেকটি বিষয় হয়।

এমনিভাবে ইমাম মুসলিম رَحِمَهُاللهُ তার সহীহ গ্রন্থে দুইজন তাবেঈর কথা উল্লেখ করেছেন। তারা দুইজন হলেন আবু উসমান আন-নাহদী এবং আবু রাফী

[58] এই বর্ধিত অংশ ইমাম মুসলিমের

আস-সাইগ। তিনি বলেন, “তারা হলেন ঐ সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যারা জাহিলিয়্যাতের সময় পেয়েছেন এবং আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর সাহাবীগণের সঙ্গী হয়েছেন।”

তাহলে এই প্রত্যেকটি বিষয় হাদিসসমূহের মাধ্যমে আপনার নিকট প্রমাণ করে যে, আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর আগমনের পূর্বে যে সময় ছিল সেটাকে জাহিলী যুগ নামে আখ্যায়িত করা হয়। এই দলিলগুলোর ব্যাপারে আমার জোড় দেওয়ার কারণ হল মাস'আলাটি কোন গুরুত্বহীন মাস'আলা নয়।

তাহলে আপনি এখন আয়াতের প্রথম বিষয় বুঝলেন যে, “জাহিলিয়্যাতের বিধান” বাক্য থেকে জাহিলিয়্যাত শব্দ দ্বারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর উদ্দেশ্য কী। এখন আমরা আসি বিধিবিধান বা আইনের নিকট। যেহেতু আমরা জানলাম এই সময়টি জাহিলিয়্যাতের সময়।

তাহলে জাহিলিয়্যাতের বিধান দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেন, “আর নিশ্চয়ই অধিকাংশ মানুষ ফাসিক্ব। তবে কি তারা জাহিলিয়্যাতের বিধিবিধান কামনা করে? আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে আর কে শ্রেষ্ঠতর?”[59] তাহলে এই সকল জাহিল লোকদের আইন ছিল। সেই আইনগুলো কী?

আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ঐ সকল আইনের একাংশ উল্লেখ করেছেন যেগুলো জাহিলিয়্যাতের সময় মুশরিকদের জীবনকে বিন্যস্ত করত। এই সকল আইনের মধ্যে হোক সেটা দ্বীনী অথবা দুনিয়াবি তা সমান। সেগুলো এমন আইন ও বিধিবিধান যেগুলো তারা তাদের নিজেদের জন্য প্রণয়ন বা তৈরি করেছে। যেমনটি ইবনে কাসীর رَحِمَهُ اللهُ তার তাফসীরে বলেছেন, এগুলো তাদের চিন্তা এবং তাদের প্রবৃত্তি থেকে গৃহীত।

এই সকল বিধানের প্রথমটি হলঃ মেয়ে সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার

59 সুরা মায়িদাহঃ ৪৯-৫০

বিষয়। সুরা নাহালের ৫৮-৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمۡ بِالۡاُنۡثٰی ظَلَّ وَجۡهُهٗ مُسۡوَدًّا وَّ هُوَ کَظِیۡمٌ ﴿۵۸﴾ یَتَوَارٰی مِنَ الۡقَوۡمِ مِنۡ سُوۡٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَیُمۡسِکُهٗ عَلٰی هُوۡنٍ اَمۡ یَدُسُّهٗ فِی التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا یَحۡکُمُوۡنَ ﴿۵۹﴾

"তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সুসংবাদ দেয়া হয়, তার কষ্টের কারণে সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্বেও কি তাকে রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা ফায়সালা করে তা কত নিকৃষ্ট!" এটা ছিল তাদের ঐ সকল বিধানের একটি জাহিলিয়্যাতের সময়ের লোকেরা যেগুলোকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করত। তাদের একজন পুরুষের যখন কোন মেয়ে সন্তান হত তখন তার চেহারায় কষ্টের আলামত প্রকাশ পেত। যখন সে লোকজনের পাশ দিয়ে অতিক্রম করত তখন তারা চেষ্টা করত ভিন্ন পথ ব্যবহার করতে যেন সে তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম না করে– "তাকে যে সুসংবাদ দেয়া হয়, তার কষ্টের কারণে সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে।" সে ঐ সময়ে চিন্তা করে - "সে চিন্তা করে হীনতা সত্বেও কি তাকে রেখে দেবে।" অর্থাৎ অপমানে। নাকি- "নাকি সে তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে।" মেয়ে সন্তানকে জীবিত অবস্থায় দাফন করা হবে।

দ্বিতীয় আয়াতটি এই আইনকে নিশ্চিত করে–আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণীঃ

﴿وَ اِذَا الۡمَوۡءٗدَۃُ سُئِلَتۡ ۪ۙ﴿۸﴾ بِاَیِّ ذَنۡۢبٍ قُتِلَتۡ﴾

"আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?"[60] অন্য আরেকটি আয়াত এই অর্থকেই জোড় দেয় – সুরা আনআমের ১৩৭ নং আয়াতে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

﴿وَ کَذٰلِکَ زَیَّنَ لِکَثِیۡرٍ مِّنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ قَتۡلَ اَوۡلَادِهِمۡ شُرَکَآؤُهُمۡ﴾

[60] সুরা তাকওয়ীরঃ ০৮-০৯

“আর এভাবে তাদের শরীকরা বহু মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের সন্তানদের হত্যাকে শোভনীয় করেছে।” অতএব মাস’আলাটি এখন আইন হিসেবে রয়েছে যে, মেয়ে সন্তানদের দাফন করা শুধু প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তাদের শরীকরা তাদের জন্য সাজিয়ে দিয়েছে যে, তারা যেন তাদের মেয়ে সন্তানদের হত্যা করে অথবা দাফন করে।

আরেকটি আইন হলঃ একজন ব্যক্তি ছিল যার নাম আমর বিন লুহাই। এই ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, “আমি তাকে জাহান্নামে তার নাড়িভুঁড়ি টানতে দেখেছি।” হাদিসটি সহীহ। এই ব্যক্তি তাদের জন্য কিছু আইন প্রণয়ন করেছিল। এই সকল আইনের মধ্যে রয়েছেঃ

- সে শাম থেকে কিছু মূর্তি আমদানি করে এবং জাযিরাতুল আরবের অধিবাসীদের উদ্বুদ্ধ করে যে, তারা যেন এই সকল মূর্তির ইবাদাত করে।

- তারা বাহিরা, সাইবা, ওয়াসিলা এবং হাম তৈরি করেছিল। এগুলো হচ্ছে ঐ সকল আইনের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো আমর বিন লুহাই তাদের জন্য তৈরি করেছিল। এ সবগুলোই চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট। তারা এগুলোকে তাদের ইলাহদের জন্য ছেড়ে দিত। তাই আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ নাযিল করলেন,

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

“আল্লাহ বাহীরা, সাইবা, অছিলা ও হাম বিধিবদ্ধ করেননি। কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকে। বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশ উপলব্ধি করে না।”[61] অতএব আল্লাহ বাহিরা, সাইবা, ওয়াসিলা এবং হাম বিধিবদ্ধ করেননি। তাহলে এই সকল শব্দ এবং এই সকল আইন জাহিলিয়্যাতের সময় বিদ্যমান ছিল।

এমনিভাবে অন্য আরেকটি বিধানের কথা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ উল্লেখ করেছেন,

---

[61] সুরা মায়িদাহঃ ১০৩

﴿وَ جَعَلُوۡا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الۡحَرۡثِ وَ الۡاَنۡعَامِ نَصِیۡبًا فَقَالُوۡا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعۡمِهِمۡ وَ هٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ﴾

"আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন সে সবের মধ্য থেকে তারা আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্ধারণ করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, এটা আল্লাহর জন্য এবং এটা আমাদের শরীকদের জন্য।"[62] তাহলে এটাও ঐ সময়ের বহুল প্রচলিত আইনসমূহের একটি ছিল। দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্টও তাদের কিছু আইন ছিলঃ

হজ্জের মাস'আলায়ঃ মক্কাবাসীদেরকে হারামের অধিবাসী গণ্য করা হত। তারা আরাফার উদ্দেশ্যে বের হত না। কারণ আরাফা হারামের বাহিরে। তারা বলত, আমরা মাসজিদের অধিবাসী আমরা হারামের ভিতরে মাসজিদের ভিতর থেকে ধাবিত হব। আর হারামের অধিবাসীদের হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যে বের হওয়া-এটা তারা করত না। তাই আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ নাযিল করলেন,

﴿ثُمَّ اَفِیۡضُوۡا مِنۡ حَیۡثُ اَفَاضَ النَّاسُ﴾

"অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তন কর যেখান থেকে মানুষেরা প্রত্যাবর্তন করে।"[63] এটা ছিল বহুল প্রচলিত আইনের একটি। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى এটা স্পষ্ট করেছেন এবং এটা বাতিল করেছেন।

এমনিভাবে একজন কুরাইশী ব্যক্তি তার জামা-কাপড় পড়ে তাওয়াফ করত। আর যখন হারামের বাহির থেকে কোন ব্যক্তি আসত তখন হয়তো সে নতুন জামা-কাপড় নিয়ে আসত অথবা মক্কাবাসীর কারো থেকে কোন কাপড় ধার নিত। এই ভিত্তিতে যে, তাদের কাপড়গুলোতে তারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর অবাধ্যতা করেছে। তাই তারা যে জামা-কাপড় নিয়ে আসত সেগুলো পড়ে তাওয়াফ করত না। ফলে মক্কার ভেতর থেকে কোন কুরাইশী ব্যক্তির কাছ থেকে যে ব্যক্তি কাপড় পেত সে ঐ কাপড় পড়ে তাওয়াফ করত। আর যে ব্যক্তি কাপড় পেত না সে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করত

---

[62] সুরা আনআমঃ ১৩৬

[63] সুরা বাকারাহঃ ১৯৯

- হোক তারা নারী বা পুরুষ তা সমান—ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্। এমনকি নারীরাও উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করত। একজন সুন্দরী মহিলা বায়তুল্লাহ হারাম তাওয়াফ করতে এসে যখন কারো থেকে কোন কাপড় পেত না তখন সে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ শুরু করত। সিরাহবিদগণ এগুলোই বর্ণনা করেছেন।

আজ তার কিছু অংশ বা পুরোটা প্রকাশ পেয়েছে

আর যা প্রকাশ পায়নি সেটাকে আমি হালাল মনে করি না

এই আইনগুলো হল জাহিলিয়্যাতের আইন—ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্।

এমনিভাবে বিবাহের মাস'আলায়ঃ ইমাম মুসলিম رَحِمَهُاللهُ বর্ণনা করেছেন, আমাদের আম্মাজান আয়িশা رَضِيَاللهُعَنْهَا জাহিলিয়্যাতের সময়ের চার ধরনের বিবাহের কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের আম্মাজান আয়িশা এই ধরনগুলোর একটির কথা উল্লেখ করে এর নাম দিয়েছেন 'ইস্তিবদা' বা মূলধন গ্রহণ করা। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির স্ত্রী যখন মাসিক থেকে পবিত্র হত তখন সে তাকে বলত, তুমি অমুকের কাছে গিয়ে তার থেকে গ্রহণ করে আসো। তারা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের এবং আঞ্চলিক পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন করত। অতঃপর সে তার স্ত্রীকে ঐ পুরুষের সাথে সহবাস করার জন্য পাঠিয়ে দিত। অতঃপর যখন ঐ নারী ফিরে আসত তখন স্বামী তার গর্ভধারণ স্পষ্ট হওয়ার সময় পর্যন্ত তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকত। এরপর যখন সে গর্ভবতী হত তখন তার কাছে তার স্বামী আসার ইচ্ছা করলে তার কাছে আসত। এর কারণ হল তারা সন্তানের মধ্যে বংশমর্যাদা তালাশ করত। এটা হল এক প্রকার বিবাহ। ঐ সময়ে এটা একটি আইন হিসেবে বিদ্যমান ছিল। আমাদের আম্মাজান আয়িশা এটা উল্লেখ করেছেন।

জাহিলী যুগে বিদ্যমান আরেক প্রকার বিবাহ হলঃ তিনি বলেছেন, দশজনের কম সংখ্যক পুরুষের একটি দল মিলে এক মহিলার সাথে সহবাস করত। অতঃপর যখন সে গর্ভধারণ করে সন্তান জন্ম দিত তখন তাকে ঐ পুরুষদের নিকট পাঠানো হত। আর একজনও পিছনে পড়ে থাকতে সক্ষম হত না। অতঃপর সে এই সকল পুরুষদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করে বলত, হে অমুক তুমি এই শিশুর

পিতা। আর সেও এই শিশুকে অস্বীকার করতে সক্ষম হত না। অতঃপর এই শিশুকে ঐ পুরুষের দিকে সম্বোধন করা হত। এটা একটি আইন।

এমনিভাবে আমাদের আম্মাজান আয়িশা আরেক প্রকার বিবাহের কথা উল্লেখ করেছেনঃ তিনি বলেছেন, পুরুষরা কিছু নারীদের নিকট রাতে আগমন করত। আর এই নারীরা ছিল ব্যভিচারিণী। তাদের প্রত্যেকেই তার দরজার সামনে একটি প্রতীক রেখে দিত, যে প্রতীকসমূহের মাধ্যমে তাদেরকে চেনা যেত যে, তারা ব্যভিচারিণী। পুরুষদের মধ্যে যে ইচ্ছা করত সে তাদের নিকট রাতে আগমন করত। কিন্তু যখন সে গর্ভধারণ করে সন্তান জন্ম দিত তখন তার নিকট ক্বাফাহ'কে ডেকে পাঠানো হত। আর ক্বাফাহ ঐ সকল লোক যারা বিভিন্ন চিহ্ন দেখে প্রমাণ দিয়ে বলতে সক্ষম হয় যে, এই শিশু হল অমুকের সন্তান অথবা এই শিশু অমুকের সন্তান। ফলে তারা ক্বাফাহ'কে নিয়ে আসত। এই শিশুকে সামনে আনা হত ক্বাফাহ'রা এই শিশুকে এমন ব্যক্তির দিকে সম্পর্কিত করত শিশুর মাঝে এবং যারা ঐ নারীর নিকট রাতে আগমন করেছিল তাদের মধ্য থেকে যার মাঝে তারা সাদৃশ্য খুঁজে পেত। এই সবগুলো আইনই প্রচলিত ছিল।

প্রচলিত বিবাহগুলোর আরো একটি হলঃ যেটা এখনো মুসলিমদের বিবাহ হিসেবে পরিচিত। ফলে রাসুল ﷺ ঐ সকল বিবাহকে বাতিল করে দিয়ে ইসলামের বিবাহকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন।

তাহলে এখন আমার নিকট জাহিলিয়্যাত স্পষ্ট হল এবং ঐ জাহিলিয়্যাতের সময়ের কিছু আইন বা বিধান স্পষ্ট হল। আর এটাই আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর এবাণীর উদ্দেশ্য–"তবে কি জাহিলিয়্যাতের বিধিবিধান।" এখন আমরা তৃতীয় শব্দে আসবোঃ তিনি বলেছেন, "তারা কামনা করে।" এর অর্থ হল তারা চায়।

যখন আপনি ঐ সময়ের সরেজমিনে এই শব্দ নিয়ে অনুসন্ধান করবেন তখন আপনি আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর আগমন ও মক্কা বিজয় হওয়াতে ফিরে যাবেন- রাসুল ﷺ এই রিসালাহ বহন করা পর্যন্ত। মক্কাবাসীরা এই রিসালাহ'র ব্যাপারে আপত্তি করেছিল। তারা আক্বীদাহ-বিশ্বাসে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর একত্ববাদে বিশ্বাসী

হওয়া গ্রহণ করত না। বরং তারা বহু ইলাহ এবং বহু মূর্তির ইবাদাত করতে চাইতো। মূর্তিগুলোর বিশাল সংখ্যক মূর্তি মক্কার আশেপাশে ছিল; তাহলে "তারা কামনা করে।" তারা ঐ সকল বিধিবিধান চাইতো, তারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর একত্ববাদ চাইতো না। নাবী ﷺ মাদিনায় হিজরত করার এবং আইন-সম্পর্কিত বিধিবিধান নাযিল হওয়ার পরেও মক্কাবাসীরা এবং জাযিরাতুল আরবের অধিবাসীরা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর পক্ষ থেকে এই সকল ওহীকৃত বিধিবিধান চাইতো না। বরং তারা ঐ সকল জাহিলী বিধিবিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালা চালিয়ে যেত। আর এই সকল জাহিলী বিধিবিধানের উপর অটল থাকা এবং আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শারীয়াহ'র বিধিবিধানকে প্রতিরোধ করার জন্য তাদের উপায় ছিল যুদ্ধ করা। ফলে মক্কাবাসীরা রাসুল ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং সাহাবীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে যতক্ষণ তারা ঐ সকল জাহিলী বিধিবিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালা করা চলমান রেখেছে।

যখন আপনি একটি জরিপ চালাবেন, জাযিরাতুল আরবের কতজন লোক এই সকল জাহিলী বিধিবিধান চাইতো এবং তাদের কতজন লোক আল্লাহ প্রদত্ত শারয়ী বিধিবিধান চাইতো তখন আপনি অবশ্যই পাবেন যে, জাহিলী যুগের অধিকাংশ লোকেরা ঐ সকল জাহিলী বিধিবিধান চাইতো। একারণেই আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন, "আর নিশ্চয়ই অধিকাংশ মানুষ ফাসিক্ব। তবে কি তারা জাহিলিয়্যাতের বিধিবিধান কামনা করে? আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে আর কে শ্রেষ্ঠতর?"[64]

আপনার এই মাস'আলা সম্পর্কে এই বিস্তারিত বিবরণ জানার পর আমরা যা বলেছি সংবিধান ও আইনের সাথে—এর কী সম্পর্ক রয়েছে?

ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, ইবনে হাজার رَحِمَهُ اللّٰهُ 'ফাতহুল বারী'তে তা উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন, "এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না।" ইবনে আব্বাস বলেন, "আমরা বলতাম আরেকটি শেষ জাহিলিয়্যাত হবে।" কিভাবে আরেকটি শেষ জাহিলিয়্যাত হবে?

---

[64] সুরা মায়িদাহঃ ৪৯-৫০

তিনি বলেন, যেহেতু আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন প্রথম জাহিলিয়্যাত। তাহলে যার প্রথম আছে তার শেষও আছে। এটা ইবনে আব্বাসের তাফসীর যেমনটি ইবনে হাজার رَحِمَهُ الله তার থেকে নক্বল করেছেন।

যে সকল বিধিবিধানের মাধ্যমে মুসলিমদের দেশগুলোতে মানুষদের এবং অঞ্চলগুলোকে শাসন করা হয় সেগুলো কি জাহিলী বিধিবিধান? ঐ জাহিলিয়্যাতের সিফাত কি ঐ সকল বিধিবিধানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নাকি জাহিলিয়্যাতের সিফাত এই সকল বিধিবিধান এবং যে সকল আইন দিয়ে এখন মুসলিমদের শাসন করা হয় সেগুলোর উপর কার্যকর হবে?

এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য বিগত জাহিলিয়্যাতের সময় প্রচলিত বিধিবিধানের মাঝে এবং বর্তমানে প্রচলিত বিধিবিধানের মাঝে তুলনা করা আবশ্যক। কারণ যখন আমরা ঐ সকল জাহিলী বিধিবিধানের মাঝে এবং আইন ও সংবিধানসমূহের মাঝে কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাব এবং আমরা এই দুইয়ের মাঝে সম্মিলিত কিছু প্রকার পাব তখন আমরা বলব, জাহিলিয়্যাতের সিফাতকে ঐ সকল বিধিবিধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে এবং এই সকল বিধিবিধানের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হবে। আর তুলনা করার পরিধি কেবল বিস্তৃত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে বিস্তারিত বিবরণে প্রবেশ করা ছাড়াই; কারণ আপনার জন্য বিগত জাহিলিয়্যাতের বিধিবিধানের মাঝে এবং এই সকল আইন ও সংবিধানের মাঝে বিস্তৃত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সম্মিলিত প্রকারগুলো জানাই যথেষ্ট হবে।

আমরা প্রথম বিষয়টির নিকট অবস্থান করছিঃ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মাস'আলাসমূহের একটি হচ্ছে আক্বীদাহ'র মাস'আলা। কারণ এর আলোকেই ক্বিয়ামতের দিন মানুষের পরিণাম স্থির করা হবে। হয়তো নি'আমত পূর্ণ জান্নাতে অথবা প্রজ্বলিত জাহান্নামে—ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্।

অতীত জাহিলিয়্যাতের সময়ের আক্বীদাহঃ যখন আমি অতীতে বলব তখন আমি ঐ সকল বিধিবিধান উদ্দেশ্য করছি যেগুলো জাহিলী যুগে প্রচলিত ছিল। অতীত জাহিলিয়্যাতের সময়ে মানুষ বিশ্বাসের স্বাধীনতা চর্চা করত-এটাকে আইনী

ধারায় লিপিবদ্ধ করা ছাড়াই। কিভাবে?

মক্কাতে - আল্লাহ তা'আলা একে সম্মানিত করুন এবং মর্যাদাবান করুন- প্রচলিত আক্বীদাহ-বিশ্বাস ছিল; মূর্তির ইবাদাত করা। এটা মক্কাতে এবং জাযিরাতুল আরবের কিছু অংশে ছিল। তবে আপনি ভুলবেন না- নাজরানের অঞ্চল এবং 'ত্বই' গোত্রের এলাকাগুলোতে ঐ সকল মানুষেরা খ্রিষ্ট ধর্মের চর্চা করত -

﴿إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾

"আল্লাহ তো তিনজনের মধ্যে তৃতীয়জন।"[65] এটাও একটি আক্বীদাহ এবং ওটাও একটি আক্বীদাহ। এমনিভাবে শিরকের দিক থেকে ইয়াসরিবে প্রচলিত আক্বীদাহ ছিল ইহুদীদের আক্বীদাহ। এটাও জাযিরাতুল আরবের মধ্যে ছিল। আর জাযিরাতুল আরবের দক্ষিণে ইয়েমেন অঞ্চলে প্রচলিত আক্বীদাহ ছিল মাজুসীদের আক্বীদাহ এবং অগ্নিপূজকের আক্বীদাহ; তাহলে এই হল জাযিরাতুল আরবের চিত্র। জাযিরাতুল আরবের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রকমের আক্বীদাহ ছিল। কেউ কারো ব্যাপারে কোন আপত্তি করত না। ফলে যে ব্যক্তি ইহুদী হওয়ার ইচ্ছা করত সে ইহুদী হতে পারত, যে খ্রিষ্টান হওয়ার ইচ্ছা করত সে খ্রিষ্টান হতে পারত, যে মাজুসী হওয়ার ইচ্ছা করত সে মাজুসী হতে পারত এবং যে ব্যক্তি মূর্তি ও পৌত্তলিকের ইবাদাতকারী হওয়ার ইচ্ছা করত সে মূর্তির ইবাদাতকারী হতে পারত। কেউ কারো ব্যাপারে কোন আপত্তি করত না; তাহলে বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে জাযিরাতুল আরবের আভ্যন্তরে আইনী ধারায় লিপিবদ্ধ করা ছাড়াই চর্চা করা হত।

বিশ্বাসের স্বাধীনতার সংজ্ঞা আমি এভাবে দেইঃ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতার সাথে সাথে একাধিক উপাস্য হওয়া। এটা হল বিশ্বাসের স্বাধীনতার ব্যাপারে আমার সংজ্ঞা।

ঐ স্বাধীনতার উপর বর্তমান আইনগুলো লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমান যে রাষ্ট্রই গণতন্ত্র দ্বারা শাসিত হয় ঐ দেশের সংবিধান ও আইন বিশ্বাসের স্বাধীনতার উপর

[65] সুরা মায়িদাহঃ ৭৩

বক্তব্য দেয়। ইরাকী আইনের একটি ধারা প্রণীত হয়েছে। ১৫/১০/২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে তারা এই আইনের ব্যাপারে "হ্যাঁ" বলেছে। এই দ্বিতীয় ধারাটি ইরাকী সংবিধানের বক্তব্য। আমি বক্তব্যটি পড়ছি - এটা সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রণীত এবং তাদের প্রণয়নকৃত আইন - সংবিধানের ভাষ্য হচ্ছেঃ **"এই সংবিধান ইরাকী অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর জন্য ইসলামী বৈশিষ্ট্য রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। যেরূপ বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় চর্চার ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য পরিপূর্ণ ধর্মীয় অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। যেমন খ্রিষ্টান সম্প্রদায়, ইয়াযিদী সম্প্রদায় এবং মান্দাইন সাবেঈ সম্প্রদায়।"** ধারার বক্তব্য শেষ।

তাহলে আপনি দেখলেন যে, ইরাকী সংবিধানের দ্বিতীয় ধারাটি প্রতিটি ধর্মের জন্য বিশ্বাসের স্বাধীনতার এবং তাদের ধর্মীয় প্রথা চর্চার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়। অর্থাৎ ইয়াযিদীদের ধর্ম অনুমোদিত, খ্রিষ্টানদের ধর্ম অনুমোদিত, সাবেঈ যে তারকাসমূহের ইবাদাত করে-এই ধর্মও অনুমোদিত। বরং আইন তাদের জন্য বিশ্বাসের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয় এবং তাদের জন্য আক্বীদাহ-বিশ্বাস চর্চার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়। তাহলে অতীতের জাহিলী আইনের মাঝে এবং বর্তমানের জাহিলী আইনের মাঝে কী পার্থক্য রয়েছে?

বিভিন্ন ধর্মের বিষয়ে এই সরকারগুলোর স্পষ্ট একটি চিত্র হচ্ছে প্রত্যেকের জন্য তার ধর্ম, তার বিশ্বাস এবং তার ধর্মীয় প্রথা চর্চা করার অধিকার রয়েছেঃ যাকে বলা হয় ওয়াক্‌ফ ও ধর্ম মন্ত্রণালয়। তারা এর নাম ইসলামী মন্ত্রণালয় দেয়নি। তাদের কত বড় স্পর্ধা! ধর্ম মন্ত্রণালয় নাম রাখাই তাদের জন্য আবশ্যক কেন? কারণ আইন দেশে বিদ্যমান প্রতিটি ধর্মকে অনুমোদন দেয়; ফলে ওয়াক্‌ফ মন্ত্রণালয় মুসলিমদের মজুতকৃত কোন অংশ নয়। বরং যখন একজন ইয়াযিদী তার শয়তানের জন্য একটি উপাসনালয় তৈরি করার ইচ্ছা করবে অতঃপর ওয়াক্‌ফ মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করবে তখন ওয়াক্‌ফ মন্ত্রী তার জন্য সম্পদ ব্যয় করবে যেমন মাসজিদের জন্য করা হয়। একজন রাফিদী যখন হুসাইনিয়্যাত নির্মাণ করার ইচ্ছা করবে - যেখানে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাথে শিরক করা হয়, সাহাবীগণকে লা'নত করা হয়, গালি দেওয়া হয় এবং মুসলিমদেরকে তাকফীর করা হয়-তার

জন্যও সম্পদ থেকে ঐ পরিমাণ সম্পদ দেওয়া হবে যে পরিমাণ সম্পদ মুসলিমদেরকে দেওয়া হয় যখন তারা একটি মাসজিদ বানানোর ইচ্ছা করে। এমনিভাবে খ্রিষ্টানদের জন্য ঐ মন্ত্রণালয়ে অধিকার রয়েছে; কারণ এই মন্ত্রণালয় একাধিক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামের উপর নয়।

অতএব এটা হল সেই ধারা এবং এটা হল সেই মন্ত্রণালয় যে প্রতিষ্ঠিত করে যে, দেশ শাসিত হবে বিশ্বাসের স্বাধীনতার ভিত্তিতে। সুতরাং বিশ্বাসের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অতীতের জাহিলী আইনের মাঝে এবং বর্তমান সময়ের জাহিলী আইনের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এটা হল আক্বীদাহ-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে। তাহলে তুলনা করার ক্ষেত্রে প্রথম মাস'আলা আমরা বলেছিলাম বিশ্বাসের স্বাধীনতা।

এখন আসি হালাল হারামের ক্ষেত্রে - যাতে আমরা অতীতের জাহিলী আইনের মাঝে এবং বর্তমান সময়ের জাহিলী আইনের মাঝে তুলনা করতে পারি। এর কারণ হল আমরা যেন দেখতে পারি জাহিলিয়্যাতের সিফাত কি ঐ সকল আইনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ? নাকি এই সকল আইনকেও জাহিলী হিসেবে গণ্য করা হবে?

হালাল হারামের মাস'আলার ক্ষেত্রেঃ

আমরা প্রথম মাস'আলার নিকট অবস্থান করছিঃ মদের মাস'আলা–ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্। জাহিলিয়্যাতের সময় কারো ব্যাপারে কোন আপত্তি করা ছাড়াই মদ তৈরি করা হত। যে তৈরি করার ইচ্ছা করত সে তৈরি করতে পারত। তাদের জন্য মদ বিক্রি করার বাজার ছিল। তারা বাড়িতে মদ সঞ্চয় করে রাখত-এব্যাপারে কেউ কারো প্রতি কোন আপত্তি করত না। মদ তৈরি করা এবং পান করা হত নির্দিষ্ট স্থানগুলোতে। তাদের কিছু স্থান ছিল যেগুলোতে তারা মদ পান করত। সেগুলোকে বলা হত "হাওয়ানীত"। যেমন তরফা ইবনুল আব্দ নামক এক কবির চরণে রয়েছে। সে বলেছে,

যদি তুমি আমাকে লোকজনের হালাকায় তালাশ কর তাহলে আমার সাক্ষাৎ পাবে

আর যদি তুমি আমাকে হাওয়ানীতে তালাশ কর তাহলে শিকার হবে

হয়তো তুমি আমাকে নেতাদের সাথে পাবে আমি তাদের সাথে বসে আছি। যখন তুমি আমাকে সেখানে না পাবে তখন তুমি হাওয়ানীতে আমার খোঁজ নিবে। অবশ্যই তুমি আমাকে সেখানে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পাবে–ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্। তাহলে হাওয়ানীত ছিল মদ পানের স্থান। কিন্তু মানুষ তাদের বাড়িতেও মদ সঞ্চয় করত। এর দলিল হচ্ছে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যখন মদ হারাম করেছেন তখন সাহাবীগণ তাদের বাড়িতে থাকা মদ ঢেলে দিয়েছেন। সিরাহবিদগণ উল্লেখ করেছেন যে, মদিনার অলিগলিতে মদ প্রবাহিত হয়েছিল; তাহলে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ মদ হারাম করার পূর্বে অতীত জাহিলী আইনে শিল্পভিত্তিক মদ তৈরি করার ব্যাপারে কেউ আপত্তি করত না, মদ পানের স্থানগুলোর ব্যাপারে কেউ আপত্তি করত না। এমনিভাবে বিক্রি করার ব্যাপারে কেউ আপত্তি করত না।

বর্তমান সময়ের জাহিলী আইনে রয়েছেঃ রাষ্ট্র এই বিষয়টিকে গ্রহণ করে নিয়েছে। সেখানে রাষ্ট্রের অধীন কিছু প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি রয়েছে যেগুলোকে এনার্জি পাওয়ার ড্রিঙ্কস্ উৎপাদন কোম্পানি বলা হয়–আমি এরকম মনে করি। কখনো কখনো তারা এগুলোকে এলকোহল বা এনার্জি নাম দেয়। আমি পেপসি পাওয়ার এবং এর উৎপাদিত পণ্যগুলো বুঝাচ্ছি। কিন্তু নিশ্চিতভাবে এই এনার্জিকে ব্যবহার করা হয় নেশাগ্রস্ত পানীয়, মদ এবং অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্র–ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্। তাহলে এই ফ্যাক্টরিগুলো রাষ্ট্রের অধীনস্থ। রাষ্ট্রই মদ উৎপন্ন করে; অতএব বর্তমান সময়ের জাহিলী আইন মদের বৈধতা দেয় এই দলিলের ভিত্তিতে যে, রাষ্ট্র ঐ আইনের মাধ্যমে শাসিত হয়, মদ তৈরির ফ্যাক্টরি বানায়। আর মদ বিক্রির স্থানের ব্যাপারে বেশি প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ রাস্তার অলিগলিগুলো মদের বারে ভরপুর। এই সকল লোকেরা শুধু মদের বোতল বিক্রি করেই দুঃসাহস দেখায় না পরন্তু তারা পেশাভিত্তিক লাইসেন্স গ্রহণ করে। তাই বিক্রয়কারী তার মাথার উপর একটি পেশাভিত্তিক কাজের লাইসেন্স রেখেছে। যখন তাদের কেউ গিয়ে তার হিসাব নিবে এই ভিত্তিতে যে, তুমি আইন লঙ্ঘন করেছো। কারণ তুমি আইনী লাইসেন্স নেওয়া ছাড়া মদ বিক্রি করেছো। তাই সে মাথার উপরে ঐ লাইসেন্স স্থাপন করে। যেন কেউ তার ব্যাপারে কোন আপত্তি করতে না

পারে। তাহলে বিক্রি হয় আইনের নামে এবং আইনী লাইসেন্সের নামে।

আর মদ পানের স্থানগুলো বর্তমান সময়ের মুসলিমদের দেশগুলোর সকল রাজধানীতে দৃশ্যমান–ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্ - অধিকাংশ নগরীর প্রতিটি শহরে মদ পানের বার রয়েছে। তাহলে হালাল-হারামের মাস'আলায় অতীত জাহিলী আইনের মাঝে এবং বর্তমান সময়ের আইনের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

যিনার ক্ষেত্রেঃ আমি আপনার নিকট উল্লেখ করেছিলাম যে, ঐ সময়ে একজন মহিলা তার দরজার সামনে একটি চিহ্ন স্থাপন করত। যেমন আমাদের আম্মাজান আয়িশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -এর হাদিসে রয়েছে মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। মানুষ যখন এই ধরনের বাড়িগুলোতে যাওয়ার ইচ্ছা করত তখন তারা কোন প্রকার অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করত। কারণ ঐ মহিলা নিজের পক্ষ থেকেই ঘোষণা দিয়েছে যে, সে পুরুষদের গ্রহণ করে। আর এদেরকে ব্যভিচারিণী হিসেবে চেনা হত। এটা ছিল অতীত জাহিলী আইনে।

আর বর্তমান সময়ের জাহিলী আইনে বিষয়টি সাজানো আছে। এইভাবে যে, একজন নারী অনুমোদন সংগ্রহ করার পর যিনার অনুশীলন করতে পারে। মন্ত্রণালয়গুলোর ভূমিকায় ঐ নারীকে অনুমোদন দেওয়া হয় যেন সে যিনার লাইসেন্স সংগ্রহ করতে পারে। আর এই কাজটি করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী। কারণ এই নারীর শর্ত হচ্ছে তার মধ্যে যেন কোন সংক্রামক রোগ পাওয়া না যায়। আর এই বিষয়টি কেবলমাত্র স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। ফলে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে তাকে একটি সার্টিফিকেট দেয় যে, সে সংক্রামক রোগ থেকে মুক্ত। কারণ সে ভবিষ্যতে নিজেকে পুরুষদের জন্য পেশ করবে। তাই যদি তার মধ্যে সংক্রামক রোগ থাকে তাহলে এর অর্থ হল সে এই পেশা অনুশীলন করার উপযুক্ত নয়। এই নিরাপত্তা পরীক্ষার পরেও আবশ্যক হয় যে, তারা অনুমোদন দিবে। কারণ তারা এই সকল ব্যভিচারিণীদের পক্ষে গোয়েন্দা বিভাগের এজেন্ট নিয়োগ করে। এমনিভাবে দেশীয় অনুমোদন নির্ধারিত হয় এবং রাষ্ট্রের বাকি কাগজপত্র অনুমোদিত হয়। তাহলে সাদৃশ্যের দিকটি কোথায়?

জাহিলিয়্যাতের সময় একজন নারী একটি চিহ্ন স্থাপন করত আর বর্তমান সময়ের জাহিলী আইনে একজন নারী বিজ্ঞাপন দেয়। তাহলে পার্থক্য কী?! পার্থক্য হল ঐ সময়ে নারীটি যখন গর্ভবতী হত তখন কৃফাহ'রা তার শিশুকে কোন একজনের দিকে নিসবত করে দিত। আর বর্তমান সময়ের জাহিলী আইনে আধুনিক নারীর এই সমস্যা চিকিৎসকরা সমাধান করে দেয় এইভাবে যে, তারা তাকে প্রচুর পরিমাণে গর্ভনিরোধক ট্যাবলেট দেয়। ফলে এরপরে সে আর গর্ভধারণ করবে না যখন পুরুষরা তার নিকট রাতে আসবে–ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্। ওটা ছিল অতীতের জাহিলী আইন আর এটা হল বর্তমান সময়ের জাহিলী আইন।

একটি বাস্তবসম্মত দুঃখজনক মাস'আলার ব্যাপারে ইঙ্গিত দেওয়া জরুরী। আমরা উজ্জ্বল ইসলামী ঐতিহাসিক নামগুলোকে এই ধরনের স্থানগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার হতে দেখতে শুরু করেছি; সেভিয়া বিনোদন কেন্দ্র, কর্ডোবা বিনোদন কেন্দ্র, আন্দালুস বিনোদন কেন্দ্র, গ্রানাডা বিনোদন কেন্দ্র... আমরা এমন কোন জাতি খুঁজে পাইনি যারা এই সকল লোকদের ন্যায় তাদের ইতিহাস গুরুত্বহীন মনে করে! তাও আবার মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীদের সামনে-কর্ডোবা, সেভিয়া, গ্রানাডা বিনোদন কেন্দ্র!! বর্তমানে আমাদের উপর জিহাদ করা ফরজে আইন যতক্ষণ না আমরা ঐ দেশগুলো ইসলামের ছায়াতলে ফিরিয়ে আনি। কিন্তু আমরা এগুলো আমাদের দেশে ব্যভিচারিণীদের চিহ্ন হিসেবে দেখতে পাই! এই নামগুলো আপনি ভবনের উঁচু স্থানে দেখতে পাবেন, এমনিভাবে সিনেমাহলগুলোতে এবং মদ পানের বারগুলোর উপর দেখতে পাবেন। তাহলে যিনার মাস'আলায় অতীত জাহিলিয়্যাতের মাঝে এবং বর্তমান সময়ের জাহিলিয়্যাতের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

এমনিভাবে সুদের মাস'আলাঃ অতীত জাহিলী আইনে সুদভিত্তিক লেনদেন করা জায়েয ছিল। এর দলিল হল আমরা যা আল্লাহর রাসুল ﷺ থেকে বিদায় হজ্জের ভাষণের ব্যাপারে উল্লেখ করেছিলাম; "জাহেলী যুগের সুদও বাতিল হল। আমি প্রথমে যে সুদ বাতিল করছি তা হল আমাদের বংশের আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল হল।"[66] এটা হল ঐ সকল লেনদেনের

---

[66] মুসলিম বর্ণনা করেছেন

অন্তর্ভুক্ত যেগুলো অতীত জাহিলী আইনে অনুমোদিত ছিল।

আর বর্তমান সময়ের জাহিলী আইনঃ আপনি ব্যাংক অথবা রাষ্ট্রের অধীন ব্যয়ের খাতগুলো এবং রাষ্ট্রের অধীন নয় এমন স্থানীয় ব্যয়ের খাতগুলো দেখবেন–এ দুই ব্যয়ের খাতের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে; রাষ্ট্র সুদ দেয় ১-৪ পার্সেন্ট আর তারা স্থানীয় ব্যয়ের খাতগুলোকে অধিকার দেয় যে, তারা ১-৭ পার্সেন্ট সুদ দেয়।

প্রতারণা এবং এই দ্বীনকে মানুষের অন্তরে ধ্বংস করার লক্ষ্যে তারা সুদের ভিন্ন নাম দেয়। তারা সুদের নাম দেয় ‘মুনাফা’। তাই যখন আপনি বলবেন, অমুক মুনাফা নেয় তখন এটা আপনার ভেতরে কোন নাড়া দিবে না। কিন্তু যখন আপনি বলবেন, অমুক সুদ খায় তখন আপনার ভেতরে এই কাজের দোষ অনুভূত হবে। তাই তারা সুদ শব্দকে মস্তিষ্ক, অন্তর ও হৃদয় থেকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। তারা এই শব্দের পরিবর্তে বিকল্প শব্দ নিয়ে এসেছে। তারা এর নাম দিয়েছে ‘মুনাফা’। সুতরাং আপনি ভুলে যাবেন না–এক্ষেত্রে তাদের শাইখ ইবলীস যখন আদমকে বলেছিলঃ

﴿هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لَّا يَبْلٰى﴾

“আমি কি তোমাকে জানিয়ে দেব চিরস্থায়ী জীবনদায়ী গাছের কথা আর এমন রাজ্যের কথা যা কোনদিন ক্ষয় হবে না?”[67] আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন,

﴿وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ﴾

“তোমরা এই গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না।”[68] সে ঐ গাছের নাম দিয়েছে অমৃত এবং কর্তৃত্বের গাছ। যে শাইখ নাম পরিবর্তন করে সে হল ইবলীস যেমন ইবনে হাযম رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেছেন, “শাইখ কোন আস্থাভাজন ব্যক্তি নয়।”

---

[67] সুরা ত্বহাঃ ১২০

[68] সুরা বাকারাহঃ ৩৫

এমনিভাবে হত্যা ও অন্যান্য মাস'আলার ক্ষেত্রে—একই অবস্থা। আপনি যদি তুলনা করেন তাহলে অতীত জাহিলী আইনের মাঝে এবং বর্তমান সময়ের জাহিলী আইনের মাঝে কোন পার্থক্য খুঁজে পাবেন না। অতএব জাহিলিয়্যাতের সিফাত ঐ সকল আইনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। বরং যে সকল আইন দ্বারা শাসন করা হয় সেগুলো জাহিলী আইন বা বিধিবিধান।

সর্বশেষ আমি একটি বিষয় উল্লেখ করছি তা হলঃ তৃতীয় শ্রেণীর কিছু ব্যক্তি রয়েছে যারা বলে, "ইসলাম হচ্ছে আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের একটি উৎস।"

তারা ইসলাম থেকে কিছু গ্রহণ করে, ইহুদীদের থেকে কিছু গ্রহণ করে, খ্রিষ্টানদের থেকে কিছু এবং অন্যান্য ধর্ম থেকে কিছু গ্রহণ করে। তারা আমেরিকান, ব্রিটিশ, হিন্দী এবং এছাড়াও অন্যান্য আইন থেকে কিছু সংগ্রহ করে একত্রিত করে। অতঃপর তারা ইসলাম থেকে কিছু বিষয় নেয়। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাবে এই ধরনের ব্যক্তিদেরকে কী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে?

এই সকল ব্যক্তিদের পূর্বসূরি হচ্ছে ইহুদীরা। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাবে এই সকল ব্যক্তিদের পূর্বসূরি হচ্ছে ইহুদীরা। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ সুরা বাকারাহ'র ৮৪-৮৫ নং আয়াতে বলেন,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۝ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

"আর স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা একে অপরের রক্তপাত করবে না এবং একে অন্যকে বাড়ি থেকে বহিস্কার করবে না, তারপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে। আর তোমরা এর সাক্ষী। তারপর তোমরাই ঐ সকল লোক, যারা নিজদেরকে হত্যা করছ এবং তোমাদের একদলকে তাদের বাড়ি থেকে

বহিস্কার করছ। তোমরা নিজেরা তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন করে পরস্পরের সহযোগিতা করছ। আর তারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ আদায় কর; অথচ তাদেরকে বহিষ্কার করাই তোমাদের উপর হারাম ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আন এবং কিছু অংশে কুফরি (অস্বীকার) কর? তাহলে তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ও অপমান এবং ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে কঠিনতম শাস্তির দিকে। আর তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।” এই সকল ব্যক্তিদের পূর্বসূরি হচ্ছে ইহুদীরা।

ইমাম ক্বুরতুবী رَحِمَهُاللهُ তার তাফসীরে বলেন, “তারা ইসলাম এবং ইহুদী ধর্মের মাঝে সমন্বয় করে একটি ধর্ম সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছিল।” তারা ইসলাম এবং ইহুদী ধর্ম থেকে নতুন একটি দ্বীন তৈরি করেছিল। এটা ইমাম ক্বুরতুবী رَحِمَهُاللهُ -এর বক্তব্য এবং অন্যদের বক্তব্য একই। এমনিভাবে ইমাম ক্বুরতুবী رَحِمَهُاللهُ বলেন, আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ইহুদীদের থেকে চারটি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, প্রথম প্রতিশ্রুতিঃ তারা নিজেদের হত্যা করবে না।

দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতিঃ তাদের কেউ বাড়ি থেকে কোন ইহুদীকে বের করে দিবে না।

তৃতীয় প্রতিশ্রুতিঃ তারা এমন ব্যক্তিকে সাহায্য করবে না যে ইহুদীদেরকে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেয়।

চতুর্থ প্রতিশ্রুতিঃ যখন কোন ইহুদী বন্দি হবে তখন তারা তাকে মুক্ত করবে। অতঃপর তারা ঐ সকল আইন ও বিধান ছেড়ে দিয়েছিল আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যে প্রতিশ্রুতিগুলো তাদের থেকে নিয়েছিলেন। তারা কেবলমাত্র একটি বিধান গ্রহণ করেছিল এবং তারা বাকি বিধিবিধান পরিবর্তন করেছিল।

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এই সকল ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, “তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আন এবং কিছু অংশে কুফরি (অস্বীকার) কর? তাহলে তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ও

অপমান এবং ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে কঠিনতম শাস্তির দিকে। তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।”[69]

ইনশা'আল্লাহ আগামী দারসে আমরা এই বিষয়টি পূর্ণ করব। কারণ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ আপনাদের উত্তম বিনিময় দান করুন এবং আপনাদেরকে বারাকাহ দান করুন!

[69] সুরা বাকারাহঃ ৮৫

আনুগত্যের শিরক সংক্রান্ত উৎকর্ষ বিবরণ

শাইখ আবু আলী আল-আনবারী
আল-কুরাইশী (রহিমাহুল্লাহ)

পঞ্চম দারসঃ

সংবিধানের বাস্তবতা এবং এব্যাপারে শারীয়াহ'র হুকুম [সম্পূরক]

الحَمدُ للّه والصّلاةُ والسّلامُ على رسُولِ اللّه؛

হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে হক্বকে হক্ব হিসেবে দেখান এবং হক্ব অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করুন, বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখান এবং বাতিল বর্জন করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদের এমন বিষয় শিক্ষা দিন যা আমাদের উপকার করবে এবং আপনি আমাদের যা শিক্ষা দেন এর মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে আমাদের ইলম অনুযায়ী আমলকারী বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন আমাদের ইলমকে আমাদের জন্য দলিল বানিয়ে দিন এবং আমাদের বিরুদ্ধে দলিল বানাবেন না - - ইয়া আরহামার-রহিমীন! হে আমার রব! আপনি আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিন, আমার বিষয়াদি সহজ করে দিন এবং আমাদের মুখের জড়তা দূর করে দিন যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে। হে আল্লাহ আপনি আমার কর্মকে সৎ বানিয়ে দিন, আপনার সন্তুষ্টির জন্য খালিছ করে দিন এবং আপনার সৃষ্টির কারো জন্য এতে কোন অংশ রাখবেন না।

অতঃপর,

আমরা গত বৈঠকে সংবিধান সম্পর্কে আলোচনা শেষ করেছি। আমরা বলেছি, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য উচিৎ হল সে এই সকল আইন ও সংবিধানের ব্যাপারে প্রথম বাস্তবতা জানবে যে, এগুলো জাহিলী আইন। আমরা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণী দ্বারা দলিল পেশ করেছিঃ

وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ۝ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

“আর নিশ্চয়ই অধিকাংশ মানুষ ফাসিক্ব। তবে কি তারা জাহিলিয়্যাতের বিধিবিধান কামনা করে? আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে আর

কে শ্রেষ্ঠতর?”[70] অতঃপর আমরা কুরআন, হাদিস এবং সাহাবীগণের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণ করেছি যে, জাহিলিয়্যাতের বিধান দ্বারা উদ্দেশ্য কী। অতঃপর আমরা প্রমাণ করেছি যে, এখানে বিধান দ্বারা উদ্দেশ্য কী। এরপর আমরা স্পষ্ট করেছি যে, জাহিলিয়্যাতের বিধান দ্বারা উদ্দেশ্য কী। অতঃপর আমরা বিষয়টিকে আমাদের বাস্তবতার সাথে সংযুক্ত করেছি এবং আমরা বলেছি, ঐ সময়ের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যে জাহিলিয়্যাতের সিফাত নাম দিয়েছেন সেটা কি ঐ বিধানগুলোর উপর সীমাবদ্ধ নাকি এই সিফাত বর্তমান সময়ে সম্পাদিত আইন ও সংবিধানের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। আমরা তুলনা করেছি এবং বিস্তৃত বিষয়ের এই তুলনার মাধ্যমে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, বর্তমান সময়ে যে সকল বিধান কার্যকর করা হয় সেগুলোও জাহিলী বিধান যেমন ঐ বিধানগুলো ছিল জাহিলী বিধান। অতএব আপনি ভুলে যাবেন না যে, আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর শারীয়াহ ব্যতীত যেকোনো শারীয়াহ, যেকোনো বিধান, যেকোনো সংবিধান, যেকোনো আইন –সেটা যে দিক থেকেই হোক না কেন কোন পার্থক্য করা ছাড়াই এর সবগুলোই জাহিলী বিধান। আমরা সংবিধান সম্পর্কে আলোচনা পূর্ণ করব। আজ আমরা জাহিলী বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য আরেকটি জুঝ তথা পার্ট সম্পর্কে আলোচনা করব। আমি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাহায্যে বলছিঃ আপনি যেমন জানেন, বিধিবিধান হয়তোঃ

নির্ভেজাল জাহিলী বিধিবিধান হবে... আমরা এর আলোচনা শেষ করেছি–“তবে কি তারা জাহিলিয়্যাতের বিধিবিধান কামনা করে?”

অথবা নির্ভেজাল আল্লাহ প্রদত্ত বিধিবিধান হবে... “আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে আর কে শ্রেষ্ঠতর?”

এখানে তৃতীয় আরেকটি প্রকার আছেঃ এই তৃতীয় প্রকার হল তারা কিছু নেয় শারীয়াহ থেকে এবং কিছু নেয় সংবিধান, আইন ও অন্যান্য ধর্ম থেকে। এই সকল লোকদের বিশেষণ বা নাম কী? আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ কি কুরআনে তাদের কথা আলোচনা

---

[70] সুরা মায়িদাহঃ ৪৯-৫০

করেছেন? যদি উল্লেখ করা হয়ে থাকে তাহলে বর্তমান সময়ে দেশগুলোতে যে আইন কার্যকর আছে এবং যা দিয়ে মানুষদের শাসন করা হয়—এর সাথে তাদের সম্পর্ক কী?

আমি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাহায্যে বলছিঃ আমি এই প্রকারের নাম দিয়েছি তৃতীয় পথের লোকদের প্রকার। প্রথম প্রকার হল- যারা জাহিলী বিধিবিধান দ্বারা শাসন করে। দ্বিতীয় প্রকার হল- যারা আল্লাহ প্রদত্ত বিধিবিধান দ্বারা শাসন করত। আর যারা এখান থেকে কিছু নেয় এবং ওখান থেকে কিছু নেয় আমি তাদের নাম দিয়েছি তৃতীয় পথের লোক। এই নামকরণের ব্যাপারে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাব থেকে দলিল কী?

আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

﴿وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا﴾

“তারা বলে, ‘আমরা কিছু অংশের উপর ঈমান আনি এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করি।’ আর তারা এর মাঝামঝি একটা পথ গ্রহণ করতে চায়।”[71] তাহলে তারা ঈমান ও কুফরের মাঝে তৃতীয় আরেকটি পথ চায়। সুতরাং তারা শুধু ঈমান চায় না এবং শুধু কুফরও চায় না। তারা এ দুই বিষয়কে একত্রিত করতে চায়।

তাই আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদের সম্পর্কে বলেন, “আর তারা এর মাঝামঝি একটা পথ গ্রহণ করতে চায়।” অতএব আমরা এই নামটি তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করবঃ তৃতীয় পথের লোক।

প্রথম পথঃ জাহিলী বিধিবিধান।

দ্বিতীয় পথঃ আল্লাহ প্রদত্ত বিধিবিধান।

তৃতীয় পথঃ এরা শারীয়াহ থেকে কিছু এবং শারীয়াহ’র বাহির থেকে কিছু নিয়ে মাঝখানে একত্রিত করে।

[71] সুরা নিসাঃ ১৫০

এই প্রকারের কথা কি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ কুরআনে উল্লেখ করেছেন?

হ্যাঁ। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ কুরআনে ইহুদীদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَ لَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝ ثُمَّ اَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ؗ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ؕ وَ اِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰۤى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؗ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

“তারপর তোমরাই ঐ সকল লোক, যারা নিজদেরকে হত্যা করছ এবং তোমাদের একদলকে তাদের বাড়ি থেকে বহিস্কার করছ। তোমরা নিজেরা তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন করে পরস্পরের সহযোগিতা করছ। আর তারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ আদায় কর; অথচ তাদেরকে বহিষ্কার করাই তোমাদের উপর হারাম ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আন এবং কিছু অংশে কুফরি (অস্বীকার) কর? তাহলে তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ও অপমান এবং ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে কঠিনতম শাস্তির দিকে। আর তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন। তারাই সে লোক, যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন ক্রয় করে; কাজেই তাদের শাস্তি কিছুমাত্র কমানো হবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।”[72] এই আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা কী? ইহুদীদের সাথে কী ঘটেছিল? এ বিষয়টি যাদের থেকে প্রকাশ পায় তাদের ব্যাপারে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর হুকুম কী?

[72] সুরা বাকারাহঃ ৮৪-৮৬

ইমাম কুরতুবী رَحِمَهُ اللهُ বলেন, "আমাদের আলেমগণ বলেছেন, আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ইহুদীদের থেকে চারটি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেনঃ হত্যা করা ছেড়ে দেওয়া, বহিষ্কার করা পরিত্যাগ করা, ইহুদীদের বিরুদ্ধে অন্যদেরকে সাহায্য করা বর্জন করা এবং বন্দি মুক্ত করা।"

এই চারটি প্রতিশ্রুতি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বানী-ইসরাঈলদের থেকে নিয়েছিলেনঃ

প্রথম প্রতিশ্রুতিঃ তোমরা তোমাদের নিজেদের হত্যা করবে না। ইবনে আবী হাতিম رَحِمَهُ اللهُ আবুল আলিয়া رَحِمَهُ اللهُ থেকে নকল করেছেন, তিনি বলেন, "তোমরা তোমাদের নিজেদের হত্যা করবে না–অর্থাৎ তোমাদের একজন যেন অন্যজনকে হত্যা না করে।" তাহলে প্রথম প্রতিশ্রুতি হল তোমরা তোমাদের নিজেদের হত্যা করবে না।

দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতিঃ তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে তোমাদের বাড়ি থেকে বের করে দিবে না। অর্থাৎ ইহুদীদের প্রতি আদেশ ছিল, আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর মাঝে এবং ইহুদীদের মাঝে প্রতিশ্রুতি ছিল যে, কোন ইহুদীর জন্য অন্য ইহুদীকে তার বাড়ি থেকে বের করা জায়েয নয়।

তৃতীয় প্রতিশ্রুতিঃ ইহুদীরা ছাড়া অন্য শ্রেণীর কিছু মানুষ যখন ইহুদীদেরকে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দিতে চাইতো তখন অন্য ইহুদীদের জন্য জায়েয নেই যে, তারা এই ইহুদীদের বিরুদ্ধে ঐ সকল লোকদের সাহায্য করবে; অর্থাৎ ইহুদী ব্যতীত অন্য শ্রেণীর কিছু মানুষ ইহুদীদেরকে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দিতে চায়, কোন ইহুদীর জন্য জায়েয নেই যে, সে এই ইহুদীদেরকে বহিষ্কার করণের ক্ষেত্রে ঐ সকল লোকদের সাহায্য করবে। এই তিনটি প্রতিশ্রুতি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বানী-ইসরাঈলদের থেকে নিয়েছিলেন।

চতুর্থ প্রতিশ্রুতিঃ আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى তাদের প্রতি আদেশ করেছিলেন যে, যখন কোন ইহুদী বন্দি হত তখন তারা এই ইহুদীকে বন্দি থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে কাজ করবে।

যা ঘটেছিল তা হলঃ ইহুদীরা এই অধ্যায়ের তিনটি অমান্য করেছিল এবং তারা কেবলমাত্র একটি প্রতিশ্রুতি পালন করেছিল; আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন, তোমরা তোমাদের নিজেদের হত্যা করবে না; তাদের একজন অন্যজনকে হত্যা করত। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দিবে না; ইহুদীদের একজন অন্যজনকে তার বাড়ি থেকে বের করে দিত। অর্থাৎ যেমন সমাজ থেকে, গোত্র থেকে এবং এছাড়াও অন্যান্য বিষয় থেকে। তোমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবে না; তারা ইহুদীদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করেছিল। যেমন যে চুক্তি আউস ও খাজরাজের মাঝে এবং বনু -কাইনুকা, বনু-নাযীর ও বনু-কুরাইযার মাঝে হয়েছিল। একদল এই সকল লোকদের সাথে চুক্তি করেছিল যে, তারা ইহুদীদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করবে এবং আরেক দল এই ব্যক্তিদের সাথে চুক্তি করেছিল যে, তারা ইহুদীদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করবে; তাহলে এই তিনটি প্রতিশ্রুতি ইহুদীরা পালন করেনি। আর ইহুদীরা যে একটি প্রতিশ্রুতি পালন করেছিল সেটা হচ্ছেঃ কোন ইহুদী যখন বন্দি হত তখন বন্দিত্ব থেকে তাকে মুক্ত করতে এবং তাকে উদ্ধার করতে তারা দ্রুত কাজ করত। তাহলে তারা কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান এনেছিল যেমনটি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন এবং তারা কিছু অংশকে অস্বীকার করেছিল।

ইমাম জাসসাস رَحِمَهُ ٱللَّهُ তার তাফসীরে বলেন, আমি তার বক্তব্যের অর্থ নকল করছিঃ ইহুদীদেরকে তাদের বহিষ্কার করা ছিল কিতাবের কিছু অংশকে অস্বীকার করা। কারণ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদেরকে যা আদেশ করেছেন তারা তা অমান্য করেছে। বন্দিদেরকে তাদের মুক্ত করা ছিল কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনা। কারণ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদেরকে যা আদেশ করেছিলেন তারা তা পালন করেছে; তাহলে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ কিতাব মান্য করাকে ঈমান হিসেবে নাম দিয়েছেন এবং কিতাব অমান্য করাকে কুফর হিসেবে নাম দিয়েছেনঃ “তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আন এবং কিছু অংশে কুফরি (অস্বীকার) কর? তাহলে তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল।” যেহেতু ইহুদীরা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিছু আদেশ পালন করেছিল এবং বাদবাকি অন্য আদেশগুলো অমান্য করেছিল তাই

আল্লাহ তাদের এই কাজকে কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনা এবং কিতাবের কিছু অংশকে অস্বীকার করা হিসেবে অভিহিত করেছেন। অতঃপর আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ইহুদীদের মধ্য থেকে ঐ ব্যক্তির হুকুম উল্লেখ করেছেন যে এই কাজ সম্পাদন করেছেঃ

তিনি تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেছেন, "তাহলে তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল।" প্রথমতঃ "দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা।" দুনিয়ার জীবনে এই ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে তারা অপদস্থ লাঞ্ছিত নীচু অবস্থায় জীবন-যাপন করবে। "কেবল লাঞ্ছনা"–এর অর্থ হল নীচুতা ও অপমান। "তাহলে তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা।" এটা হল দুনিয়ায়। "ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে কঠিনতম শাস্তির দিকে।" আপনি জানেন যে, কঠিন শাস্তির স্থান হচ্ছে জাহান্নাম–ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্। এই দু'টি হুকুম হল একটি দুনিয়াবি এবং আরেকটি পরকালীন। অতঃপর আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন, "তারাই সে লোক, যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন ক্রয় করে।" তাহলে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আদেশকে তাদের অমান্য করার কারণ ছিল দুনিয়ার জন্য। কেমন যেন সে তার দুনিয়ার কারণে তার পরকালকে বিক্রি করে দিয়েছে। রাসুল ﷺ এক হাদিসে বলেছেন, - প্রকৃতপক্ষে আমি এই হাদিসের বিশুদ্ধতার সীমা উল্লেখ করছি না - তিনি বলেন, "লেনদেনের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত যে তার দুনিয়ার কারণে তার আখিরাতকে বিক্রি করে দেয়।" এটা অন্য আরেকটি হুকুম যা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, "কাজেই তাদের শাস্তি কিছুমাত্র কমানো হবে না।" নিশ্চিতভাবেই তারা জাহান্নামে থাকবে।

এই হুকুমের মত অন্য আরেক আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেন,

﴿وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ﴾

"তারা বলে, আমরা কিছু অংশের উপর ঈমান আনি এবং কিছু অংশকে অস্বীকার

করি।”[73] আয়াতের পূর্বে রয়েছেঃ “তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আন এবং কিছু অংশে কুফরি (অস্বীকার) কর?” এখানে “তারা বলে, ‘আমরা কিছু অংশের উপর ঈমান আনি এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করি।’ আর তারা এর মাঝামঝি একটা পথ গ্রহণ করতে চায়।”

এই ধরনের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমঃ

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেন,

﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ﴾

“তারাই প্রকৃত কাফির।”[74]

বস্তুত আমরা এই শ্রেণীর ব্যাপারে আলোচনা করছি। এরপর আমরা আমাদের বর্তমান সময়ে তাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ লোকদের নিয়ে আলোচনা করব। এখন আলোচনা কেবল ইহুদীদের সম্পর্কে। তাহলে যে ব্যক্তি কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনে; অর্থাৎ সে কিতাবের কিছু অংশ আঁকড়ে ধরে এবং কিতাবের বাকি অংশ অমান্য করে। এই ধরনের ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেন, “তারাই প্রকৃত কাফির।” এখানে "حقا" শব্দটি ইমাম কুরতুবী رَحِمَهُ الله তাফসীর করেছেন। তিনি বলেছেন, “এমন দৃঢ়করণ যা তাদের ঈমানের ব্যাপারে ধারণা করাকে দূরীভূত করে দেয় যখন তিনি তাদেরকে এ বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন যে, তারা বলে আমরা কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনি।” এটা ইমাম কুরতুবী رَحِمَهُ الله এর সরাসরি বক্তব্য।

কেন তিন বলেছেন, “তারাই প্রকৃত কাফির।”? এখানে "حقا" এর অর্থ কী?

তিনি বলেছেন, “এমন দৃঢ়করণ যা তাদের ঈমানের ব্যাপারে ধারণাকে দূর করে দেয়।” এর অর্থ হল- একজন মানুষ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর এবাণী পড়ল–

---

[73] সুরা নিসাঃ ১৫০

[74] সুরা নিসাঃ ১৫১

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾

“তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আন এবং কিছু অংশে কুফরি (অস্বীকার) কর?” অতঃপর আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যখন বলেছেন, “তারাই প্রকৃত কাফির।” তখন আমার এমন সব ধারণা যে, এই সকল লোকদের মধ্যে ঈমানের অংশ থাকতে পারে–সেটা দূর হয়ে যাবে। তাদের ঈমানের ব্যাপারে ধারণা করা দূর হওয়ার জন্য একটি তাকীদ। যেন কেউ এই ধারণা না করে যে, এই লোকেরা মু'মিন। কারণ আল্লাহ তাদেরকে বৈশিষ্ট্য দিয়ে বলেছেন, “তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আন এবং কিছু অংশে কুফরি (অস্বীকার) কর?” অতএব কিছু অংশের প্রতি তোমাদের ঈমান আনয়ন করা–এটা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর এবাণীর সামনে কোন কিছুর সমতুল্য নয়ঃ “তারাই প্রকৃত কাফির।”

আবু হাফস আদ-দিমাশ্কী আল-হাম্বালী তার কিতাব ‘আল-লুবাব ফী উলুমিল কিতাব’এ একজন আলেম থেকে উল্লেখ করেছেন - আমার ধারণানুযায়ী তার নাম আবুল বাক্বা। তিনি যখন এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন, “তারাই প্রকৃত কাফির।” তখন তিনি বলেছেন, “তারা কোন সন্দেহ ছাড়াই কাফির।” তাদের কুফরির ব্যাপারে কেউ সন্দেহ করবে না। অতঃপর আবু হাফস আদ-দিমাশ্কী আল-হাম্বালী ওয়াহিদী থেকে একটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন - তারা প্রত্যেকেই মুফাসসির। আপনি যেমন জানেন, ওয়াহিদীর ‘আস বাবুন-নুযুল’ নামে একটি কিতাব রয়েছে। ওয়াহিদী এই তাফসীর করতেন না। অর্থাৎ তারা প্রকৃত কাফির–তিনি মনে করতেন না যে, এর অর্থ তাদেরকে তাকফীর করা। তিনি বলেন, “কারণ কুফরকে "حق" এর সাথে কোনোভাবেই বৈশিষ্ট্য দেওয়া যায় না।” এটা সম্ভব নয় যে, আমরা প্রকৃত কাফির বলে এর মাধ্যমে আমরা কুফর উদ্দেশ্য করব। অতঃপর আবু হাফস আদ-দিমাশ্কী আল-হাম্বালী ওয়াহিদীকে জবাব দিয়েছেন - মূল আলোচনার স্থানে আমরা দ্রুতই আসব ইনশা'আল্লাহ- তিনি বলেছেন, “এখানে "حقا" দ্বারা বাতিলের বিপরীত উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের ব্যাপারে এটা প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের কুফর অকাট্য।” “তারাই প্রকৃত কাফির।” তিনি বলেছেন, “তাদের ব্যাপারে এটা প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের কুফর অকাট্য।” অর্থাৎ তারা কাফির এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

এটা হল ইহুদীদের কাজ, কিতাবের কিছু অংশ গ্রহণ করা এবং কিতাবের কিছু অংশ অমান্য করার সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদেরকে আখ্যায়িত করেছেন- "তারাই প্রকৃত কাফির।"

তাহলে ইহুদীরা দুইটি কাজ করেছেঃ তারা কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান এনেছে এবং কিতাবের কিছু অংশ অমান্য করেছে। এখানে ইহুদীদের তৃতীয় আরেকটি কাজ রয়েছেঃ তারা কিতাবের কিছু বিধিবিধান পরিবর্তন করেছিল। এর দলিলঃ

আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর যামানায় বনু-নাযীর গোত্র, বনু-কুরাইযা গোত্র এবং বনু-ক্বাইনুকা গোত্র বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বনু-নাযীর এবং বনু-কুরাইযার মাঝে যে আইন চলমান ছিল তা হলঃ বনু-নাযীর গোত্রের কেউ যখন বনু-কুরাইযার কোন লোককে হত্যা করবে তখন সে একশ ওয়াসাক্ব খেজুর দিয়ত পরিশোধ করবে। আর বনু-কুরাইযার কেউ যখন বনু-নাযীর গোত্রের কোন লোককে হত্যা করবে তখন তাকে হত্যা করা হবে। তাহলে ইহুদীদের মাঝে আইন ছিল ভিন্নরূপ। একজন ইহুদী যখন কোন ইহুদীকে হত্যা করবে তখন তাকে হত্যা করা হবে। অন্য আরেকজন ইহুদী যখন এক ইহুদীকে হত্যা করবে তখন তাকে হত্যা করা হবে না–সে দিয়ত পরিশোধ করবে। বস্তুত এখানে পরিবর্তন কোথায়? আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইহুদীরা পরিবর্তন করেছে। পরিবর্তন কোথায়?

ইহুদীদের তাওরাতে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণী প্রমাণিত যে,

وَ كَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيۡهَاۤ اَنَّ النَّفۡسَ بِالنَّفۡسِ ۙ وَ الۡعَيۡنَ بِالۡعَيۡنِ وَ الۡاَنۡفَ بِالۡاَنۡفِ وَ الۡاُذُنَ بِالۡاُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَ الۡجُرُوۡحَ قِصَاصٌ ؕ

"আর আমরা তাদের উপর তাতে অত্যাবশ্যক করে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম।"[75] তাহলে তাওরাতে প্রমাণিত যে, জানের

[75] সুরা মায়িদাহঃ ৪৫

বদলে জান, কিন্তু ইহুদীরা এই বিধান পরিবর্তন করেছিল; আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর যামানায় এই বিষয়টি ঘটেছিল। এই হাদিস ইবনে আব্বাস رَضِيَاللّٰهُعَنْهُمَا থেকে ইবনে আবী শায়বা رَحِمَهُاللّٰهُ 'মুসান্নাফ'এ বর্ণনা করেছেন, ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন, আবু দাউদ رَحِمَهُاللّٰهُ বর্ণনা করেছেন এবং হাকিম 'মুস্তাদরিক'এ বর্ণনা করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেছেন, এই হাদিস সহীহ। কেননা হাকিম যখন এই রিওয়াত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন তখন তিনি বলেছেন, শাইখাইনের শর্তে এই হাদিস সহীহ। ইমাম যাহাবী সংযুক্ত করে তালখীসে বলেছেন, সহীহ।

ইবনে আব্বাস رَضِيَاللّٰهُعَنْهُمَا বলেন, একটি হত্যা সংঘটিত হল। বনু-কুরাইযার এক লোক বনু-নাযীর গোত্রের এক লোককে হত্যা করল। অতঃপর বনু-নাযীর গোত্র বনু-কুরাইযাকে বলল, তোমরা কুরাইযার ব্যক্তিকে আমাদের নিকট সমর্পণ কর যেন আমরা তাকে হত্যা করতে পারি। তারা বলল, আমাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে আল্লাহর নাবী আছে। ফলে তারা আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর নিকট বিচার চাইতে আসল। অতঃপর আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى নাযিল করলেন,

﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾

"আর যদি আপনি বিচার-ফায়সালা করেন তবে তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করবেন।"[76] ইবনে আব্বাস বলেন, "অর্থাৎ জানের বদলে জান।" অতঃপর নাযিল হলঃ "তবে কি তারা জাহিলিয়্যাতের বিধিবিধান কামনা করে?" তাহলে এই পরিবর্তন ও বিকৃতসাধনকেও জাহিলিয়্যাতের বিধানের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হত– হোক সেটা ইহুদীদের নিকট অথবা মুশরিকদের নিকট তা সমান। অতএব এখানে আমি আমার কথা দৃঢ় করছিঃ আমাদের দ্বীনে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আইন ব্যতীত আইন প্রণয়ন করা সেটা যেকোনো দিক থেকেই হোক না কেন–এর সবগুলোই জাহিলী বিধান।

অতএব এই আয়াত পড়ে যে ফলাফল বের হয় তা হলঃ ইহুদীরা কিতাবের

[76] সুরা মায়িদাহঃ ৪২

কিছু অংশের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং কিতাবের কিছু অংশকে অস্বীকার করেছিল। তারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিছু বিধান অমান্য করেছিল। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى তাদের ব্যাপারে কুফরের হুকুম দিয়েছেন। আর তাদের কুফরির ব্যাপারে কেউ সন্দেহ করবে না; কারণ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন, "তারাই প্রকৃত কাফির।"

আমাদের বাস্তবতার সাথে এই আয়াতের সম্পর্ক কী?

ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত কিছু ব্যক্তি রয়েছে তাদের থেকে সর্বদাই একটি বাক্য শুনবেন- **"ইসলামী শারীয়াহ আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি উৎস।"** এই বিষয়ে প্রবেশ করার পূর্বে কিছু কথাঃ

যে আয়াতগুলো ইহুদীদের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে কি আমরা ইসলাম ধর্মের লোকদের উপর প্রয়োগ করতে পারব? অর্থাৎ কিছু আয়াত আছে যেগুলো ইহুদীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, কিছু আয়াত খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে এবং কিছু আয়াত আছে যেগুলো মুশরিকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে–এই সকল আয়াতকে কি আমরা ইসলাম ধর্মের কিছু ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করতে পারব?

এই সকল আয়াতকে সাধারণভাবে প্রয়োগ করা–এটা খারিজিদের আক্বীদাহ'র অন্তর্ভুক্ত। কাফিরদের ব্যাপারে নাযিলকৃত প্রতিটি আয়াত আমরা ঈমানদারদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করব, মুনাফিক্বদের ব্যাপারে নাযিলকৃত প্রতিটি আয়াত আমরা মু'মিনদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করব–এগুলো খারিজিদের আক্বীদাহ।

কিন্তু এব্যাপারে সঠিক মত হচ্ছেঃ এই হুকুম দেওয়ার ক্ষেত্রে কারণ কী–তা আমরা লক্ষ্য করব; কেননা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ হুকুম দেওয়ার ক্ষেত্রে কারণের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি হুকুম দেন। তাই আমরা এই কারণের প্রতি লক্ষ্য করব। অতঃপর হুকুমের প্রতি লক্ষ্য করব। এই কারণ যখন ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে তখন তারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর নিকট ইহুদীদের চেয়ে বেশি উত্তম হবে না, আর না আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর নিকট খ্রিষ্টানদের চেয়ে বেশি উত্তম হবে। ইহুদী আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আদেশ অমান্য করেছিল এবং কিছু অংশের প্রতি ঈমান এনেছিল ও কিছু অংশ অস্বীকার করেছিল। এই কারণ যখন ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত

কিছু মানুষের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে তখন তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর এবাণী বলা হবেঃ “তারাই প্রকৃত কাফির।” কেন? এর কারণ হল, এখানে হুকুম দেওয়ার ক্ষেত্রে যে কারণ রয়েছে এবং সেখানে হুকুম দেওয়ার ক্ষেত্রে সেই কারণই আছে।

আমি এব্যাপারে কিছু দলিল আপনার নিকট উল্লেখ করছিঃ মক্কার মুশরিকরা যখন মূর্তির ইবাদাত করত তখন তারা কী বলত? তারা বলতঃ

﴿مَا نَعۡبُدُهُمۡ اِلَّا لِيُقَرِّبُوۡنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلۡفٰىؕ﴾

“আমরা কেবল এজন্যই তাদের ইবাদাত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।”[77] তাহলে এটা সরাসরি ইবাদাত নয়। আমরা কেবল এই সকল লোকদের মাধ্যমে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর নৈকট্য অর্জন করি।

অতএব তাদের শিরকের কারণ ছিল তারা তাদের নিজেদের মাঝে এবং আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর মাঝে মাধ্যম নির্ধারণ করেছিল। এই মাধ্যম দিয়ে তারা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর নৈকট্য চাইতো। এই কারণটি যখন উম্মাহ’র কারো মধ্যে পাওয়া যাবে তখন এটা ইসলাম ভঙ্গের কারণসমূহের মধ্য থেকে একটি কারণ হবে– যেমনটি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব رَحِمَهُ اللهُ নাওয়াক্বীদুল ইসলামে উল্লেখ করেছেন। ইসলাম ভঙ্গের কারণসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ যে ব্যক্তি তার নিজের মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে মাধ্যম নির্ধারণ করে সে মুশরিক হয়ে যাবে।

সে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু সে এমন কাজ করে যা মুশরিকরা করত। ঐ কাজের হুকুম হল শিরক; তাই যে ব্যক্তি তাদের ন্যায় কাজ করবে নিশ্চিতভাবেই তার উপর তাদের হুকুম কার্যকর হবে... সে মুশরিক হবে। তাহলে আপনিও যখন এই একই কাজ করবেন তখন আপনিও আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাথে শিরককারী মুশরিক হয়ে যাবেন। এটা ইসলাম ভঙ্গের দশ কারণের মধ্য থেকে একটি কারণ যেগুলো মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব رَحِمَهُ اللهُ উল্লেখ করেছেন।

---

[77] সুরা যুমারঃ ০৩

আমি আপনার নিকট আরেকটি দলিল উল্লেখ করছি যার আলোচনা আমরা পূর্বে করেছিঃ আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণীঃ

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾

“তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও পাদ্রীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।”[78] আয়াতটি ইহুদীদের এবং খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। কিন্তু আপনার স্মরণে আছে যে, আমরা বলেছিলাম যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর শারীয়াহ নিয়ে ছলনা করবে সে এই আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আমরা যেমন ধর্মযাজক ও পাদ্রীদের ব্যাপারে বলেছিলাম যে, তারা হচ্ছে রব। তাহলে যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর দ্বীনের সাথে তা করবে যা ঐ সকল ব্যক্তিরা আল্লাহর নাবী মুসার শারীয়াহ অথবা আল্লাহর নাবী ঈসার শারীয়াহ’র সাথে করেছিল তখন এই ব্যক্তিদেরকেও রব হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে—যদিও এটা জানা বিষয় যে, আয়াতে তাদের কথা উল্লেখ নেই। ঐ সকল ব্যক্তিরা হচ্ছে ইহুদী এবং খ্রিষ্টান। এই ব্যক্তি হচ্ছে মুসলিম কাফির; কিন্তু হুকুম তার উপর কার্যকর হবে। কেননা যে কারণ ঐ ব্যক্তিদের মাঝে ছিল তা এই ব্যক্তিদের মাঝেও বাস্তবায়িত হয়েছে।

অতএব কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক্বদের ব্যাপারে প্রতিটি আয়াতকে আমরা মুসলিমদের উপর প্রয়োগ করব না। না... আমরা লক্ষ্য করব—যার মধ্যে হুকুম দেওয়ার কারণ বাস্তবায়িত হবে তার উপর হুকুমও প্রয়োগ করা হবে।

আমরা এই আয়াতের নিকট আসলাম—ইহুদীরা কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং কিছু অংশ অস্বীকার করেছিলঃ

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদেরকে এই বিশেষণ দিয়েছেন। তারা কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান এনেছিল—কিভাবে আমরা বুঝব তারা কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান এনেছিল? তারা বন্দি মুক্ত করত। তারা কিতাবের কিছু অংশ অস্বীকার করেছিলঃ

[78] সুরা তাওবাঃ ৩১

তারা হত্যার বিষয় অমান্য করেছিল, তারা বহিষ্কারের বিষয় অমান্য করেছিল, তারা সাহায্য-সহযোগিতার বিষয় অমান্য করেছিল। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এটাকে কুফর নাম দিয়েছেন।

তাহলে যার মধ্যে কারণ বাস্তবায়িত হবে তার উপর হুকুম কার্যকর হবে- "তারাই প্রকৃত কাফির।"

এখন আমরা আসি, সংবিধান প্রণয়নকারীরা কি আল্লাহর বিধিবিধান থেকে কিছু গ্রহণ করে ও অন্য বিধিবিধান থেকে কিছু গ্রহণ করে এবং তারা কি শারীয়াহ বিরোধী আইন নিয়ে এসেছে নাকি আনেনি? আপনি বিষয়টি লক্ষ্য করুন, কিভাবে হয়েছে। ইহুদীরা তিনটি প্রতিশ্রুতি অমান্য করেছিল যেগুলো আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদের থেকে নিয়েছিলেন। তারা সংবিধান ও আইনের ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে ইহুদীদের অনুরূপ করেছে। তারা অনেক বিষয়ে ইহুদীদের থেকে বেশি করেছে।

ইহুদীদের সাথে সংবিধানের ও আইনের সাদৃশ্য কোথায়?

আমি যেমনটি উল্লেখ করেছিলাম যে, ইহুদীরা তিনটি বিধান অমান্য করেছিল। তাহলে বিষয় হচ্ছে অমান্য করা। এই অমান্য করা কি সংবিধান ও আইনে বাস্তবায়ন হয় নাকি হয় না? আমরা অনুসন্ধান করব...

প্রথম অমান্যঃ আমরা শুধু বিস্তৃত বিষয়গুলো উল্লেখ করব– আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى তার প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার ইবাদাত করতে আদেশ করেছেনঃ

﴿وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ اِلا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

"আর আমি জ্বীন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য।"[79] আর আপনি জানেন যে, সকল ইবাদাত প্রমাণিত বিষয়। আমি ইজতিহাদ করে কোন ইবাদাত নিয়ে আসতে পারব না। ঠিক আছে... যেহেতু আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ আমাদেরকে ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাই আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর

[79] সুরা যারিয়াতঃ ৫৬

আগমনের পর মানুষের থেকে কাঙ্ক্ষিত বিষয় কী—যার মাধ্যমে তারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর ইবাদাত করবে? নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর শারীয়াহ। কারণ এই শারীয়াহ'র মাধ্যমেই আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া যায়।

এই সংবিধান এবং এই আইন একটি বক্তব্য ও একটি ধারা অন্তর্ভুক্ত করে – যেমন পূর্বে আপনাদের সামনে আমি পড়েছিলাম। তা হল বিশ্বাসের স্বাধীনতা। "যেমনিভাবে এই সংবিধান খ্রিষ্টান, ইয়াযিদী ও মান্দাইন সাবেঈদের জন্য বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং ধর্ম চর্চার নিশ্চয়তা দেয়।" তাহলে এরা ঐ বিষয়ের বিপরীত করেছে যা রাসুল ﷺ নিয়ে এসেছিলেন। যেমন ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক সাব্যস্ত করা। কিন্তু তারা ইবাদাতকে আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সাব্যস্ত করেছে। ইয়াযিদীর এ অধিকার রয়েছে যে, সে শয়তানের ইবাদাত করবে। অতএব এটা হল অমান্য করা।

আরেকটি বিষয়ঃ আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى আমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেছেন।

সংবিধান ও আইনে রয়েছেঃ মানুষের জন্য এ অধিকার রয়েছে যে, তাদের ইচ্ছানুযায়ী তারা ধর্ম অনুসরণ করতে পারবে। তাই ইয়াযিদী ধর্ম অনুমোদিত, খ্রিষ্ট ধর্ম অনুমোদিত, ক্যালডিয়া ও অ্যাসিরীয়া ধর্ম অনুমোদিত। সম্ভাব্য যে ধর্মই পাওয়া যাবে সংবিধান ও আইন এই সকল ধর্মকে স্বীকৃতি দেয়। তাহলে যেমন ইহুদীরা কিছু অংশ অস্বীকার করেছিল এরাও কিছু অংশ অস্বীকার করেছে; এই অর্থে যে, তারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর বিধিবিধানের বিপরীত করেছে।

তৃতীয় উদাহরণঃ চুরি, যিনা, মদ পান, ক্বিসাস, হত্যা এবং এছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বিধান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে বিধিবিধান এবং হদ।

সংবিধান ও আইনে রয়েছেঃ এই প্রতিটি বিধান যেগুলো উল্লেখ করা হল—এর সবগুলোই সংবিধান ও আইনে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আইনের বিপরীত রয়েছে। তাহলে ইহুদীরা যেমন তাওরাতে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর প্রতিশ্রুতির বিপরীত করেছে তেমনিভাবে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি যখন সংবিধান প্রণয়ন করেছে তখন এই

সংবিধানের মধ্যেও - আমার উল্লেখিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে - আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আইনের বিপরীত আইন ছিল।

এই সংবিধানের মাঝে এবং ইহুদীদের মাঝে সাদৃশ্যের দিকটি কোথায়?

ইহুদীরা তাওরাত থেকে বন্দি মুক্তির বিধানটি গ্রহণ করেছে। আর এই ব্যক্তিরা ইসলাম থেকে ব্যক্তিগত আইন গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ বিবাহ, তালাক্ব ও মিরাছ বা সম্পত্তি বণ্টনের সাথে সংশ্লিষ্ট মাস'আলাসমূহ। এখানে কিছু ফিক্বহী মাস'আলা রয়েছে তারা সেগুলোও গ্রহণ করেছে। তাহলে ইহুদীরা একটি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে এবং এই ব্যক্তিরাও ইসলামী শারীয়াহ থেকে কিছু বিষয় নিয়েছে। অতএব এটা হল তাওরাতের ক্ষেত্রে ইহুদীদের আমলের মাঝে এবং সংবিধানের ক্ষেত্রে সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কাজের মাঝে সাদৃশ্যের দিক। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই এই ব্যক্তিদের পূর্বসূরি হচ্ছে ইহুদীরা। যে ব্যক্তি বলে, "ইসলামী শারীয়াহ আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি উৎস"—আমাদের রবের কিতাবে এই ব্যক্তির পূর্বসূরি হচ্ছে ইহুদীরা। ইহুদীরা যেমন করেছিল সেও ইসলামী শারীয়াহ'র সাথে তেমনই করতে চায়।

আমি একটু বৃদ্ধি করে বলছিঃ এই উক্তির প্রবক্তারা "ইসলামী শারীয়াহ আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি উৎস"—এই ব্যক্তিরা ইহুদীদের চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট যাদের কথা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ কুরআনে উল্লেখ করেছেন। বরং ইহুদীরা এই ব্যক্তিদের থেকে বেশি ভালো। এই কথার ব্যাপারে দলিল কী?

প্রথমতঃ ইহুদীরা যখন কিতাবের কিছু অংশ 'বন্দি মুক্ত করা'র প্রতি ঈমান এনেছিল তখন তারা এই আইন পরিবর্তন করেনি, বিকৃত করেনি, বৃদ্ধি করেনি এবং হ্রাস করেনি। আল্লাহর কিতাবে যেমন বিধান ছিল তেমনই তারা গ্রহণ করেছে।

আর এই সকল ব্যক্তিরা যারা বলে, "ইসলামী শারীয়াহ আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি উৎস" তারা আমাদের দ্বীনে হানীফ থেকে কিছু আইন নিয়েছে। কিন্তু তারা যা নিয়েছে এর সাথে তা করেনি যা ইহুদীরা করেছে। ইহুদীরা বন্দি মুক্তির বিধানের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ছিল যেমনটি তাওরাতে রয়েছে। আর

এই সকল ব্যক্তিরা যা গ্রহণ করেছে তা পরিবর্তন করেছে, তাতে বিকৃতি সাধন করেছে, তাতে যুক্ত করেছে, এর থেকে হ্রাস করেছে এবং এতে বৃদ্ধি করেছে। যেমন মিরাছ বা উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টনের মাস'আলায়। আপনি জানেন যে, আমাদের রবের বিধানে রয়েছেঃ দুই নারীর অংশের অনুরূপ পুরুষের জন্য। যেহেতু তুমি সম্পদ বণ্টনের মাস'আলা নিয়েছো যদিও তুমি ইহুদীদের অনুসরণকারী তাই মাস'আলার ক্ষেত্রে তোমার উপর আবশ্যক ছিল এই বিধিবিধানগুলোকে ঐভাবে প্রয়োগ করা যেমন আমাদের রবের শারীয়াহ'তে রয়েছে। কিন্তু তারা যা নিয়েছে সেটাকে বিকৃত করেছে, পরিবর্তন করেছে। ফলে তারা বলেছে, "পুরুষ নারীর সমান হবে এবং নারী পুরুষের সমান হবে।"

যারা তা গ্রহণ করেছে ইহুদীরা তাদের থেকে ভালো ছিল। কারণ ইহুদীরা যখন তাদের কিতাব থেকে গ্রহণ করেছিল তখন তারা তা বিকৃত করেনি, পরিবর্তন করেনি এবং সরিয়ে আনেনি। এটাই একটি দলিল যে, এই ব্যক্তিরা আমাদের রবের কিতাবের সাথে আচরণ করার ক্ষেত্রে বেশি নিকৃষ্ট।

আরেকটি বিষয়ঃ ইহুদীরা যখন বন্দি মুক্তির বিধান গ্রহণ করেছে তখন তারা ঐ বিধানকে সরাসরি তাওরাতের দিকে নিসবত করেছে যে, এই বিধান ঐ সময়ের আল্লাহর কিতাব তাওরাত থেকে গৃহীত।

আর যে বলে, 'ইসলামী শারীয়াহ আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি উৎস' সে বিবাহ, তালাক্ব ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিষয়গুলো না কুরআনের প্রতি না সুন্নাহ'র প্রতি নিসবত করতে পারে। সে ঐ বিধানগুলোকে আইনের অমুক ধারার প্রতি এবং সংবিধানের অমুক ধারার প্রতি নিসবত করে; তাহলে ইহুদীরা তার থেকে ভালো ছিল। কারণ ইহুদীরা বন্দি মুক্তির বিষয়টি গ্রহণ করেছে আর তারা জানত এটা সরাসরি তাওরাত থেকে গ্রহণ করেছে। আর তারা যখন কিছু গ্রহণ করে তখন তারা সেটাকে কুরআনের প্রতি এবং সুন্নাহ'র প্রতি নিসবত করতে সক্ষম হয় না। তারা সেটাকে সংবিধানের অমুক ধারা এবং আইনের অমুক ধারার প্রতি নিসবত করে।

আরো একটি বিষয় যা প্রমাণ করে যে, এই ব্যক্তিরা ইহুদীদের থেকে নিকৃষ্ট যারা পরিবর্তন করেছে এবং বিকৃতিসাধন করেছেঃ

ইহুদীরা এই অংশের ক্ষেত্রে তাওরাতের প্রতি ঈমান এনেছিল। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেন, "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আন।" আর যে বলে, 'ইসলামী শারীয়াহ আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি উৎস' তার জন্য গর্বভরে এটা বলা সম্ভব নয় যে, আমি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর বিধিবিধানের প্রতি ঈমান আনি। এ কথা বলা তার জন্য সম্ভব হবে না। যদি সে এ কথা বলে তাহলে সে সত্যবাদী নয়। কেন?; কারণ তারা ইসলাম থেকে যে বিধিবিধান নিয়ে আইন ও সংবিধানে স্থাপন করেছে আইন প্রণয়নকারী এবং সংবিধান প্রণয়নকারীদের জন্য কি শারীয়াহ থেকে গৃহীত ঐ আইন পরিবর্তন করা জায়েয হবে নাকি হবে না? অর্থাৎ তারা শারীয়াহ থেকে সম্পদ বণ্টনের বিধান নিয়েছে। এখন সম্পদ বণ্টনের বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই ব্যক্তিরা যখন বলবে আমরা কিতাব তথা কুরআনের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনি তখন আমরা বলব, না তোমরা মিথ্যা বলেছো, তোমরা কুরআনের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনোনি। কেন?; কারণ তোমরা যে অংশ গ্রহণ করেছ এই সরকারের নেতৃত্ব পর্যায়ের ব্যক্তিরা যদি ভোটের মাধ্যমে এই আইন পরিবর্তন করতে চায় তাহলে এই আইন পরিবর্তন করার অধিকার তাদের রয়েছে।

অর্থাৎ যেমন ধরুন তারা বলে, পুরুষের জন্য চারজন নারীকে বিবাহ করা জায়েয। আর সে গর্বভরে বলে, 'ইসলামী শারীয়াহ আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি উৎস'। কিভাবে? সে বলে, এটা আমাদের আইনে আছে আমরা নির্ধারণ করেছি যে, একজন পুরুষ চারজন নারীকে বিবাহ করতে পারবে।

আমরা বলি, তুমি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাবের প্রতি ঈমান আনোনি। কারণ তুমি যখন বৈধ করেছো তখন বলোনি, আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ বলেছেন,

﴿مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ﴾

“দু’টি, তিনটি অথবা চারটি।”[80] তুমি এটা বলে সংবিধানের অমুক ধারা উল্লেখ করেছো। এটা হল প্রথম বিষয়।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ তোমরা যদি এই বিধান পরিবর্তন করার ব্যাপারে একত্রিত হয়ে বল, আমরা পূর্বে বলেছিলাম একজন পুরুষ চারজন নারীকে বিবাহ করতে পারবে এখন আমরা বিবাহকে একজন নারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চাচ্ছি তখন তোমরা ভোটাভোটি করবে। যদি ৫১ জন বলে বৈধ নয় আর ৪৯ জন বলে বৈধ তখন কি এই বিধান পরিবর্তন হবে নাকি হবে না? নিশ্চিতভাবেই পরিবর্তন হবে। তাহলে এটা আল্লাহর বিধান নয়। কারণ আল্লাহর বিধান পরিবর্তন হয় না। এটা কেবলমাত্র আইন ও সংবিধানের বিধান। এই দলিলের ভিত্তিতে যে, তুমি এব্যাপারে ভোট দিয়ে চারটি করেছিলে। আবার তুমি ভোট দিয়ে একটি করেছো। অতএব তুমি কুরআন ও সুন্নাহ’র উপর নির্ভর করতে পারো না; কারণ যদি তুমি কুরআন ও সুন্নাহ’র উপর নির্ভর করতে তাহলে ভোট অথবা নির্বাচন বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর বিধান পরিবর্তন করা সম্ভব হত না। তাহলে যেটাকে তুমি আইনে অন্তর্ভুক্ত করেছো সেটার ব্যাপারে তোমাকে বলা হবে না তুমি কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান এনেছো যেমনটি আল্লাহ ইহুদীদের ব্যাপারে বলেছিলেন। না, তুমি ঈমান এনেছো সংবিধানের প্রতি এবং তুমি ঈমান এনেছো আইনের প্রতি। এই দলিলের ভিত্তিতে যে, সংবিধান ও আইনে উল্লেখিত শারয়ী বিধানের ব্যাপারে তুমি ভোট দিয়ে পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করার ক্ষেত্রে তোমার ক্ষমতা রয়েছে।

১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে হেগে সম্মেলন হয়েছিল। হেগের সম্মেলনটি ছিল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করার জন্য। যারা এই আইন প্রণয়ন করার জন্য একত্রিত হয়েছিল তারা হল বিভিন্ন ধর্মের বিশেষ কিছু ব্যক্তি। অনেক বিষয়ের উপর খ্রিষ্ট ধর্ম একমত তাদের মাঝে ইহুদীরা রয়েছে। তারা যখন এই সমস্ত আইন প্রণয়ন শেষ করে তাদের নিকট আইন প্রণয়নের উৎস স্থির করতে চাইল তখন সকলেই একমত হল যে, ইসলামী শারীয়াহ হবে আন্তর্জাতিক আইনের

[80] সুরা নিসাঃ ০৩

জন্য প্রধান ও প্রথম উৎস। সকলে এই বিষয়ের উপর একমত হল কিন্তু একজন ইহুদী ব্যতীত। সে বলল, না, তোমরা এটাকে নির্দিষ্ট কর না। তোমরা বল না– আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের জন্য ইসলামী শারীয়াহ হচ্ছে আইন প্রণয়নের প্রথম ও প্রধান উৎস। তোমরা বল–ইসলামী শারীয়াহ হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি উৎস। - এটাই এখন স্বীকৃত - তাই কেউ যখন বলবে, ইসলামী শারীয়াহ হচ্ছে প্রধান উৎস তখন তার উদ্দেশ্যে প্রধান উৎসের অধীনে অন্য আরো বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু যখন সে বলবে, ইসলামী শারীয়াহ হচ্ছে আইন প্রণয়নের একমাত্র উৎস তখন আমরা বলব, এটা হচ্ছে ঈমান আনা।

যখন সে বলবে, ইসলামী শারীয়াহ হচ্ছে আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি উৎস - প্রকৃতপক্ষে তোমাদের প্রণয়নকৃত আইনে শারীয়াহ'র কোন বিষয় পাওয়া যায় না। তোমরা তোমাদের প্রবৃত্তির উপর ভিত্তিকরে কিছু বিষয় গ্রহণ করেছো। আর তোমরা যে বিষয় গ্রহণ করেছো সেটার প্রতি তোমরা ঈমান আনোনি যেমন ঈমান এনেছিল ইহুদীরা। ইহুদীরা যখন বন্দি মুক্তির বিষয়টি গ্রহণ করেছিল তখন তারা বন্দি মুক্তির বিষয়টিই গ্রহণ করেছিল, তারা সম্পদ দান করত যেন তারা ইহুদীদের বের করে নিয়ে আসতে পারে। তারা বিকৃতি সাধন করেনি, বৃদ্ধি করেনি এবং পরিবর্তন করেনি। আর তোমরা যা গ্রহণ করার দাবি কর তোমরা তাতে যুক্ত করেছো, তাতে বৃদ্ধি করেছো, হ্রাস করেছো, বিকৃতি করেছো এবং পরিবর্তন করেছো।

বর্তমানে ইরাকী আইনে রয়েছেঃ সন্তানকে মায়ের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় পিতার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় না। কেন? কারণ এ আইন রাফিদীরা প্রণয়ন করেছে। আর এদের নিকট একটি বিদআত রয়েছে যে, কোন নারী যখন পিতার পরিচয় নেই এমন কোন সন্তান জন্ম দিবে তখন এই শিশুকে ইরাকী জাতীয়তা হিসেবে ধরা হবে; তোমরা এটা শারীয়াহ'র কোথা থেকে গ্রহণ করেছো?! এটা কেবলই চোখে ধূলো ছিটানোর জন্য। ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত এই ব্যক্তিরা এবং ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত এই দলগুলো–তারা কিভাবে নিজেদেরকে এই তিরস্কার থেকে উদ্ধার করবে? তোমার এ কথা বলা যে, হে লোক সকল! তোমরা দেখ ইসলামী শারীয়াহ হচ্ছে আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি উৎস–এটা

শুধুই ধোঁকা। আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের মধ্য থেকে এটা কোন উৎস?

মুরসীকে নির্বাচনের পূর্বে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলঃ এটা কি সঠিক যে, আপনি যখন প্রেসিডেন্ট হবেন তখন আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন করবেন? সে বলেছিলঃ যে মিসরী আইন দ্বারা শাসন করে সে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন করে। কিভাবে? সে বলেছেঃ মিসরী আইনের দ্বিতীয় ধারার ভাষ্য হচ্ছেঃ "ইসলামী শারীয়াহ হচ্ছে আইন প্রণয়নের প্রধান উৎস।" সে বলেছেঃ তাই যে ব্যক্তি এই আইনের মাধ্যমে শাসন করবে সে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন করবে।

এই লোকটির লজ্জাও করেনি!! নির্বাচনের মাধ্যমে একজন কিবত্বী ক্ষমতায় পৌঁছে এই সমস্ত আইন দ্বারা শাসন করা শুরু করবে। আমরা বলি, হে কিবত্বী তুমি কি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন করবে? এটা কি সম্ভব নয় যে, কিবত্বী ক্ষমতায় পৌঁছবে? সেই নির্বাচনের মাধ্যমে একজন কিবত্বী ক্ষমতায় গিয়ে প্রেসিডেন্ট হয়ে এই সমস্ত আইন দ্বারা শাসন করল। হে মুরসী! যে কিবত্বী এই আইন দ্বারা শাসন করবে তুমি যেমনটি রায় দিয়েছো–তার ক্ষেত্রে কি এটা বলা হবে এই কিবত্বী আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন করে?! আর এই কিবতী কি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন করতে সম্মত হবে এমনকি তোমাদের ব্যাপারে সম্মত হবে? এটা একটি হাস্যকর বিষয়। এটা একটি ধোঁকা। এটা শুধুমাত্র সংবিধানের প্রতি সম্মতির ব্যাপারে একটি সমর্থন। তারা যা বলে সেব্যাপারে যেন তাদেরকে গ্রহণ করা হয়। অন্যথায় আল্লাহর শারীয়াহ কোথায়? কিভাবে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শারীয়াহ অন্যান্য আইনের একটি অংশ হয়? কিভাবে?!

আমরা এখন এই মাস'আলার ব্যাপারে আলোচনায় আসছিঃ

তাহলে আমাদের নিকট প্রমাণিত হল যে, কিছু মানুষ রয়েছে যারা বলে, 'ইসলামী শারীয়াহ আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি উৎস' এবং তারা এই আইন ও এই সংবিধান দ্বারা শাসন করে।

সম্মানিত ভাই আপনি জেনে রাখুন! আমরা এই সকল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করার ব্যাপারে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আদেশের মাধ্যমে নির্দেশিত। এরা হল এমন ব্যক্তি যারা বলে, ‘ইসলামী শারীয়াহ আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি উৎস’। আমাদের বাড়িতে যে কুরআন রয়েছে তাতে একটি আয়াত আছে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যার মাধ্যমে আমাদেরকে আদেশ করেছেন আমরা যেন এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। এই আয়াতটি আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণী। এ আয়াতটি দুই স্থানে রয়েছে। সুরা বাকারায় এবং সুরা আনফালে। আমি আয়াতটি পাঠ করছি যা সুরা আনফালে রয়েছে ৩৯ নং আয়াতঃ

﴿وَ قَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ﴾

“আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়।” যে বলে, ‘ইসলামী শারীয়াহ আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি উৎস’ সে কি শাসন বা আইন আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছে? নিশ্চিতভাবেই না। যেহেতু আইন পুরোটা আল্লাহর জন্য নয় তাই আমি আপনি এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট। আর এখান থেকেই পার্লামেন্ট শাসনের কারণে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। কেননা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ আদেশ করেছেনঃ “আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়।” তুমি ইসলামী শারীয়াহ’কে আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি উৎস বানিয়েছো। তাই দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নয়–এভাবে যে, যখন প্রমাণিত হয় তুমি আল্লাহর আইনের কিছু বিষয় তোমার আইনে অন্তর্ভুক্ত করেছো; তখন আমরা এই লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত বিচার-ফায়সালা বা শাসন করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট। সাথে সাথে তাদের বিরুদ্ধেও যারা বলে, “ইসলামী শারীয়াহ আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি উৎস।”

একজন প্রশ্ন করে বলল, হে শাইখ, “প্রধান উৎস হলে।”

শাইখঃ যে অবস্থাতেই হোক। যদি সে একমাত্র উৎস না বলে তখন এই ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করা হবে; কারণ সে আল্লাহ প্রদত্ত আইনের পাশে অন্যান্য

আইনকে স্থাপন করল। তাই আমরা যখন আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর এবাণীর তাফসীরে আসবঃ

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۱۲۰﴾

“আর ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন। বলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহর হিদায়াতই প্রকৃত হিদায়াত। আর যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির (খেয়াল-খুশীর) অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান আসার পরও, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার কোন অভিভাবক থাকবে না এবং থাকবে না কোন সাহায্যকারীও।”[81] আগামীকাল ইনশা’আল্লাহ আমরা এই আয়াত নিয়ে আলোচনা করব যেন আপনি জানতে পারেন যে, এই সমস্ত আইন ও সংবিধান ইহুদীদের ও খ্রিষ্টানদের প্রবৃত্তি থেকে সংগৃহীত আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর শারীয়াহ থেকে নয়।

এ মাস’আলায় আমি সবশেষে বলছিঃ

﴿اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ﴾

“তবে কি তারা জাহিলিয়্যাতের বিধিবিধান কামনা করে? আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে আর কে শ্রেষ্ঠতর?”[82] এই আয়াতের পূর্বে রয়েছেঃ

﴿وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ﴾

“আর নিশ্চয়ই অধিকাংশ মানুষ ফাসিক্ব।”[83]

[81] সুরা বাকারাহঃ ১২০

[82] সুরা মায়িদাহঃ ৫০

[83] সুরা মায়িদাহঃ ৪৯

এখানে "তারা ফাসিক্ব"এর অর্থ কী? এটা কি ফিসক্বে আসগার–যা মিল্লাহ থেকে বের করে না? নাকি ফিসক্বে আকবর–যা মিল্লাহ থেকে বের করে দেয়?

এই ফিসক্ব হচ্ছে এমন ফিসক্ব যা মিল্লাহ থেকে বের করে দেয়। যে ব্যক্তি জাহিলী বিধিবিধান চায়–এটা ফিসক্বে আকবার যা মিল্লাহ থেকে বের করে দেয়। কিভাবে?

কারণ যে ব্যক্তি জাহিলী বিধিবিধান চায় তার চাওয়া **আবশ্যক করে** যে, সে মানবসৃষ্ট আইনসমূহের প্রতি সন্তুষ্ট; কারণ যে ব্যক্তি কোন বিষয় চায় সে এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। আমি এমন বিষয় চাইব না যার প্রতি আমি সন্তুষ্ট না। আর আমি অবাশ্যম্ভাবিরূপে এমন বিষয় চাইব যার প্রতি আমি সন্তুষ্ট।

তাহলে জাহিলী বিধিবিধান কামনা করা আবশ্যকীয় বিষয়ের একটি হল সে এই সমস্ত আইন ও সংবিধানের প্রতি সন্তুষ্ট। আর আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র নিকট মূলনীতি হচ্ছে যেমন ক্বাযী ইয়ায رَحِمَهُاللهُ উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, "কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা কুফর।" তাহলে এটা হল জাহিলী বিধান কামনা করার আবশ্যকীয় বিষয়সমূহমহের মধ্য থেকে একটি আবশ্যকীয় বিষয়।

আরেকটি আবশ্যকীয় বিষয়ঃ যে ব্যক্তি এই সমস্ত আইন চায় এবং এই সমস্ত আইন ও সংবিধানের মাধ্যমে শাসন করতে চায় তার উপর ঐ কথা কার্যকর হবে যা আমরা সংবিধান প্রণয়ন কমিটি সম্পর্কে বলেছিলাম; সে সংবিধান প্রণয়ন কমিটিকে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করেছে, সে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى কে বদ দিয়ে তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে, সে তাদেরকে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শরীক সাব্যস্ত করেছে এবং সে তাদেরকে এমন দ্বীন তৈরিকারী বানিয়েছে যে ব্যাপারে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ অনুমতি দেননি। এই সবগুলোই এমন ব্যক্তির আবশ্যকীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যে এই ধরনের আইনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

এই সন্তুষ্টির আবশ্যকীয় বিষয়ের আরো একটি হলঃ অপরিহার্যভাবে আবশ্যক হয় যে, সে আল্লাহর শারীয়াহ'কে এক পার্শ্বে সরিয়ে রাখে। কারণ যে ব্যক্তি জাহিলী বিধিবিধান কামনা করে এবং জাহিলী বিধিবিধান চায় তখন অপরিহার্যভাবে আল্লাহ

تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর শারীয়াহ'কে এক পার্শ্বে সরিয়ে রাখা হয়।

তাহলে - "তবে কি তারা জাহিলিয়্যাতের বিধিবিধান কামনা করে?" তাই যে ব্যক্তি চাইবে সে ফাসিক্ব। আর তার ফিসক্ব হল ফিসক্বে আকবার যা মিল্লাহ থেকে বের করে দেয়; কারণ ওই চাওয়ার আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ হল এই তিনটি বিষয় যেগুলো আমি উল্লেখ করলাম।

আশ্চর্যের বিষয় হল, বর্তমান সময়ের মানুষের বাস্তবতা এই আয়াত নাযিল হওয়ার সময়ের মানুষের বাস্তবতার চেয়ে ভিন্ন নয়। কোনো অংশেই ভিন্ন নয়। **আপনি সাদৃশ্যের দিকগুলো লক্ষ্য করুনঃ**

ঐ সময়ে জাহিলী বিধিবিধান বিদ্যমান ছিলঃ "তবে কি তারা জাহিলিয়্যাতের বিধিবিধান কামনা করে?" আর বর্তমান সময়ে জাহিলী বিধিবিধান বিদ্যমান রয়েছে। এখন আমার নিকট প্রমাণিত হয়েছে যে, বর্তমান সময়ের জাহিলী বিধিবিধান হল এই সমস্ত আইন ও সংবিধান। এটা হল সাদৃশ্যের প্রথম দিক।

সাদৃশ্যের দ্বিতীয় দিকঃ ঐ সময়ে অধিকাংশ মানুষ ঐ সমস্ত জাহিলী বিধিবিধান চাইত। আপনি বর্তমান সময়ে কী বলবেন, কারা চায়? অধিকাংশরা কোথায়? তারা কি সর্বোত্তম বিধান শারীয়াহ চায়? নাকি তারা জাহিলী বিধান চায়? তাহলে তখন যেমন অধিকাংশ প্রমাণিত ছিল এখনও অধিকাংশ প্রমাণিত।

সাদৃশ্যের তৃতীয় দিকঃ তারা ঐ সমস্ত জাহিলী বিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালা বা শাসন করার জন্য লড়াই করত। এটা বর্তমানেও বাস্তবায়িত যে, তারা লড়াই করে, যে লড়াই করে তাকে সাহায্য করে, যে লড়াই করে তার সহযোগী হয়।

সাদৃশ্যের এই দিকগুলো ঐ লোকদের মাঝে এবং এই লোকদের মাঝে বাস্তবায়িত। যেমন ঐ সকল ব্যক্তিরা ফাসিক্ব মুশরিক–ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্। আর এই ব্যক্তিরাও ফাসিক্ব আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর দ্বীন থেকে মুরতাদ।

আমি এতোটুকুই বললাম। আমি আল্লাহর নিকট আমার জন্য এবং আপনাদের জন্য ইস্তিগফার করি। আল্লাহ আপনাদের উত্তম বিনিময় দান করুন

এবং আপনাদেরকে বারাকাহ্ দান করুন!

আনুগত্যের শিরক সংক্রান্ত উৎকর্ষ বিবরণ

শাইখ আবু আলী আল-আনবারী
আল-কুরাইশী ﷺ

ষষ্ঠ দারসঃ

সংবিধানের বাস্তবতা এবং এব্যাপারে শারীয়াহ’র হুকুম [সম্পূরক]

الحَمدُ للّه والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسُولِ اللّه؛

হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে হক্বকে হক্ব হিসেবে দেখান এবং হক্ব অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করুন, বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখান এবং বাতিল বর্জন করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদের এমন বিষয় শিক্ষা দিন যা আমাদের উপকার করবে এবং আপনি আমাদের যা শিক্ষা দেন এর মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে আমাদের ইলম অনুযায়ী আমলকারী বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন আমাদের ইলমকে আমাদের জন্য দলিল বানিয়ে দিন এবং আমাদের বিরুদ্ধে দলিল বানাবেন না - - ইয়া আরহামার-রহিমীন! হে আমার রব! আপনি আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিন, আমার বিষয়াদি সহজ করে দিন এবং আমাদের মুখের জড়তা দূর করে দিন যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে। হে আল্লাহ আপনি আমার কর্মকে সৎ বানিয়ে দিন, আপনার সন্তুষ্টির জন্য খালিছ করে দিন এবং আপনার সৃষ্টির কারো জন্য এতে কোন অংশ রাখবেন না।

অতঃপর,

আলোচনা হয়েছিল সংবিধান ও আইন সম্পর্কে, সংবিধানের বাস্তবতা এবং এই সংবিধানের ব্যাপারে শারীয়াহ'র হুকুম সম্পর্কে।

আমরা গত বৈঠকে আলোচনা করে বলেছি, এই সমস্ত সংবিধানের সবগুলোকেই জাহিলী সংবিধান হিসেবে গণ্য করা হয়। আমরা বর্ণনা করেছি, হয়তো অবিমিশ্র জাহিলী বিধান হবে অথবা অবিমিশ্র আল্লাহ প্রদত্ত বিধান হবে। আর তৃতীয় প্রকার হল যারা এর মাঝের কোন পথ গ্রহণ করতে চায়। এই ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾

“তারাই প্রকৃত কাফির।”[84] এই তাকফীর তথা কাফির সাব্যস্ত করা কোথা থেকে আসল?

উদ্দিষ্ট বিষয়ে আমরা প্রবেশ করার পূর্বে আমি শুধু একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছি; একটি মূলনীতি রয়েছে যা শাইখ আব্দুল লতীফ আলুশ-শাইখ رَحِمَهُ اللهُ প্রণয়ন করেছেন। তিনি বলেছেন, “ইসলাম ও শিরক দু’টি বিরোধী বিষয় যে বিষয় দু’টি একত্রিত হয় না এবং দু’টি বিপরীত বিষয় যে বিষয় দু’টি মিলিত হয় না ও একসাথে উঠে যায় না।”

এই উক্তির অর্থ কী?

ভাষাবিদরা যেমন "أضداد" তথা বিরোধী শব্দের পরিচয় দেন–আমার এমনটাই মনে পড়েঃ এমন প্রতিটি ব্যাপক বিষয় যার অধীনে দুইটি অংশের বেশি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। একে "أضداد" তথা বিরোধী বিষয়সমূহ বলা হয়।

এমন ব্যাপক বিশেষণ যার অধীনে দুইটি অংশের বেশি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। এটা হল বিরোধী বিষয়। যেমন আপনি বললেন, একটি গাছ। এটা ব্যাপক নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি নাম। কিন্তু এই নামের অধীনে তীন গাছ আছে, আনাড় গাছ আছে, আরো বিভিন্ন গাছ আছে... এই গাছগুলো পরস্পর বিরোধী। এই গাছ ঐ গাছের সাথে মিলিত হওয়া সম্ভব নয়। এইভাবে যে, একই সময়ে গাছটি আনাড় গাছ হবে এবং সেই একই সময়ে গাছটি তীন গাছ হবে।

তাহলে "أضداد" তথা বিরোধী বিষয়গুলো একত্রিত হয় না। কিন্তু উঠে যায়। অর্থাৎ আমরা বললাম, এই গাছটি আনাড় গাছ। কখনো কখনো এই গাছটি আনাড় গাছ হবে না, কখনো কখনো এই গাছটি তীন গাছ হবে, কখনো কখনো খেজুর গাছ হবে এবং কখনো কখনো অন্য গাছ হবে। তাহলে নিশ্চিতরূপেই একত্রিত হয় না কিন্তু দু’টি বিষয়ই উঠে যায়। তাই খোদ এই গাছটি সেটাও নয় এবং ওটাও নয়। কেবল এটি।

---

[84] সুরা নিসাঃ ১৫১

ইসলাম এবং শিরক এমন বিরোধী বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত যা একত্রিত হয় না। মানুষের মাঝে একই সময়ে শিরক ও ঈমান একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। এটা সম্ভব হবে না। এটা হল মূলনীতির প্রথম অংশ।

দ্বিতীয় অংশঃ তিনি বলেছেন, "দু'টি বিপরীত বিষয় যে বিষয় দু'টি মিলিত হয় না ও একসাথে উঠে যায় না।" নাক্বাইদ তথা বিপরীত বিষয়গুলোর পরিচয় এরকমঃ এমন প্রতিটি ব্যাপক বিষয় যার অধীনে শুধুমাত্র দু'টি অংশ অন্তর্ভুক্ত হয়। এটাকে নাক্বাইদ বলা হয়। বিষয়টি এমন যে, একজন মানুষ বলল, হয়তো সে মৃত অথবা জীবিত। সুতরাং যেকোনো অবস্থাতেই মানুষের মধ্যে এই বিপরীত দু'টি বিষয় একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ সে মৃত হবে এবং জীবিত হবে অথবা জীবিত হবে এবং মৃত হবে। এ বিপরীত বিষয়গুলো কখনোই একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়।

মূলনীতির ভাষ্যঃ "দু'টি বিপরীত বিষয় যে বিষয় দু'টি মিলিত হয় না।" অতঃপর তিনি বলেছেন, "এ বিষয় দু'টি একসাথে উঠে যায় না।" "এ বিষয় দু'টি একসাথে উঠে যায় না"এর অর্থ হলঃ অর্থাৎ এটা সম্ভব নয় যে, মানুষ জীবিত হবে না এবং মৃতও হবে না। আবশ্যক হচ্ছে আমরা এ দু'টির একটি সাব্যস্ত করব। তাই যখন আমরা এ দু'টির একটি সাব্যস্ত করব তখন অন্যটি উঠে যাবে।

সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম এবং শিরক দু'টি বিপরীত বিষয় যে বিষয় দু'টি একত্রিত হয় না এবং একসাথে উঠে যায় না। অর্থাৎ এটা সম্ভব নয় যে, মানুষ মু'মিন হবে অথচ তার মধ্যে শিরক আছে। এটা ভুল দৃষ্টিভঙ্গি। কোন অবস্থাতেই এটা সম্ভব নয় যে, সে মুসলিম হবে অথচ তার মাঝে শিরক আছে। এটা একটি ভুল বিষয়। কারণ কোন অবস্থাতেই ইসলাম শিরকের সাথে একত্রিত হয় না; যখন এ দু'টি একত্রিত হবে তখন এ দু'টির একটি উঠে যাবে। তাই আমরা বলি, একজন মুসলিম এবং একজন মুশরিক। যতবার শিরক প্রমাণিত হবে ততবার ইসলাম উঠে যাওয়া আবশ্যক হবে। এই কথার দলিল কী?

আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণীঃ

﴿وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا﴾

"তারা বলে, 'আমরা কিছু অংশের উপর ঈমান আনি এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করি।' আর তারা এর মাঝামঝি একটা পথ গ্রহণ করতে চায়।"[85] তারা যখন দু'টি বিপরীত বিষয়ের মাঝে ইসলাম এবং কুফরের মাঝে একত্রিত করতে চাইল তখন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ কী বলেছেন? তিনি বলেছেন, "তারাই প্রকৃত কাফির।" যখন তিনি কুফর প্রমাণিত করলেন তখন ইসলাম উঠে গেল। আমি এই মাস'আলাটি উল্লেখ করতে চেয়েছিলাম। যদি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ সহজ করে দেন আবশ্যই আমরা এই বিষয়ে একদিন বিস্তারিত আলোচনা করব।

এখন আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসিঃ সংবিধান সম্পর্কে সম্পূরক আলোচনা। এই সকল আইন যেগুলোর মাধ্যমে মুসলিমদের শাসন করা হয় - আমার আলোচনা বর্তমানে ইসলামের দেশগুলোতে অবস্থানরত মুসলিমদের ব্যাপারে - এই সমস্ত সংবিধান এবং আইনের সিফাত হচ্ছেঃ

এগুলো ইহুদীদের এবং খ্রিষ্টানদের প্রবৃত্তি থেকে সংগৃহীত।

এই কথার দলিল কী? আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ বলেন,

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

"আর ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন। বলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহর হিদায়াতই প্রকৃত হিদায়াত। আর যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির (খেয়াল-খুশীর) অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান আসার পরও, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার কোন অভিভাবক থাকবে না এবং থাকবে না কোন সাহায্যকারীও।"[86]

আমরা যে শিরোনাম দিয়েছি—এর সাথে এই আয়াতের সম্পর্ক কী? আমরা

[85] সুরা নিসাঃ ১৫০

[86] সুরা বাকারাহঃ ১২০

বলেছি, এই সকল সংবিধান হচ্ছে ইহুদীদের এবং খ্রিষ্টানদের প্রবৃত্তি থেকে সংগৃহীত।

প্রথমতঃ আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى এই আয়াতে কারীমায় কিছু মাস'আলা উল্লেখ করেছেন। এ সকল মাস'আলার মধ্যে রয়েছেঃ

প্রথম মাস'আলাঃ তিনি স্থির করেছেন - অর্থাৎ আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى স্থির করেছেন যে, ইহুদীদের এবং খ্রিষ্টানদের মিল্লাহ তথা ধর্ম রয়েছে। অতঃপর তিনি আরো স্থির করেছেন যে, ইহুদীদের এবং খ্রিষ্টানদের আহওয়া তথা প্রবৃত্তি রয়েছে- "আর ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন। বলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহর হিদায়াতই প্রকৃত হিদায়াত। আর যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির (খেয়াল-খুশীর) অনুসরণ করেন।" অতএব তাদের মিল্লাহ রয়েছে এবং তাদের প্রবৃত্তি রয়েছে। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى এই মাস'আলায় এই দুইটি বিষয় নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং প্রবৃত্তি দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এই আয়াতে কারীমায় মিল্লাহ দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

ইমাম কুরতুবী সহ অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন, এখানে মিল্লাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীন, শারীয়াহ এবং বিধান।

কিন্তু মিল্লাহ শব্দকে দ্বীনের ক্ষেত্রে আরোপ করা হবেঃ "আর ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন।" অর্থাৎ যতক্ষণ না আপনি তাদের দ্বীনের অনুসরণ করেন। মিল্লাহ অর্থ দ্বীন– এর দলিল কী?

সুরা ইউসুফের ৩৭-৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى আল্লাহর নাবী ইউসুফের ভাষায় ওহীরূপে বলেন,

إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۝

"নিশ্চয়ই আমি বর্জন করেছি সে সম্প্রদায়ের মিল্লাত তথা ধর্মকে যারা আল্লাহর

উপর ঈমান আনে না আর তারা আখিরাতকে অস্বীকার করে। আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক্ব এবং ইয়াকুবের মিল্লাত অনুসরণ করি।” তাহলে তিনি কাফিরদের জন্য মিল্লাহ সাব্যস্ত করেছেন এবং আল্লাহর নাবী ইবরাহীম, ইসহাক্ব, ইয়াকুবের জন্য মিল্লাহ সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু যখন তিনি ঐ সকল মিল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তখন তিনি বলেছেন, “নিশ্চয়ই আমি বর্জন করেছি সে সম্প্রদায়ের মিল্লাত তথা ধর্মকে যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে না আর তারা আখিরাতকে অস্বীকার করে।” তাহলে মিল্লাহ কখনো কুফরের মিল্লাহ হয় এবং কখনো ঈমানের মিল্লাহ হয়ঃ “আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক্ব এবং ইয়াকুবের মিল্লাত অনুসরণ করি।” এটা হল ঈমানের মিল্লাহ। তথাপি আপনি ভুলে যাবেন না, ঐটা কুফরের মিল্লাহ। এটা হল মিল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা। আমরা প্রবৃত্তির আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে কিছু সময় বিরতি নিচ্ছি। “আর যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির (খেয়াল-খুশীর) অনুসরণ করেন।” আমরা এই আয়াত থেকে কী বুঝলাম?

প্রথম মাস’আলা আমরা যা অনুধাবন করিঃ আমরা মুসলিম–আমাদের সাথে ইহুদীদের এবং খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক কী? এরপর ইহুদীদের এবং খ্রিষ্টানদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কী??

আমাদের সাথে তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধেঃ এ সম্পর্ক শত্রুতার উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেছেন, “আর ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন।” তাহলে আমাদের উপর তাদের শত্রুতা আমাদের দ্বীনের কারণে প্রতিষ্ঠিত। তবে কখনো কখনো ইহুদীদের এবং খ্রিষ্টানদের শত্রুতা অন্য কারণেও হয়। বিভিন্ন স্বার্থের জন্য কখনো কখনো অমুক দলের সাথে বা অমুক রাষ্ট্রের সাথে শত্রুতা করে। যেমন ইরানের সাথে তাদের অবস্থা যেমন ছিল। তারা কিভাবে তার সাথে অবস্থান নিল অতঃপর তারা তাকে পরিবর্তন করল। অতএব তাদের এ শত্রুতা দ্বীনের কারণে ছিল না, ছিল তাদের নিকট বিদ্যমান বিভিন্ন স্বার্থের কারণে। যখন এই সকল স্বার্থ বাস্তবায়ন হয় তখন তারা সন্তুষ্ট হয়। আর যখন এই সকল স্বার্থ অনুপস্থিত থাকে

তখন তারা ক্রুদ্ধ হয়। এমনিভাবে কিছু দল আছে যেগুলো ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত তারা দাবি করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহুদীরা ও খ্রিষ্টানরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে ইহুদী-খ্রিষ্টানরা তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়। তাদের ক্রুদ্ধ হওয়া তাদের দ্বীনের কারণে নয়। তা কেবল বিভিন্ন উপকরণের জন্য।

আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ'র সাথে তাদের এ শত্রুতা হচ্ছে আক্বীদাহ তথা বিশ্বাসের শত্রুতা। যে শত্রুতার কোন মীমাংসা খুঁজে পাওয়া যায় না। ইহুদী খ্রিষ্টান ও অন্যান্য মিল্লাহ'র মাঝে যদি বিভিন্ন স্বার্থের জন্য শত্রুতা হয়, যদি বিভিন্ন মতের জন্য হয় এবং অন্যান্য কারণে হয়-এ সবগুলোই মীমাংসার উপযুক্ত। আপনি দেখবেন, ঐ ইতর খোমেনী ক্ষমতায় আসা থেকে আজ পর্যন্ত ইরানের সাথে তাদের কত শত্রুতা। কিন্তু তাদের এই শত্রুতা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কেন? কারণ এই শত্রুতা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ'র দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত শত্রুতা নয়। এই শত্রুতা শুধুই বিভিন্ন স্বার্থের শত্রুতা।

আর আহলুস সুন্নাহ'র সাথে তাদের এ শত্রুতার কোন মীমাংসা নেই। এই শত্রুতার কোন মীমাংসা নেই–এব্যাপারে দলিল হল আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণীঃ

﴿وَ لَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوا﴾

"আর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নেয়, যদি তারা সক্ষম হয়।"[87] অতএব তাদের পক্ষ থেকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলতে থাকবে। এই যুদ্ধ থামবে না তবে যখন তারা আমাদেরকে আমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নিতে পারবে অতঃপর যখন আমরাও আমাদের দ্বীন থেকে ফিরে আসব তখন এই যুদ্ধ বন্ধ হবে।

এখানে আমার ইচ্ছানুযায়ী আপনার উদ্দেশ্যে যুক্ত করছি। আমাদের সাথে ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের শত্রুতা হবে যদি আমরা আমাদের দ্বীন অনুকরণ করি। আমি দ্বীন অনুকরণ দ্বারা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণীতে যা এসেছে তা উদ্দেশ্যে করছিঃ

[87] সুরা বাকারাহঃ ২১৭

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً﴾

“হে মু’মিনগণ, তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ কর।”[৪৪] অর্থাৎঃ তোমরা ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ কর এবং ইসলাম থেকে কোন বিষয় ছেড়ে দিও না। তাই যে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে দ্বীন গ্রহণ করবে ইহুদী এবং খ্রিষ্টানরা তার সাথে শত্রুতা করবে এবং কোন অবস্থাতেই এই শত্রুতা বন্ধ হবে না যতক্ষণ না আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ মুসলিমদেরকে কর্তৃত্ব দান করেন এবং এদেরকে পরাজিত করেন। আর যারা ইসলামের সাথে সম্পৃক্ততার দাবি করে এবং ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করে না এই ব্যক্তিরা যদি তাদের সাথে শত্রুতা করে তাহলে তারা তাদের সাথে তাদের দ্বীনের জন্য শত্রুতা করে না। তারা তাদের সাথে শত্রুতা করে অন্যান্য উপকরণের জন্য।

“তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ কর” এর অর্থ হলঃ আপনি দ্বীনকে দাওয়াহ এবং যুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করবেন। এটাই হল পরিপূর্ণ ইসলাম। তাই মুসলিমরা যখন জিহাদ করা ছেড়ে দিবে তখন তারা অবশ্যই তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে। এটা জানা সত্ত্বেও যে, আমরা আমাদের দ্বীন পরিত্যাগ করিনি। যদিও আমরা সালাত আদায় করি, মাসজিদে যাই, সিয়াম পালন করি, নিজেদের পরিশুদ্ধ করি, হজ্জ পালন করি এবং অন্যান্য ইবাদাত করি–এগুলো তাদের নিকট কোন সমস্যা নয়। কিন্তু আপনি শুধু অস্ত্র ধরার চিন্তা করবেন না। কারণ আপনি যখন ইসলামের এই রুকুনগুলো পালন করবেন এবং এই রুকুনগুলোর সাথে শক্তি, অস্ত্র ধরা ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা যুক্ত করবেন তখন আপনার সাথে কোন অবস্থাতেই তাদের ঐক্যমতে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে না এবং কখনোই তারা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না আপনি তাদের অনুসারী হোনঃ “আর ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন।” অতএব আমাদের মাঝে এবং তাদের মাঝে সম্পর্ক হচ্ছে যুদ্ধের সম্পর্ক এবং এটা ক্বিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না।

---

[৪৪] সুরা বাকারাহঃ ২০৮

এই সকল আয়াতে অন্য আরেকটি বিষয় আছে যা আহলুস সুন্নাহ’র মাঝে এবং ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মাঝে সম্পর্কের ব্যাপারে ইঙ্গিত দেয়ঃ

আপনি জানেন যে, বর্তমানে মিডিয়া হচ্ছে যুদ্ধের একটি মাধ্যম এবং ময়দানের মাধ্যমসমূহের একটি মাধ্যম। প্রত্যেকেই মিডিয়াকে নিজস্ব পদ্ধতিতে ব্যবহার করে। আপনি যেমন জানেন, মিডিয়া নাবী ﷺ -এর কর্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং মক্কাবাসীরাও আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধগুলোতে মিডিয়া ব্যবহার করত। আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ’র মাঝে এবং ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মাঝে মিডিয়ার বিষয়ে পার্থক্যকারী বন্ধন আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণীতে রয়েছেঃ

﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا﴾

“আর অবশ্যই তোমরা শুনবে তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা।”[89] সুতরাং আমরা যখন এই মিডিয়া দেখি তখন আমরা মিডিয়ার কারণে অনেক কষ্ট পাই। এটা এমন এক বিষয় যা আমাদের অন্তর খুলে দেয়। আমরা এই আয়াতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতে পেরে প্রশান্তি অনুভব করি–এ দলিলের ভিত্তিতে যে, আমাদেরকে অসম্মান করার ক্ষেত্রে তারা তাদের মিডিয়াতে অবহেলা করে না–হোক সেটা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া অথবা হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া বা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া যেটাই হোক না কেন তা সমান। বড় বিষয় হচ্ছে আমরা এই মিডিয়া থেকে কষ্ট পাই। আর আমাদেরকে মিডিয়াতে তাদের কষ্ট দেওয়াটা আমাদের জন্য এক আনন্দের কারণ। যদিও কখনো কখনো এই মিডিয়া আমাদেরকে বিষণ্ণ করে–কারণ আমরা দেখতে পাই, কতিপয় মুসলিম এই মিডিয়ার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। বরং তাদের কেউ কেউ ঐ মিডিয়ার ব্যক্তিরা যা বলে তা সত্যায়ন করে ফেলে।

[89] সুরা আলে-ইমরানঃ ১৮৬

আমি জানি না কিভাবে এই মুসলিমদের নিকট একজন খ্রিষ্টান সত্যবাদী হয়? কারণ আমরা মুসলিম যখন মিথ্যা বলে তখন তার কথা গ্রহণ করা হয় না। সুতরাং একজন খ্রিষ্টান মুশরিক আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে শত্রুতাকারী এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী। এরপরেও সে আস্থার ও সততার পাত্র এবং তার সংবাদ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হয়!

অতএব এগুলো হচ্ছে আমাদের মাঝে এবং এই লোকদের মাঝে পার্থক্যকারী বন্ধন। তাই আপনি যখন বলবেন, "আর ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না।" সুতরাং আপনি জেনে রাখুন- আয়াত এদেরকেই উদ্দেশ্য করে অন্যদেরকে নয়। এজন্য মিসরের ইখওয়ান যখন মিসরের ক্ষমতা গ্রহণ করেছে তখন প্রথমে যে প্রতিনিধি দল মিসর পরিদর্শন করেছিল তারা হল আমেরিকানরা। তারা তাদেরকে গ্রহণ করে নিয়েছে, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে এবং তাদের নিকট অছিলা ধরেছে। গন্নুশী যখন তিউনিসিয়ায় ছিল তখন সে আমেরিকানদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের নিকট অছিলা ধরেছিল। সে কিছু সাহায্য চেয়েছিল। সে ভুলে গিয়েছিল যে, আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -ই হলেন রিযিক্বদাতা-

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

"আর যদি সে সব জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং আল্লাহকে ভয় করত তবে অবশ্যই আমরা তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।"[90] আসমান ও যমীনের বরকত আমেরিকানদের পক্ষ থেকে উন্মুক্ত হবে না। তা উন্মুক্ত হবে কেবল ঈমান তাক্বওয়ার মাধ্যমে। সে আমেরিকায় গিয়ে তাদের কাছে সম্পদ ভিক্ষা চেয়েছিল। সে বলেছিল, আমি জানি না, আমেরিকানরা আমাদের কাছে আর কী চায়? সন্ত্রাসীদেরকে তো আমরা নির্মূল করছি এবং তাদেরকে বন্দি করছি। তারা এর চেয়ে বেশি আমাদের কাছে কী চায়?! আমেরিকানরা তাদেরকে বশীভূত করে রাখে এবং তাদেরকে ছোট মনে করে। কারণ তারা তাদের দ্বীনকে সম্মান দেয়নি। ফলে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদের উপর এদেরকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন।

---

[90] সুরা আ'রাফঃ ৯৬

“আর ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন।” –এই মাস’আলার ক্ষেত্রে আমাদের একটি বিষয়ের নিকট অবস্থান নেওয়া উচিৎ।

আরেকটি বিষয় আছে যার সাথে এই আয়াতের সম্পর্ক রয়েছেঃ আপনি দেখতে পাবেন যে, এই খ্রিষ্টানরা বর্তমানে ইসলামের দেশগুলোর সকল শাসকদের উপর কর্তৃত্ব করছে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে একমাত্র দাওলাতুল ইসলাম ব্যতীত। আমাদের উপর তাদের কোন কর্তৃত্ব নেই। তাদের মাঝে এবং আমাদের মাঝে যুদ্ধে একবার এক পক্ষ আরেকবার অন্য পক্ষ জয়ী হয়। কিন্তু তারা আমাদেরকে পরিচালিত করতে সক্ষম হয় না এবং আমাদের দেশে যুদ্ধ না করে প্রবেশ করতে পারে না। আর তাদের পরিদর্শকরা আমাদের দেশে প্রবেশ করতে পারে না যেমন তারা অন্যান্য দেশে প্রবেশ করে। এই কর্তৃত্ব এবং এই ক্ষমতা কোথা থেকে আসল? আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ কেন এই নিকৃষ্ট ব্যক্তিদেরকে এই সমস্ত নগরীর উপর কর্তৃত্ব দিয়েছেন? তাদের সেনাবাহিনী আছে, তাদের অস্ত্রশস্ত্র আছে, তাদের প্রস্তুতি আছে, তাদের ধনসম্পদ আছে। তাহলে কী কারণে তারা এই ব্যক্তিদের অধীনে বশীভূত এবং ছোট?

ওবামা সৌদি সফর করে তাদের নিকট আবেদন করল যে, তারা যেন এই কাফেলায় যোগ দিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। দুই দিন পর সৌদি ঘোষণা করল যে, সে এই জোটে প্রবেশ করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জর্ডানের বাদশাহ তাদের সাথে যোগ দিয়েছে এবং জাযিরাতুল আরবের উপসাগরীয় দেশগুলো তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। কোথা থেকে এই বশীভূত নীচু হওয়া আসল? এটা জেনেও যে, তারা একজন খ্রিষ্টান কাফিরের সাথে অবস্থান করছে। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى তার সম্পর্কে বলেছেন,

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوْا إِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ﴾

“যারা কাফির তারা বলে, আল্লাহ তো তিনজনের মধ্যে তৃতীয়জন।”[91] তাদের নিকট

[91] সুরা মায়িদাহঃ ৭৩

তো এই বিষয়টি গোপন নয় তাহলে কিভাবে তারা তার সাথে অবস্থান করেছে?

আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى তা'আলার এবাণীর কারণেঃ

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰۤى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَیَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ

"স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা নিশ্চয়ই আমি আপনাকে মৃত্যু দানকারী, আমার নিকট আপনাকে উঠিয়ে নিব এবং যারা কুফরি করে তাদের মধ্য থেকে আপনাকে পবিত্র করব। আর আপনার অনুসারীগণকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিব।"[92] আল্লাহর নাবী ঈসার অনুসারীদেরকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত কাফির ও মুরতাদদের উপর কর্তৃত্ব দান করা হবে। সুতরাং এটা একটি আলামত যার মাধ্যমে আপনি দলিল পেশ করবেন যে, কেন এই সকল কাফিররা ঐ মুরতাদদের উপর কর্তৃত্ব করে এবং তারা কেন এই কাফিরদের উপর কর্তৃত্ব করতে সক্ষম হয় না।[93]

এই বরকতময় দাওলাহ'র উপর তাদের কর্তৃত্ব না করাটা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর এবাণীর কারণেঃ

---

[92] সুরা আলে-ইমরানঃ ৫৫

[93] ইমাম ত্বাবারী رَحِمَهُ اللهُ তাফসীরে ত্বাবারীতে বলেন, কেউ কেউ বলেছেন, খ্রিষ্টানদের মধ্য থেকে যারা আপনার অনুসারী হবে তাদেরকে ইহুদীদের উপর কর্তৃত্ব দিব। এই উক্তিকারী উল্লেখ করেছেন, আমার নিকট ইউনুস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে ইবনে ওয়াহাব সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, ইবনে যায়েদ আল্লাহর এবাণীর ব্যাখ্যায় বলেন, "وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الذِينَ كَفَرُوا" অর্থাৎঃ বানী ইসরাঈলের মধ্য থেকে যারা কুফরি করেছে তাদের থেকে। "وجاعل الذين اتبعوك" অর্থাৎঃ বানী ইসরাঈল এবং অন্যদের মধ্য থেকে যারা আপনার প্রতি ঈমান এনেছে। "فوق الذين كفروا" অর্থাৎঃ ক্বিয়ামত পর্যন্ত খ্রিষ্টানদেরকে ইহুদীদের উপর। তিনি বলেন, পূর্ব থেকে পশ্চিমে খ্রিষ্টানদের প্রতিটি দেশেই তারা ইহুদীদের উপর কর্তৃত্বশীল। ইহুদীরা প্রতিটি দেশেই অপদস্থ।

﴿وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ اَنْتُمُ الاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

"তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিতও হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মু'মিন হও।"[94] তাহলে ঈমানের কারণে আমরা এই ব্যক্তিদের উপর বিজয়ী হব। কিন্তু যে এই ঈমান থেকে সরে যাবে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তার উপর ইহুদীকে কর্তৃত্ব দিবেন এবং তার উপর খ্রিষ্টানকে কর্তৃত্ব দিবেন। তাই আপনি তাকে দেখবেন সে বশীভূত এবং নীচু। সে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার মধ্যে জীবন-যাপন করে। বরং সে প্রতীক্ষা করতে থাকে কখন তারা তার নিকট এমন কাউকে পাঠাবে যে তাকে পরিবর্তন করে ফেলবে এবং যে তার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করবে।

অতএব আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর এবাণীর সূচনাতে আমরা এই পার্থক্যকারী আলামতগুলোর নিকট অবস্থান করছিঃ "আর ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন।" এটা হল তারা আমাদের থেকে যা চায় সে সম্পর্কে। আর একজন মুসলিম তার দ্বীন থেকে মুক্ত হওয়ার অনুপাতে তারা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়। তাই যে ব্যক্তি একশ'র পঞ্চাশ পার্সেন্ট মুক্ত হবে তাদের সন্তুষ্টি হবে একশ'র পঞ্চাশ পার্সেন্ট। আর যে ব্যক্তি একশ'র একশ পার্সেন্ট মুক্ত হবে তার ক্ষেত্রে সন্তুষ্টি হবে একশ'র একশ পার্সেন্ট।

অন্য একটি মাস'আলাঃ আমরা তাদের সাথে কেমন আচরণ করব?

আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন, "আর যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির (খেয়াল-খুশীর) অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান আসার পরও, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার কোন অভিভাবক থাকবে না এবং থাকবে না কোন সাহায্যকারীও।" তাদের সন্তুষ্টি আমাদের দ্বীন বর্জন করার উপর নির্ভরশীল। আমরা তাদের সাথে আচরণ করব–তাদের প্রবৃত্তি থেকে সতর্ক থেকে, তাদের মিল্লাহ বা ধর্ম থেকে নয়। কেবলমাত্র তাদের প্রবৃত্তি থেকে।

---

[94] সুরা আলে-ইমরানঃ ১৩৯

আর আপনি যেমন জানেন, হাওয়া বা প্রবৃত্তি হলঃ সন্দেহ, সংশয় ও কামনার অন্তর্ভুক্ত অন্তর যার দিকে ঝুঁকে পড়ে। অর্থাৎ শারয়ী বিরোধী বিষয়কে হাওয়া বা প্রবৃত্তি বলা হয়।

এখন প্রশ্ন আসে যে, ইউরোপের এই ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা কি তাদের দ্বীন দ্বারা শাসন করে নাকি তারা তাদের প্রবৃত্তি দ্বারা শাসন করে? নিশ্চিতভাবেই এখন তারা তাদের প্রবৃত্তি দ্বারা শাসন করে তাদের দ্বীন দ্বারা নয়।

এই খ্রিষ্টানরা কিভাবে বিবর্তিত হল যে, তারা তাদের দ্বীন থেকে মুক্ত হয়ে এমন কিছু আইন নিয়ে এসেছে যেগুলো তারা তাদের প্রবৃত্তি দ্বারা রচনা করেছে এবং এই সমস্ত আইন দ্বারা শাসন করেছে ও এই আইনসমূহের নিকট বিচার চাইছে?

আপনি বিস্মিত হবেন না, যখন জানবেন বিষয়টি ইহুদীদের সাথে সম্পৃক্ত। ইহুদীরা এই বিষয়টি বিন্যস্ত করেছে যেন তারা খ্রিষ্টানদের দেশগুলোকে এমন স্থানে পৌঁছে দিতে পারে যাতে খ্রিষ্টানরা তাদের প্রবৃত্তি দ্বারা শাসন করে তাদের দ্বীন দ্বারা নয়। বিষয়টি শুরু হয়েছিল খ্রিষ্ট শতকের ১৬ শতাব্দী তথা ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝের দিকে। তৎকালীন সময়ে এক ইহুদীর আবির্ভাব হয়েছিল যার নাম ছিল ‘মার্টিন লুথার’। সে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল। অতঃপর সে খ্রিষ্ট ধর্মের নামে ইহুদী ধর্মের দিকে আহ্বান শুরু করল। সে ছিল একজন ইহুদী। সে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে খ্রিষ্ট ধর্মের মাধ্যমে ইহুদী ধর্মের দিকে আহ্বান করা শুরু করে। সে খ্রিষ্টানদের মাঝে কিছু দল পেল–তারা হল ক্যাথলিক এবং অর্থোডক্স। কিন্তু সে তৃতীয় আরেকটি দল উদ্ভাবন করল যারা “প্রোটেস্ট্যান্ট” নামে পরিচিত। আর এই শব্দের তরজমা হচ্ছে “প্রতিবাদী”। কিভাবে এই লোকটি এই দল উদ্ভাবন করল?

সে খ্রিষ্টানদেরকে তাওরাতের আক্ষরিকতার দিকে আহ্বান করত। অর্থাৎ সে তাদেরকে উৎসাহিত করত যে, তারা যেন তাওরাতে বর্ণিত সকল বিষয় সঠিক–এ বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে। সে একজন খ্রিষ্টান–এ বিষয়টি জানার কারণে মানুষ ইতস্তত করছিল। সে তাদেরকে রাজি করালো যে, তারা ইঞ্জিলের প্রতি ঈমান আনার পূর্বে তারা তাওরাতের প্রতি ঈমান আনবে। এজন্য আপনি খ্রিষ্টানদের এই প্রকারটি

দেখতে পাবেন যারা দুই কিতাবের অধিকারী। যাকে বলা হয় এক কপিতে পুরাতন টেস্টামেন্ট বাইবেল এবং নতুন টেস্টামেন্ট বাইবেল। ফলে একজন খ্রিষ্টান তাওরাত পড়ে এবং তাওরাতে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে এরপর সে ইঞ্জিলে বর্ণিত বিষয় পড়া শুরু করে।

এই ব্যক্তিদের অভ্যন্তরেই তারা ইহুদীদের দিকে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এর দৃশ্যমান অবস্থা হল সে একজন খ্রিষ্টান। এজন্যই ইউরোপের সকল নেতারা এই মতাদর্শের হয়ে থাকে। তাদের প্রত্যেকেই প্রোটেস্ট্যান্টী। সে ক্যাথলিক হবে–এটা সম্ভব নয় এবং সে অর্থোডক্স হবে–এটাও সম্ভব নয়। কেন? কারণ একজন প্রোটেস্ট্যান্টীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা হচ্ছে একজন ইহুদী যদিও তার বহিরাগত খোসা হচ্ছে সে একজন খ্রিষ্টান; এজন্য আপনি তাদের দেখতে পাবেন, তারা সবচেয়ে বেশি ইসরাইলের প্রতিরক্ষাকারী এবং তারা তাদের জনগণকে বশীভূত করে যেন তারাও ইসরাইলকে রক্ষা করে।

আপনি জানেন যে, আব্রাহাম লিঙ্কন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিল। সে তার সময়ে আমেরিকানদেরকে ইহুদীদের সাথে পারস্পারিক আচরণের ব্যাপারে সতর্ক করেছিল। সে একটি রিসালাহ লিখেছে। এই রিসালাহ'টি আমেরিকার জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। সে যা বলেছে এর সারমর্ম হলঃ ইহুদীরা যখন এভাবে স্থায়ী হবে তখন তারা আমেরিকার সরকারকে এবং আমেরিকার জনগোষ্ঠীকে পরিচালিত করবে। সামনে এমন এক দিন আসবে আমেরিকার জনগণ ইসরাইলের সেবা করায় পরিবর্তিত হবে। সে এটা বলেছিল ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে। এ বিষয়টি আমাদের সময়ে এসে বাস্তবায়ন হয়েছে। কেন? কারণ তারা সেই পথেই চলেছে যার ব্যাপারে সে তাদেরকে সতর্ক করেছিল। ফলে তারা এমন ফলাফলে এসে পৌঁছেছে যে, আপনি যেমন জানেন, আমেরিকার জনগণ এখন তাদের সব সামর্থ্য দিয়ে ইহুদীদের সেবা করছে।

অতএব খ্রিষ্টানরা ইহুদীদের দিকে বিবর্তিত হয়েছে। এরপর তারা দ্বীন তথা ধর্ম বলা হয় এমন বিষয় থেকে মুক্ত হতে চাইল। সেটা যে ধর্মই হোক না কেন। একটি বই আছে সেই বইটি পড়ার ব্যাপারে আমি আপনাকে নসিহা করছি। বইটির

নাম হল 'বুরুতুকালাত হুক্কাম ছহাইউন'। তবে শর্ত হচ্ছে আপনি মুহাম্মাদ খলিফাহ আত-তিউনিসীর তাহক্বীক্বকৃত বইটি পড়বেন। সম্ভবত সেটাতে একশ পৃষ্ঠার ভূমিকা আছে। ইহুদীদের মতাদর্শের মধ্যে রয়েছে তারা গোলাকার পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করতে চায় এবং গোলাকার পৃথিবীর সকলকে তাদের সেবা করার দিকে পরিবর্তন করতে চায়। এটা হল তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। আর তারা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌঁছতে চাচ্ছে। কিন্তু যখন এই শাসকরা পর্যালোচনা করল যে, উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে তাদের সামনে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তখন তারা দেখল প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে দুইটি বিষয়েঃ দ্বীন তথা ধর্ম এবং নৈতিকতা। অতঃপর তারা মানুষকে ধর্ম ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে কাজ শুরু করে। তারা ধর্মহীন হবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নার্থে সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝের দিকে একজন ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে যার নাম 'কার্ল মার্ক্স'। এই ব্যক্তির পিতা একজন হাখাম ইহুদী ছিল। তারা তাকে বাধ্য করে আর সে ছয় বছর বয়সে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। অতঃপর সে খ্রিষ্টান হয়ে বেড়ে ওঠে। সোভিয়েত ইউনিয়ন খ্রিষ্টানদের বৃহৎ দূর্গগুলোর মধ্যে একটি দূর্গ ছিল। এই ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর এবং প্রভাব অর্জন করার পর সে কমিউনিজমের দিকে আহ্বান করতে শুরু করে। সে ইতালি থেকে কিছু লোক নিয়ে এসে তাদের তিনশ লোককে ভাড়া করেছিল যারা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সংঘটিত করে এবং তারা সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। কমিউনিস্ট দলের আক্বীদাহ-বিশ্বাস দুইটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিতঃ কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই এবং জীবনই হচ্ছে মূল। তারা কোন ইলাহের অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেয় না। দ্বিতীয় বিষয়টি তারা বলে, ধর্ম হল জনগণের আফিম। অর্থাৎ ধর্মপ্রাণ জনগণ অচেতন হয়। তাই আমরা যখন এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে যে অচেতনতা থাকে তা থেকে তাদেরকে সতর্ক করতে চাই তখন আবশ্যক হয় যে, তাদের মাঝে কোন ধর্ম থাকবে না। ফলে তারা পুরো সোভিয়েত ইউনিয়নকে এমন এক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করল যে রাষ্ট্র কোন ধর্মে বিশ্বাস করে না এবং ইলাহ বা উপাস্যে বিশ্বাস করে না। অতঃপর এই নিকৃষ্ট মতবাদ বুলগেরিয়ায় স্থানান্তরিত হয় এবং চেকোস্লোভাকিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। আমাদের দেশেও এটা পৌঁছেছে। বর্তমানে রাফিদীদের কল্যাণে, ইরাকী পার্টির কল্যাণে এবং ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টির কল্যাণে এখানে এটা হয়েছে যারা কোন

ইলাহের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না এবং কাঠামোগত কোন ধর্মকে স্বীকৃতি দেয় না।

তারা মানুষকে ধর্মহীনতার দিকে পরিবর্তন করেছে। যখন কোন ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না তখন ধর্মের মাধ্যমে তাদেরকে শাসনও করা হবে না। আর তখনই আবশ্যক হবে এমন কিছু আইন তৈরি করা যেগুলো তাদের জীবনকে সুবিন্যস্ত করবে। ফলে তারা ধর্মকে আলাদা করে গির্জায় রেখে দিল। তারা আইন ও সংবিধান প্রণয়ন করল এবং তারা নিজেরাই এই সকল আইন ও এই সকল সংবিধান দ্বারা শাসন করা শুরু করে। তারা এখনো তাদের প্রবৃত্তি দ্বারা শাসন করে তাদের দ্বীন বা ধর্ম দ্বারা নয়।

আমি আপনার নিকট খ্রিষ্ট ধর্মের দশ ওয়াছিয়্যাহ’র সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু প্রমাণ উল্লেখ করছিঃ

খ্রিষ্ট ধর্ম দশ ওয়াছিয়্যাহ’র উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলোর একাংশ আমার স্মরণে আছে পুরোটা আমার স্মরণে নেই। এর মধ্যে রয়েছেঃ তুমি চুরি করবে না, তুমি যিনা করবে না, তুমি মিথ্যা বলবে না, তুমি তোমার পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না। এগুলোকে বলা হয় দশ ওয়াছিয়্যাহ। তাহলে এই দশ ওয়াছিয়্যাহ’র মধ্যে রয়েছেঃ তুমি যিনা করবে না। এটা হল তাদের ধর্ম। কিন্তু তারা যখন তাদের ধর্ম ছেড়ে দিয়ে তাদের প্রবৃত্তি দ্বারা শাসন করা শুরু করেছে তখন তারা রাস্তার পশুতে রূপান্তরিত হয়েছে। তারা ফুটপাতে, গাড়িতে, রেস্টুরেন্টে, কফি হাউজে যিনা-ব্যভিচার করে। ঐ দেশগুলোতে অবস্থানরত ছিল এমন একজনের থেকে আমি শুনেছি সে বলেছেঃ ঐ দেশগুলোতে প্রতিটি এলাকাতে এমন স্থান আছে যেখানে তারা মিলিত হয় এবং সেখানে একজন পুরুষ যেকোনো নারীর সাথে মিলিত হতে পারে। আর তারা রাস্তাতেও এ ধরনের কাজ করে।

আমি একবার একজন ব্যক্তির উক্তি পড়ছিলাম—তার নাম উল্লেখ করা উপযুক্ত মনে করছি না। সে মনে হয় ব্রিটেনের লন্ডনে ছিল। সে বলল, আমি গির্জায় গিয়েছিলাম - সম্ভবত সে ঐ অঞ্চলের অট্টালিকার কিছু দৃশ্য খোঁজ করতে গিয়েছিল - সে বলল, আমি লোকজনকে দেখতে পেলাম তারা গির্জার উন্মুক্ত স্থানে যিনা-

ব্যভিচার করছে। অতঃপর আমার পাশ দিয়ে এক পাদ্রী যাচ্ছিল। আমি বললাম, আমি কি গির্জায় আছি? সে বলল, হ্যাঁ। অতঃপর আমি বললাম, এই লোকদের কী হয়েছে তারা গির্জার ভিতরে যিনা-ব্যভিচার করছে? অথচ দশ ওয়াছিয়্যাহ'তে রয়েছে 'তুমি যিনা-ব্যভিচার করবে না'! ফলে সে আমাকে বলল, আপনি কি পূর্বাঞ্চল থেকে এসেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বলেছেঃ অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে হাটতে হাটতে চলে গেল।

তাহলে গির্জার উন্মুক্ত স্থানে পাদ্রীর কিছুই করার সক্ষমতা নেই। কারণ তারা তাদের ধর্ম দ্বারা শাসন করে না বরং তারা তাদের প্রবৃত্তি দ্বারা, তাদের আইনসমূহ দ্বারা শাসন করে।

এমনিভাবে ত্বালাক্বের মাস'আলাঃ আপনি জানেন যে, খ্রিষ্টান পুরুষ যদি একজন খ্রিষ্টান নারীকে বিবাহ করে এবং তাদের এ বিবাহ বন্ধন পাদ্রী করিয়ে দেয় তাহলে এই বন্ধন বাতিল হবে না; কারণ তাদের ইঞ্জিলে একটি নছ আছে যে, বিবাহের বন্ধন হয় আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর পক্ষ থেকে। আর রবের চুক্তি বা বন্ধন কোন মানুষ বাতিল করতে পারে না। তাই এই নারী এই পুরুষের যিম্মাতে ঝুলন্ত থাকবে। যদিও তারা দু'জন আলাদা হয়ে যায়, যদিও তাদের একজন এক মহাদেশে বসবাস করে এবং অন্যজন আরেক মহাদেশে বসবাস করে। উপরন্তু বিবাহের চুক্তি অবশিষ্ট থাকবে। এটা হল তাদের ধর্ম। কিন্তু গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে অর্থাৎ ১৯৫০ এর মাঝে ইতালীরা এই বিষয়টি অনুভব করল যে, এ কী এক সমস্যা–আমি বিবাহ করে ভোগান্তিতে পড়ব। ফলে তারা বিক্ষোভে বের হয়ে ইতালী সরকারের কাছে দাবি জানাল যে, তারা যেন এমন কিছু আইন প্রণয়ন করে যে আইন ইতালী পুরুষের জন্য তার ইতালী স্ত্রীকে তালাক্ব দেওয়া বৈধ করে দেয়। বিক্ষোভ, প্লে কার্ড এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে তারা বের হয়েছিল। প্লে কার্ডগুলোতে তারা কিছু বাক্য লিখেছিল– প্লে কার্ডগুলোর ভাষ্য ছিলঃ "পশুরা কেবলমাত্র তালাক্ব দিবে না। আর মানুষ তালাক্ব দিবে।" বস্তুত এটা তাদের ধর্মের উপর বড় একটি অভিযোগ। কেননা তাদের ধর্মে তালাক্ব দেওয়া বৈধ নয়।

ইতালী সরকারকে চাপ প্রয়োগ করে বৈঠকে বসায়। অতঃপর ভোট করার

মাধ্যমে তারা স্বীকৃতি দেয় যে, ইতালী পুরুষের জন্য তার ইতালী খ্রিষ্টান স্ত্রীকে তালাক্ব দেওয়া বৈধ।

ইতালির বিষয়টি আমার উল্লেখ করার কারণ হল ইতালিতে ছোট একটি রাষ্ট্র আছে যার নাম হচ্ছে ভ্যাটিকান। অর্থাৎ তাদের পোপ সেখানে অবস্থান করে। এই লোকেরা এমন বিষয় চায় যা তাদের ধর্মের বিরোধী। এসত্ত্বেও ইতালী সরকার একটি আইন প্রণয়ন করেছে যেটা খ্রিষ্টানদের ধর্মের বিরোধী। আর পোপ তাদের দেশের মধ্যে তাদের নিকটেই অবস্থান করে সে এটা পরিবর্তন করতে সক্ষম না এবং সে হস্তক্ষেপ করতেও সক্ষম না। কেন? কারণ ঐ মানুষগুলো তাদের প্রবৃত্তি দ্বারা শাসন করে তারা তাদের ধর্ম দ্বারা শাসন করে না।

সুতরাং যখন আমাদের জন্য প্রমাণিত হল যে, ঐ রাষ্ট্রগুলো তাদের প্রবৃত্তি দ্বারা শাসন করা হয় তখন বর্তমানে আমাদের দেশগুলোতে বাস্তবায়িত সংবিধানের সাথে আমি যা বলেছি–এর কী সম্পর্ক রয়েছে?

তাহলে আমি আইন প্রণয়নের উৎসতে ফিরে যাচ্ছি। ইরাকের সংবিধান প্রণয়ন কমিটি, তিউনিসিয়ার সংবিধান প্রণয়ন কমিটি, মিসর, লিবিয়া, মরক্কো–যেকোনো দেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটি যখন এই সকল আইন, ধারা এবং অন্যান্য বিষয় প্রণয়ন সম্পন্ন করে তখন তারা যে সকল উৎস থেকে এই সমস্ত আইন গ্রহণ করে সেসকল উৎসের একটি তারা বলে, ইসলামী শারীয়াহ আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি উৎস। এই উৎসের আড়ালে কী আছে? আপনি অবশ্যই ফরাসী আইন দেখতে পাবেন, ইতালী আইন দেখতে পাবেন, আমেরিকান আইন দেখতে পাবেন, ব্রিটিশ আইন দেখতে পাবেন; তাহলে এই সকল আইন ঐ ব্যক্তিদের আইন থেকে সংগৃহীত। আর ঐ ব্যক্তিরা তাদের প্রবৃত্তি দ্বারা শাসন করে; অতএব যে সকল আইন দ্বারা বর্তমানে মুসলিমদেরকে শাসন করা হয় সেগুলো ইহুদীদের এবং খ্রিষ্টানদের প্রবৃত্তি থেকে সংগৃহীত। তা না হলে তারা তো তাদের প্রবৃত্তি দ্বারা যিনার বৈধতা দিয়েছে। তাহলে মুসলিমদের মাঝে ঐ আইনের অবস্থা কী যা যিনার বৈধতা দেয়?!

তারা মদ পান করা ব্যক্তিগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করেছে। তারা বলে, “মদ হচ্ছে তরল পদার্থ। আর মানুষের অধিকার রয়েছে যে, সে তরল পদার্থ পান করবে।” তাহলে মানুষের অধিকার রয়েছে সে মদ পান করবে! এটা তাদের ধর্মে রয়েছে, তাদের ভূমিতে বিদ্যমান আছে এবং তাদের প্রবৃত্তিতে রয়েছে। কিভাবে এই মদ মুসলিমদের দেশগুলোতে তৈরি করা, ক্রয়-বিক্রয় করা এবং পান করা হালাল করা হয়েছে? অথচ আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ বলেছেন,

﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾

“কাজেই তোমরা সেগুলো বর্জন কর।”[95] তাহলে এই সকল আইন তাদের প্রবৃত্তি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

সেখানে একজন নারী যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই বের হতে পারে। সে নগ্ন হয়ে বের হতে পারে। তার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই সে বের হতে পারে। তার ব্যাপারে কেউ কোন আপত্তি করতে পারবে না। ঐ মুসলিমা নারীর অবস্থা কী হল যে ঐ ব্যক্তিদের সাজসজ্জার ন্যায় সজ্জিত হয়ে বের হবে। অথচ রাসুল ﷺ বলেছেন, “দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামের অধিবাসী হবে; যাদেরকে আমি দেখিনি।....... আর দ্বিতীয় শ্রেণী হল সেই নারীদল; যারা কাপড় তো পরিধান করবে, কিন্তু তারা বস্তুতঃ উলঙ্গ থাকবে, যারা পুরুষদের আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, যাদের মস্তক (খোঁপা বাঁধার কারণে) উটের হেলে যাওয়া কুঁজের মত হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ এত এত দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।”[96] এই হাদিসের আলোকে এই মুসলিমা নারী কোথায় থাকেব? কেন এই সকল আইন নারীর জন্য পোশাকের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার বৈধতা দিয়েছে?

সেই তাগুত মুহাম্মাদ মুরসীকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করার আগে আল-জাযিরা

[95] সুরা মায়িদাহঃ ৯০

[96] সহীহ মুসলিম

চ্যানেলকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে এক উপস্থাপক তাকে প্রশ্ন করেছিল। আর আমি সেই সাক্ষাতকারটি শুনেছিলাম। সে বলল, মানুষ আপনাদের ব্যাপারে ভয় করছে যে, আপনি ক্ষমতায় গেলে নারীদের হিজাব পরিধান করতে বাধ্য করবেন। মুরসী মিসরী ভাষায় বলল, "এটা কে বলেছে? স্বাধীনতা তো আইন মোতাবেক নিবন্ধিত। একজন নারী যা ইচ্ছা করবে সে তা-ই পরিধান করতে পারবে।"

এটা কি আমাদের ধর্ম নাকি ইহুদীদের এবং খ্রিষ্টানদের প্রবৃত্তি?! একজন নারী স্বাধীন সে যা ইচ্ছা তা পরিধান করবে। আইন সকলের দায়িত্ব নেয়!!

হে ভাইগণ! এই সকল আইন তো ইহুদীদের প্রবৃত্তি এবং খ্রিষ্টানদের প্রবৃত্তি থেকে সংগৃহীত। এজন্য আপনি দেখতে পাবেন, এই আইনের সকল ধারা আমাদের দ্বীনের বিরোধী, আমরা যার উপর লালিতপালিত হয়েছি–এর বিরোধী, আমরা যে বিষয়ের উপর বেড়ে উঠেছি–এর বিরোধী। এমনকি গোত্রীয় ঐতিহ্যে থাকা রীতিসমূহের চাহিদার বিরোধী। আপনি দেখতে পাবেন যে, এই সকল আইন ঐ সমস্ত ঐতিহ্যের বিরোধী যার উপর আমরা লালিতপালিত হয়েছি যেহেতু এই ঐতিহ্যের রীতি আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর শারীয়াহ'র বিরোধী নয়।

তাহলে এই সকল আইন এবং এই সকল সংবিধানের সিফাত হচ্ছেঃ এগুলো ইহুদীদের প্রবৃত্তি এবং খ্রিষ্টানদের প্রবৃত্তি থেকে সংগ্রহীত।

এখানে একটি ভীতিকর আয়াত আছে। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى তার রাসুলকে বলেন,

وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ۝ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝ إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝

"আর আমরা আপনার প্রতি যা ওহী করেছি তা থেকে ওরা আপনাকে প্রায় পদস্খলিত করে ফেলেছিলো, যাতে আপনি আমাদের উপর সেটার বিপরীত মিথ্যা রটাতে পারেন; আর নিঃসন্দেহে তখন তারা আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত। আর

যদি আমরা আপনাকে অবিচল না রাখতাম আপনি অবশ্যই তাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকে পড়তেন। তখন আমরা অবশ্যই আপনাকে আস্বাদন করাতাম জীবনের দ্বিগুণ ও মরণের দ্বিগুণ আযাব। তারপর আপনি আমাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য কোন সাহায্যকারী পাবেন না।”[97]

“ওরা আপনাকে প্রায় পদস্খলিত করে ফেলেছিলো।” অর্থাৎ তারা আপনাকে ফিরিয়ে রাখবে - “আর আমরা আপনার প্রতি যা ওহী করেছি তা থেকে।” তাহলে মুসলিম ঐ বিষয় ছেড়ে দিবে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى আমাদের নিকট যা ওহী করেছেন। অর্থাৎঃ আমরা বিকল্প ব্যাবস্থা নিয়ে আসব; “আর নিঃসন্দেহে তখন তারা আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত।” বক্তব্য স্পষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বিধিবিধান থেকে ফিরে আসা। ইহুদীদের সন্তুষ্ট হওয়া এবং খ্রিষ্টানদের সন্তুষ্ট হওয়া আমাদের পক্ষ থেকেই বাস্তবায়ন হয় আমরা আমাদের দ্বীনের কোন অংশ ছেড়ে দিব– এব্যাপারে যখন তারা আমাদেরকে প্ররোচিত করতে সক্ষম হবে- “আর নিঃসন্দেহে তখন তারা আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত।” আপনি জানেন যে, অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব হল ভালবাসার সবচেয়ে উঁচু স্তর। এটা শুধু বন্ধুত্ব নয়। এটা হল অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। তাই যে ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে তখন ঐ ব্যক্তিদের সন্তুষ্ট হওয়া বাস্তবায়িত হবে। বরং তারা তাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে - আল্লাহ না করুন - যখন আমরা আমাদের দ্বীন থেকে ফিরে যাব। একজন মুসলিমের এই বাস্তবতাটি জানা উচিৎ।

এই সমস্ত আইন এবং এই সংবিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো একটি বিষয় আছে। কিন্তু আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে আমি একটি বিষয়ে ইঙ্গিত দিচ্ছি।

আমি বলি, এই শাসকদের জন্য উচিৎ ছিল তারা ইহুদীদের ও খ্রিষ্টানদের দেশগুলোকে ইসলামের মাধ্যমে শাসন করবে-

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾

[97] সুরা ইসরাঃ ৭৩-৭৫

“আর আপনি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করুন।”[98] পক্ষান্তরে তারাই ঐ ব্যক্তিদের ধর্ম দ্বারা মুসলিমদের শাসন করছে যা ভয়ানক বিপদের একটি। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, আমরা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা আমেরিকা শাসন করব, আমরা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা ফ্রান্স ও ব্রিটেন শাসন করব। পক্ষান্তরে আমরা তাদের কুফরি আইন নিয়ে এসে মুসলিমদের শাসন করছি। সুতরাং এটা সুষম বিষয়কে উলটপালট করা—ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্। সুষম বিষয়গুলো উলটপালট হয়েছে। বিপরীতে তারা ইসলামকে তাদের দেশে নিয়ে গিয়ে তারা তাদের কুফরি ইসলামের দেশগুলোতে নিয়ে এসেছে!! এটা বড়ই একটি আশ্চর্যের বিষয়।

সংবিধান ও আইন সম্পর্কে সর্বশেষ বাস্তবতা যা একজন মুসলিমের জানা উচিৎঃ

আমরা একটি আয়াতের আলোচনা পূর্বে করেছি। কিন্তু এই আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় আমরা উল্লেখ করব। এই আইন এবং এই সংবিধান হচ্ছে একটি দ্বীন তথা ধর্ম। যে ব্যক্তি এই আইন এবং এই সংবিধানের মাধ্যমে শাসন করে বা বিচার-ফায়সালা করে সে একটি দ্বীনের মাধ্যমে শাসন করল বা বিচার-ফায়সালা করল।

এর দলিল সুরা শুরার ২১ নং আয়াতে রয়েছেঃ

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾

“তাদের কি এমন শরীক রয়েছে, যারা তাদের জন্য আইন প্রণয়ন করে এমন ধর্মের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?”

আমরা ঐ সময়ে বলেছিলাম দ্বীন দুই ভাগে বিভক্তঃ সত্য দ্বীন এবং বাতিল দ্বীন।

এখন আমি বলি, সত্য দ্বীন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর দ্বীন। দ্বীনে

---

[98] সুরা মায়িদাহঃ ৪৯

হক্ব হল আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর দ্বীন। এর দলিল আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাবে রয়েছেঃ

﴿اَفَغَيۡرَ دِيۡنِ اللّٰهِ يَبۡغُوۡنَ وَ لَهٗۤ اَسۡلَمَ مَنۡ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ طَوۡعًا وَّ كَرۡهًا وَّ اِلَيۡهِ يُرۡجَعُوۡنَ﴾

“তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু চায়? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবকিছুই ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় তার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। আর তার দিকেই তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।”[99]

“আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু।” এখানে যে দ্বীন রয়েছে সেটাকে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ তার নিজের সুউচ্চ সত্তার দিকে সম্বোধন করেছেন। “তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু চায়? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবকিছুই ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় তার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। আর তার দিকেই তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।”

আরেকটি দ্বীন হল বাতিল দ্বীন—আমরা যার নাম দিয়েছিঃ শাসকের দ্বীন। শাসকের দ্বীনের অস্তিত্বের ব্যাপারে দলিল সুরা ইউসুফের ৭৬ নং আয়াতে রয়েছে। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ বলেন,

﴿مَا كَانَ لِيَاۡخُذَ اَخَاهُ فِیۡ دِیۡنِ الۡمَلِكِ﴾

“শাসকের (রাজার) দ্বীন তথা আইন অনুযায়ী সে তার সহোদর ভাইকে আটক করতে পারত না।” তাহলে হয়তো সেটা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর দ্বীন হবে অথবা শাসকের দ্বীন হবে।

এই সমস্ত বিধিবিধান নিশ্চিতভাবেই শাসকের যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত শাসন করত। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ এটাকে শাসকের দ্বীন নাম দিয়েছেন; অতএব বর্তমানে মুসলিমদের দেশগুলোতে মুসলিমদেরকে যা দ্বারা শাসন করা হয় সেটা একটি দ্বীন। কিন্তু আমরা এর নাম দিচ্ছি শাসকের দ্বীন।

---

[99] সুরা আলে-ইমরানঃ ৮৩

কেনইবা সেটা দ্বীন হবে না অথচ এটাই প্রতিটি বিষয়ে মানুষের জীবনকে বিন্যস্ত করে। আক্বীদাহ-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেঃ তারা আপনাকে বলে, বিশ্বাসের স্বাধীনতা। আইনের ক্ষেত্রেঃ তারা অপরাধ প্রণয়ন করে অতঃপর তারা এই সমস্ত অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি প্রণয়ন করে। সম্পদের মাস'আলার ক্ষেত্রেঃ তারা সম্পদের মাস'আলাকে বাস্তবায়িত সুদভিত্তিক খাতে বিন্যস্ত করেছে। ব্যক্তিগত অবস্থাদির ক্ষেত্রেঃ তারা জীবনযাত্রা বিন্যস্ত করেছে।

তাহলে এই পদ্ধতিতে জীবনযাত্রার এই বিন্যস্তকরণ–এটা হচ্ছে একটি দ্বীন। কিন্তু সেটা শাসকের দ্বীন আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর দ্বীন নয়।

সংবিধান সম্পর্কে এই তিনটি বাস্তবতা যেগুলো একজন মুসলিমের জানা উচিৎ। এগুলো জাহিলী বিধিবিধান, এই সমস্ত সংবিধান ইহুদীদের ও খ্রিষ্টানদের প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত এবং এই সংবিধান হল এমন ব্যক্তির দ্বীন যে এর দ্বারা শাসন করে সে এক বাতিল দ্বীন তথা শাসকের দ্বীন দ্বারা শাসন করল।

এই সংবিধানের হুকুমের ব্যাপারে আলেমগণের উক্তিসমূহঃ

প্রথম উক্তিঃ ইবনে কাসীর رَحِمَهُ اللهُ -এর। তিনি যখন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর এবাণীর ব্যাপারে আলোচনা করেছেনঃ

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾

"তবে কি তারা জাহিলিয়্যাতের বিধিবিধান কামনা করে?"[100] যখন আপনি এই আয়াতের তাফসীর দেখতে যাবেন তখন অবশ্যই পাবেন যে, ইবনে কাসীর رَحِمَهُ اللهُ একটি কিতাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যার নাম 'ইয়াসীক্ব'। এই কিতাবটি এক ব্যক্তি প্রণয়ন করেছিল যার নাম চেঙ্গিস খান। ইবনে তাইমিয়্যাহ এই কিতাবের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এটা ইহুদীদের শারীয়াহ থেকে, অন্যান্য ধর্ম থেকে, ইসলাম থেকে কিছু এবং চেঙ্গিস খানের প্রবৃত্তি ও তার মতামত থেকে প্রাপ্ত সংগৃহীত

[100] সুরা মায়িদাহঃ ৫০

একটি কিতাব। তার সন্তানরা এই ইয়াসীক্ব দ্বারা শাসন করত এবং এই ইয়াসীক্বকে আল্লাহর কিতাব ও তার রাসুলের সুন্নাহ’র উপর অগ্রবর্তী করত। এই কিতাবটি তাদের নিকট এক অনুসরণীয় আইন ছিল। এটা হল ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ الله -এর বক্তব্যের অর্থ।

যখন তিনি ইয়াসীক্বের সংজ্ঞা দিয়েছেন তখন তিনি কী বলেছেন? তিনি বলেছেন, ইহুদীদের থেকে, খ্রিষ্টানদের থেকে, অন্যান্য শারীয়াহ থেকে এবং চেঙ্গিস খানের প্রবৃত্তি ও তার মতামত থেকে প্রাপ্ত বিষয়; ইবনে কাসীর رَحِمَهُ الله -এর সংজ্ঞা অনুযায়ী বর্তমানে কার্যকর আইন হল সমসাময়িক ইয়াসীক্ব।

এখানে আলেমগণের উক্তিসমূহের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আলুশ-শাইখ رَحِمَهُمُ الله -এর উক্তি রয়েছে। আমি তার বক্তব্য পড়ব। এমনিভাবে আহমাদ শাকীরের বক্তব্য রয়েছে। ইনশা’আল্লাহ আমি তার বক্তব্যও পড়ব।

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আলুশ-শাইখ তার এক রিসালাহ ‘তাহকীমুল ক্বাওয়ানীন’-এ বলেন, “আদালতসমূহের তথ্যসূত্র এবং ভিত্তিশীল ও এর সবকিছুর প্রত্যাবর্তন আল্লাহর কিতাব ও তার রাসুলের সুন্নাহ’র নিকট - তিনি এর দ্বারা ইসলামী আদালত উদ্দেশ্য করেন- তেমনিভাবে এই সমস্ত আদালতের তথ্যসূত্র হল সেই আইন যা বিভিন্ন শারীয়াহ ও বহু আইন থেকে রচিত। যেমন ফরাসী আইন, আমেরিকান আইন এবং ব্রিটিশ আইন।” এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন কিভাবে মানুষ দলে দলে এই সকল বিচারালয়ে যাচ্ছে এবং কিভাবে তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত তাদের মাঝে বিচার-ফায়সালা করছে আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহ’র উপর নির্ভর না করে। অতঃপর তিনি বলেছেন, “এই কুফরের উপর আর কোন কুফর থাকতে পারে? এবং এই ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়ের পরে মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল–এ সাক্ষ্যদানকে ভঙ্গ করে এমন আর কোন বিষয় থাকতে পারে?”

“এই কুফরের উপর আর কোন কুফর থাকতে পারে?” অর্থাৎঃ সংবিধান। “এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল–এ সাক্ষ্যদানকে ভঙ্গ করে এমন আর কোন বিষয়

থাকতে পারে?” তাই যে ব্যক্তি অনুরূপ বিষয়ের উপর একমত হবে তার সাক্ষ্য নষ্ট হয়ে যাবে।

আহমাদ শাকির رَحِمَهُ الله -এর আরো একটি বক্তব্য রয়েছে। তিনি বলেন, “মানব রচিত আইনসমূহের ক্ষেত্রে বিষয়টি সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট। তা হচ্ছে সুস্পষ্ট কুফর। এতে কোন গোপনীয়তা এবং কোন তোষামোদ নেই।”

এব্যাপারে ইমাম শানক্বীতী رَحِمَهُ الله -এর একটি উক্তি রয়েছে। তিনি তার তাফসীরে বলেন, “আসমান ও যমীন সৃষ্টকারীর আইনের বিরোধী আইনী নিযামের শাসন হচ্ছে আসমান ও যমীন সৃষ্টকারীর সাথে কুফরি করা। যেমন এ দাবি করা যে, উত্তরাধিকারী সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে নারীর উপর পুরুষের অগ্রাধিকার দেওয়া ইনসাফ নয়।”

অতএব আমরা সংবিধানের বাস্তবতা সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াত, হাদিস এবং আলেমগণের উক্তির মাধ্যমে যা প্রমাণ করেছি সেগুলো হচ্ছে সংযুক্তি স্বরূপ। এগুলো ঐ সকল আলেমগণের উক্তি যারা কাছ থেকে এই সংবিধানের ব্যাপারে জেনেছেন। ইবনে কাসীরের উক্তির কারণ হল তিনি এমন এক ব্যক্তির সময় পেয়েছেন যে ঐ সময়ে আইন ও সংবিধান রচনা করেছিল। আর এই কারণে তিনি বক্তব্য দিয়েছেন।

সুতরাং এই আইন হল কুফর–ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্। যে ব্যক্তি এই আইনের প্রতি সন্তুষ্ট হবে সে মিল্লাহ থেকে বের হয়ে যাবে। আমরা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর নিকট পরিত্রাণ কামনা করি।

–একজন প্রশ্নকারী বললেন, আইন ও সংবিধানের ক্ষেত্রে কি এই আয়াত তাদের উপর প্রযোজ্য হবে?

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

“যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করে না তারা কাফির।”[101]

শাইখ বলেন, আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যদি আমাদের জন্য কাজ সহজ করে দেন এবং হায়াত দীর্ঘ করেন তাহলে অবশ্যই আমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে সামনে এই আয়াতের ব্যাপারে আলোচনা করব। তবে এই আয়াত “যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করে না তারা কাফির।” এর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ে এখন কিছু অতিরিক্ত কথা বলছিঃ

ইবনে আব্বাস رَضِيَاللهُعَنْهُمَا -এর উক্তি ‘কুফর হল ছোট কুফর’। তার যামানায় কিছু মানুষ ঐ সকল খলিফাহ’দেরকে তাকফীর করেছিল যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন করত। তারা ছিল বনু উমাইয়াহ’র খলিফাহ; কারণ ঐ ব্যক্তিরা দেখল তাদের মাঝে কিছু শারীয়াহ বিরোধী কর্ম রয়েছে। এই শারীয়াহ বিরোধী কর্মের উপর ভিত্তিকরে কিছু লোক তাদেরকে তাকফীর করেছিল। অতএব এরা ছিল গুলাত তথা সীমালঙ্ঘনকারী। ইবনে আব্বাস رَضِيَاللهُعَنْهُمَا হলেন ‘হাবরুল উম্মাহ’ তথা উম্মাহ’র পণ্ডিত। তিনি জানেন যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা শাসনকারী খলিফাহ’গণের উপর এই সমস্ত অভিযুক্তকরণ তাদেরকে রিদ্দাহ’র স্তরে অন্তর্ভুক্ত করবে না এবং তাদেরকে মিল্লাহ থেকেও বের করবে না; এজন্য তিনি বলেছেন, “এটা এমন কুফর নয় যার দিকে তোমরা মত দিচ্ছ। এই কুফর হল ছোট কুফর।” অর্থাৎ যে সকল কাজ তারা সম্পাদন করছে সেগুলো অবাধ্যতার স্তরে অন্তর্ভুক্ত হবে কুফরির স্তরে অন্তর্ভুক্ত হবে না। তাহলে এই কথা কার ব্যাপারে বলা হয়েছিল? এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন করে, আমীরুল মু’মিনীন বিশেষণের অধীনে কাজ করে এবং যাকে খলিফাহ’র সিফাত দেওয়া হয়। এই উক্তি ইয়াদ আল্লাভী, মুরসী এবং এদের মত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে?!

আপনি এই লোকদের মাঝে এবং এই উক্তি যার ব্যাপারে বলা হয়েছিল—তার মাঝে একটি তুলনা করুন। তুলনার কোনো দিক খুঁজে পাওয়া যাবে না। যখন মানুষ

[101] সুরা মায়িদাহঃ ৪৪

ঐ ব্যক্তিদের কাজকর্মে কুফরি তালাশ করত। আর আমরা তালাশ করি এই লোকদের কাজকর্মে ঈমান কোথায়! অর্থাৎ চাহিদা অনুযায়ী কুফরি বিষয়গুলো তালাশ করা হয় না। তবে আপনি বলুন, সে ইসলামের নিকটবর্তী হয়েছে কোথায়? তাহলে - যে ক্ষেত্রে এই কথাটি সঠিক হবে - কিভাবে আমরা এমন এক কথা প্রয়োগ করব যা বলা হয়েছিল মু'মিনদের আমীর খলিফাহ'র ব্যাপারে যিনি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন করতেন আমরা কি তা এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করব যারা জাহিলী বিধিবিধান দ্বারা শাসন করে, ইহুদীদের ও খ্রিষ্টানদের প্রবৃত্তি দ্বারা এবং এক বাতিল দ্বীন শাসকের দ্বীন দ্বারা শাসন করে! কিভাবে আমরা এই উক্তি এই সমস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করব!

ইনশা'আল্লাহ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যদি সহজ করে দেন তাহলে অবশ্যই আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব। আল্লাহ আপনাদের উত্তম জাযা দান করুন!

আনুগত্যের শিরক সংক্রান্ত
উৎকর্ষ বিবরণ

শাইখ আবু আলী আল-আনবারী
আল-কুরাইশী رحمه الله

সপ্তম দারসঃ

সংবিধান বাস্তবায়নকারীদের বাস্তবতা কী এবং তাদের ব্যাপারে শারীয়াহ’র হুকুম কী?

الحَمدُ للّهِ والصّلاةُ والسّلامُ على رسُولِ اللّهِ؛

হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে হক্বকে হক্ব হিসেবে দেখান এবং হক্ব অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করুন, বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখান এবং বাতিল বর্জন করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদের এমন বিষয় শিক্ষা দিন যা আমাদের উপকার করবে এবং আপনি আমাদের যা শিক্ষা দেন এর মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে আমাদের ইলম অনুযায়ী আমলকারী বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন আমাদের ইলমকে আমাদের জন্য দলিল বানিয়ে দিন এবং আমাদের বিরুদ্ধে দলিল বানাবেন না - - ইয়া আরহামার-রহিমীন! হে আমার রব! আপনি আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিন, আমার বিষয়াদি সহজ করে দিন এবং আমাদের মুখের জড়তা দূর করে দিন যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে। হে আল্লাহ আপনি আমার কর্মকে সৎ বানিয়ে দিন, আপনার সন্তুষ্টির জন্য খালিছ করে দিন এবং আপনার সৃষ্টির কারো জন্য এতে কোন অংশ রাখবেন না।

অতঃপর,

আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রথম অংশ শেষ করেছি। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে তখন আমরা আনুগত্যের শিরক সম্পর্কে মৌলিক পরিচয় প্রদানসহ আলোচনা করেছি। এরপর আলোচনা ছিল সংবিধান প্রণয়ন কমিটি সম্পর্কে। আমরা এই কমিটির কিছু বাস্তবতা আলোকপাত করেছিঃ তারা হল সমকক্ষ, তারা রব, তারা শরীক বা অংশীদার, তারা পশ্চাতে নিক্ষেপকারী এবং তারা শয়তানের বন্ধু। অতঃপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে আলোচনা ছিল সংবিধান সম্পর্কে। আমরা বলেছি, এগুলো জাহিলী বিধান এবং এগুলো ইহুদীদের ও খ্রিষ্টানদের প্রবৃত্তি থেকে সংগৃহীত। আমরা বলেছি যে, এই সমস্ত সংবিধান হচ্ছে একটি দ্বীন। এটা ছিল আলোচ্য বিষয়ের তৃতীয় অংশ। আলোচ্য বিষয়বস্তুর আরো

একটি পার্ট হবেঃ

সংবিধান বাস্তবায়নকারী সম্পর্কে।

এই সংবিধানের মাধ্যমে কারা বিচার-ফায়সালা বা শাসন করে? এদের বাস্তবতা কী? আর তাদের ব্যাপারে শারীয়াহ'র হুকুম কী?

আমি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাহায্যে বলছিঃ আইন ও সংবিধান বাস্তবায়নকারী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ সরকার ব্যবস্থা যে তার সমস্ত অবকাঠামো দিয়ে এই সকল আইনের মাধ্যমে শাসন করে। আর আপনি জানেন যে, এই সকল সরকার ব্যবস্থার তিনটি অবকাঠামো রয়েছেঃ নির্বাহী কর্তৃপক্ষ, আইন-সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষ এবং বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। এগুলো হল এই সকল সরকার ব্যবস্থার তিনটি কর্তৃপক্ষ।

আইন-সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষ দ্বারা উদ্দেশ্যঃ তারা হচ্ছে পার্লামেন্ট বা সংসদ সদস্য। এই লোকদের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে তারা তাদের শাসন কালে অথবা তাদের আইনী অধিবেশনের মধ্যে দিয়ে নতুন বিষয়াদির জন্য আইন প্রণয়ন করে। আর এটা ইরাকে চার বছর ধরে হচ্ছে, তুরস্কে সাত বছর ধরে, আলজেরিয়ায় পাঁচ বছর ধরে আর অধিকাংশ দেশে চার বছর ধরে হচ্ছে। তাহলে সরকার ব্যবস্থা আইন-সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষ থেকে গঠিত হয়। তারা হল সংসদ সদস্য।

নির্বাহী কর্তৃপক্ষঃ মন্ত্রীপরিষদ, তাদের কার্যনির্বাহী পরিষদ, আমলা গভর্নর এবং এই অবকাঠামোর প্রত্যেকেই নির্বাহী কর্তৃপক্ষের অন্তর্ভুক্ত। প্রধানমন্ত্রী, প্রজাতন্ত্রের প্রধান...এদের সকলকেই নির্বাহী কর্তৃপক্ষের মধ্যে গণ্য করা হয়।

আমাদের নিকট তৃতীয় কর্তৃপক্ষ হল বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলঃ বিচার কর্তৃপক্ষ, বিচারকার্যে সাহায্যকারী ওকালতি এবং এছাড়া অন্যান্য বিষয়। অতএব সরকার ব্যবস্থার অবকাঠামো এই তিনটি কর্তৃপক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই আমাদের আলোচনা হবে এই রূপের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে।

এই সরকার ব্যবস্থার শারয়ী নামঃ এই সরকার ব্যবস্থাকে **তাগুতী সরকার**

ব্যবস্থা নামে অভিহিত করা হয়।

কিভাবে আপনি প্রমাণ করবেন, যে সরকার ব্যবস্থা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালা বা শাসন করে না সেটা তাগুতী সরকার ব্যবস্থা?

ভাষাগত দিক থেকেঃ যখন আপনি অভিধানগুলো অধ্যয়ন করবেন তখন দেখতে পাবেন যে, 'তাগুত' বিশেষণটি "**طغى**" ফে'য়েল তথা ক্রিয়া থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আর "**طغى**" এর অর্থঃ সীমা অতিক্রম করা। যেকোনো বস্তু হোক সেটা মানুষ অথবা প্রাণী অথবা আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** -এর মাখলুকসমূহের কোন মাখলুক তা সমান। যখন সে তার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করবে তখন তাকে তাগুত নামে আখ্যায়িত করা হবে।

আল্লাহ **تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ** -এর কিতাব থেকে এর দলিলঃ আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** -এর বাণীঃ

﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ﴾

"পানি যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করালাম।"[102] অতএব এখানে পানি হচ্ছে তাগুত। পানি কিভাবে তাগুত হয়েছে? কারণ সে ঐ পরিধি অতিক্রম করেছে আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** তার জন্য যেটা নির্ধারণ করেছিলেন। ফুরাত নদীর, দাজলা নদীর নির্ধারিত একটি স্তর আছে। কিন্তু যখন সে এই সীমা অতিক্রম করবে তখন এটাকে সীমালঙ্ঘন হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। অতএব পানি তাগুত হয়েছিল। এটা হল ভাষাগত দিক থেকে।

আমরা যখন ভাষাগত দিক থেকে এই সকল সরকার ব্যবস্থার নিকট আসব তখন আমরা দেখতে পাব যে, তারা আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** -এর বিধিবিধান অতিক্রম করেছে এবং তারা বিকল্প বিধিবিধান নিয়ে এসেছে। অতএব ভাষাগত দিক থেকে অর্থটি এই সকল সরকার ব্যবস্থার মধ্যে বাস্তবায়িত আছে। তারা আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** -এর বিধিবিধান অতিক্রম করে আইন ও সংবিধানসমূহের দিকে গিয়েছে। এটা হল

---

102 সুরা হাক্কাহঃ **১১**

ভাষাগত দিক থেকে।

আর শারয়ী দিকে থেকেঃ ইবনুল ক্বাইয়্যিম رَحِمَهُ الله তাগুতের সংজ্ঞায় বলেন, "তাগুত হল, বান্দার ঐ সকল সীমালঙ্ঘন, যা সে মা'বুদ (যার ইবাদাত করা হয়) অথবা অনুসরণীয় ব্যক্তি অথবা আনুগত্যের অধিকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে করে থাকে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের তাগুত হচ্ছে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তার রাসুলকে বাদ দিয়ে যার কাছে বিচার-ফায়সালা চাওয়া হয়।"[103]

ইবনু আবী হাতিম رَحِمَهُ الله মুজাহিদ رَحِمَهُ الله -এর উক্তি নকল করেছেন। তিনি বলেন, "তাগুত হল মানুষের আকৃতিতে শয়তান। তারা যার নিকট বিচার চায় এবং সে তাদের বিষয়ে কর্তৃত্বশীল।" এটা মুজাহিদের মত।

আর ইমাম মালিক ইবনে আনাস رَحِمَهُ الله থেকে যেমন ইমাম কুরতুবী رَحِمَهُ الله নকল করেছেন। তিনি বলেছেন, "তাগুত হল শয়তান, যাদুকর, গণক।" এদের প্রত্যেককেই তাগুত হিসেবে গণ্য করা হয়। তাহলে তাগুত কখনো মানুষ হয় এবং কখনো মানুষ ব্যতীত অন্য কিছু হয়। যখনই সে তার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করবে তখন শারয়ী নাম হবে এবং ভাষাগত দিক থেকেও নাম হবেঃ তাগুত। এগুলো আলেমগণের বক্তব্য।

কিন্তু আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাব থেকে এব্যাপারে দলিল কোথায় যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত যে শাসন করে তাকে তাগুত নামে আখ্যায়িত করা হবে?

সুরা নিসার ৬০ নং আয়াতে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَ قَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَ يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿۶۰﴾

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, তারা ঈমান এনেছে আপনার উপর যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে এর প্রতি,

[103] ই'লামুল মুআক্কিয়ীনঃ ১/৫০

আর তারা তাগুতের কাছে বিচার চাওয়ার ইচ্ছা করে। অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন তা অস্বীকার করে। আর শয়তান তাদেরকে ঘোরতর পথভ্রষ্ট করতে চায়।”

কিভাবে আপনি এই আয়াতের মাধ্যমে এ দলিল পেশ করবেন যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত যে ব্যক্তি বিচার-ফায়সালা বা শাসন করে তাকে তাগুত নামে আখ্যায়িত করা হবে?

প্রথমে আবশ্যক হচ্ছে এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ বর্ণনা করা। ইবনুল আরাবী رَحِمَهُ اللهُ তার তাফসীরে ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর যামানায় এক মুনাফিক্ব এবং এক ইহুদীর মাঝে ঝগড়া হয়েছিল। তারা দু’জনেই বিচার চাওয়ার ইচ্ছা করল। ফলে ইহুদী আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর নিকট বিচার চাওয়ার ইচ্ছা করল। আর মুনাফিক্ব কা’ব ইবনে আশরাফের নিকট বিচার চাওয়ার ইচ্ছা করল। অতঃপর আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى নাযিল করলেন, “আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, তারা ঈমান এনেছে আপনার উপর যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে এর প্রতি, আর তারা তাগুতের কাছে বিচার চাওয়ার ইচ্ছা করে।” এটা ইবনুল আরাবী رَحِمَهُ اللهُ -এর বর্ণনা।

নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে ওয়াহিদী رَحِمَهُ اللهُ -এর বর্ণনা হলঃ তিনি একই ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ভিন্নতা ছিল নামের ক্ষেত্রে। তিনি বলেছেন, ইহুদী আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর নিকট বিচার চাওয়ার ইচ্ছা করল আর মুনাফিক্ব আবু বুরদাহ আল-আসলামীর নিকট বিচার চাওয়ার ইচ্ছা করল।

তাহলে এক বর্ণনায় আছে মুনাফিক্ব কা’ব ইবনে আশরাফের নিকট বিচার চাওয়ার ইচ্ছা করেছিল এবং অন্য আরেক বর্ণনায় আছে সে আবু বুরদাহ আল-আসলামীর নিকট বিচার চাওয়ার ইচ্ছা করেছিল। এই ব্যক্তি হোক অথবা ঐ ব্যক্তি হোক তা সমান—এই বিষয়টি আমাদের সাথে বেশি সংশ্লিষ্ট না।

ইস্তিদলাল কোথায়?

আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণীতে রয়েছেঃ “আর তারা তাগুতের কাছে বিচার চাওয়ার ইচ্ছা করে।” আপনি জানেন যে, বিচার শুধুমাত্র এমন ব্যক্তির নিকট চাওয়া হয় যে বিচার-ফায়সালা করে; কারণ যে ব্যক্তি বিচার-ফায়সালা করে না তার নিকট মানুষ বিচার চায় না। আর এজন্যই মুনাফিক্ব কা'ব ইবনে আশরাফ অথবা আবু বুরদাহ অথবা এই দুই নামের কোন একজনকে নির্বাচন করেছিল। সে মামলা-মুকদ্দমা ও সমস্যা তার নিকট হস্তান্তর করতে চেয়েছিল। তাহলে নিশ্চিতভাবেই এই ব্যক্তি বিচার-ফায়সালা করত। এজন্য মুনাফিক্ব তার নিকট বিচার চাওয়ার ইচ্ছা করেছিল।

আয়াত থেকে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত উদ্ধৃতির স্থান কোথায়? আমরা জানি যে, মুনাফিক্ব যার নিকট বিচার চাওয়ার ইচ্ছা করেছিল হোক সে কা'ব ইবনে আশরাফ অথবা আবু বুরদাহ আল-আসলামী—তা সমান। কেন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদের নাম উল্লেখ করেননি? কেন তিনি বলেননি, “আপনি ঐ ব্যক্তিদের দেখেননি যারা দাবি করে আপনার নিকট এবং আপনার পূর্ববর্তীদের নিকট যা নাযিল করা হয়েছে—এর প্রতি তারা ঈমান আনে অথচ তারা কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট বিচার চাওয়ার ইচ্ছা করে।” যেমন তিনি বলেছেন,

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾

“ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত।”[104] তাহলে এখানে নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কেন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ঐ ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করেননি যার নিকট তারা বিচার চাওয়ার ইচ্ছা করেছিল? তিনি অন্য আরেকটি নাম নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেছেন, “আর তারা তাগুতের কাছে বিচার চাওয়ার ইচ্ছা করে।”

কারণ কা'ব ইবনে আশরাফ যে দ্বীনের উপর ছিল—তা দিয়ে সে বিচার-ফায়সালা করত। সে ছিল ইহুদী। আর আবু বুরদাহ আল-আসলামী আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত বিচার-ফায়সালা করত। অতএব এই ব্যক্তিরা আল্লাহ

[104] সুরা মাসাদঃ ০১

عَزَّوَجَلَّ -এর নাযিলকৃত বিধান বাদ দিয়ে বিচার-ফায়সালা করত যখন তাদের নিকট বিচার চাওয়া হত। সুতরাং তাদের শারয়ী নাম হচ্ছে তারা তাগুত। আপনি যেমন জানেন, যেহেতু আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ এই বরকতময় দ্বীনকে সর্বশেষ দ্বীন করেছেন তাই তিনি এমন বিধিবিধান দিয়েছেন যেগুলো প্রত্যেক সময় ও প্রতিটি স্থানের জন্য উপযুক্ত। যদি তিনি বলতেন, "তারা কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট বিচার চাওয়ার ইচ্ছা করে।" তাহলে আয়াতটি এই নামের সাথে খাছ হয়ে যেত। এরপর কা'ব ইবন আশরাফের সাথে অন্য আরেক নাম আমাদের যুক্ত করা জায়েয হত না। কিন্তু তিনি এমন এক নাম নিয়ে এসেছেন যেটা কা'ব ইবনে আশরাফের জন্য উপযুক্ত এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত কা'ব ইবনে আশরাফের মত ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত; তাই প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত বিচার-ফায়সালা বা শাসন করে আমাদের রবের কিতাবে তাকে তাগুত নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অতএব এটা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর এবাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করার স্থানঃ "আর তারা তাগুতের কাছে বিচার চাওয়ার ইচ্ছা করে।"

একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করছিঃ আমরা যখন নিশ্চিত হলাম যে, আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ঐ ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করেননি যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত বিচার-ফায়সালা করে এবং তিনি কেবল এমন একটি নাম "তাগুত" উল্লেখ করেছেন যেটা প্রত্যেক সময়ের জন্য এবং প্রতিটি স্থানের জন্য উপযুক্ত। আপনি ভুলে যাবেন না যে, এটা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর নির্বাচন। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এই নাম কুরআনে ওহী করে নির্বাচন করেছেন। তাই প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে কা'ব ইবনে আশরাফের মত অথবা আবু বুরদাহ আল-আসলামীর মত হবে তাকে তাগুত নামে আখ্যায়িত করা হবে; আর যে ব্যক্তি তাদেরকে এই নাম ব্যতীত অন্য নামে আখ্যায়িত করবে সে কুরআনে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর নামকরণের বিপরীত করল।

সুতরাং যদি তিনি বলতেন যেমন বর্তমান যুগের মুরজিয়ারা বলে—ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্ - আমরা পরিচয়ের স্বার্থে এই লোকদেরকে মুরজিয়া বলে অভিহিত করব। তবে তারা কারামিয়্যাহ'দের থেকেও নিকৃষ্ট যারা আব্বাসী সম্রাজ্যের সময় ছিল - মুরজিয়ারা এই সকল শাসকদের ব্যাপারে বলে যারা আল্লাহর নাযিলকৃত

বিধান ব্যতীত বিচার-ফায়সালা বা শাসন করে তাদেরকে তারা উমারা নামে আখ্যায়িত করে। আর এই উমারাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব। এই ব্যক্তিদের সকলেই কোন পার্থক্য ছাড়াই কেউ আছে ইহুদীদের সাথে, কেউ আছে খ্রিষ্টানদের সাথে, কেউ আল্লাহর দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে এবং কেউ যা করার করেছে... যে অবস্থাতেই সে করেছে মুরজিয়ারা তাদের নষ্ট আক্বীদাহ'র উপর ভিত্তিকরে করে বলে, সেই আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব। কারণ মুরজিয়াদের আক্বীদাহ হলঃ যে ব্যক্তি তার জীবনে একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হবে না তবে যখন সে ইসলাম ভঙ্গের কোন বিষয় সম্পাদন করবে। তারা ইসলাম ভঙ্গের বিষয় সম্পাদন করার ক্ষেত্রে অন্তরে হালাল মনে করা অতঃপর মুখে ঘোষণা করা শর্তারোপ করে। ফলে মুরজিয়াদের নিকট তাকফীর করার কয়েকটি ধাপ রয়েছেঃ মানুষ ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়ে পতিত হওয়া এরপর এই ভঙ্গকারী বিষয়কে তার অন্তরে হালাল মনে করা অতঃপর তার মুখে ঘোষণা করাঃ "হে লোকসকল! আমি এই কুফরে পতিত হয়েছি এবং আমি এই কুফরকে হালাল মনে করি।" মুরজিয়ারা বলে, তখন আমরা এই ব্যক্তির উপর কুফরের হুকুম দিব! এই তিনটি ধাপ ব্যতীত কোন মানুষের উপর কুফরের হুকুম হবে না যে, সে মিল্লাহ থেকে বের হয়ে যাবে সে যাই করুক না কেন। সুতরাং এই নষ্ট আক্বীদাহ'র উপর ভিত্তিকরে তারা এই সকল শাসকদেরকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করে। যেহেতু মুসলিমরা মুসলিমদেরকেই শাসন করছে তাই মুরজিয়ারা বলে, এরা হচ্ছে উমারা, তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব। অতএব এই সকল শাসকদের ক্ষেত্রে মুরজিয়াদের এই বৈশিষ্ট্য দেওয়াটা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর কিতাবে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর বাণীর বিরোধিতা করে। কারণ তিনি তাদেরকে তাগুত নামে আখ্যায়িত করেছেন—ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্। আর তাগুত কোনো দিন মুসলিমদের আমীর বা শাসক হবে—এটা সম্ভব নয়। এটা হল প্রথম মাস'আলা।

দ্বিতীয় মাস'আলাঃ আমরা আমাদের রবের কিতাবের ভিত্তিতে বলেছি যে, এই সকল শাসকরা - হে ভাইগণ! কোন পার্থক্য করা ছাড়াই - এদের প্রত্যেকের শারয়ী নাম হচ্ছে "তাগুত"। যখন আপনি আপনার জবানকে এবং আপনার শ্রবণশক্তিকে

এই শব্দের উপর অভ্যস্ত করেননি আর আপনার ভিতরে কোন একটা বিষয় আছে তখন আবশ্যক হল আপনি শারয়ী পরিভাষাগুলো ব্যবহার করবেন। যাতে আপনি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সীমাসমূহের নিকট অবস্থানকারী হতে পারেন। কারণ আমি যখন এই সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে বলব, এটা হল তাগুতী সরকার ব্যবস্থা তখন আমার মধ্যে এই সকল লোকদের প্রতি ভালবাসা বা আন্তরিকতার কোন অংশ অবশিষ্ট থাকা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় মাস'আলাঃ আমরা যখন বলেছি, এই ব্যক্তিরা হচ্ছে তাগুত তখন আমরা যে তাদেরকে তাগুত নামে আখ্যায়িত করছি–এব্যাপারে কি তাদের উপর হুজ্জাহ বা প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন হবে? যেমনটি মুরজিয়াদের স্বভাব।

আমি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাহায্যে বলছি, যে সকল শাসকরা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত বিচার-ফায়সালা বা শাসন করে এবং যাদের শারয়ী নাম হচ্ছে তাগুত তারা দুই ভাগে বিভক্তঃ

হয়তো তারা আসলী কাফির হবেঃ যেমন যে সকল শাসকরা পশ্চিমা দেশগুলো শাসন করছে। এরা আসলী কাফির তাগুত।

অথবা তারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর দ্বীন থেকে মুরতাদ তাগুত হবেঃ যেমন ঐ সকল শাসক যারা মুসলিমদের দেশগুলো শাসন করছে। যখন আমরা তাদেরকে নামকরণ করতে চাইব যেমন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদের নামকরণ করেছেন তখন কি তাদের ক্ষেত্রে এই নাম ব্যবহার করার পূর্বে তাদের উপর আমাদের হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করা শর্ত হবে?

প্রথমতঃ তাদের উপর আমাদের হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন নেই - এখন আমার আলোচনা মুরতাদ তাগুত সম্পর্কে - আমরা যে তাদেরকে তাগুত নামে আখ্যায়িত করি–এব্যাপারে তাদের উপর আমাদের হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন নেই। এর দলিল কী?

আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى তার কিতাবের যথাযথ স্থানে আল্লাহর নাবী মুসা সম্পর্কে

বলেছেন,

﴿اِذۡهَبۡ اِلٰی فِرۡعَوۡنَ اِنَّهٗ طَغٰی﴾

“ফিরআউনের কাছে যান, নিশ্চয়ই সে সীমালজ্ঘন করেছে।”[105] আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর পক্ষ থেকে এই আদেশ আল্লাহর নাবী মুসার নিকট মাদায়েন থেকে তার ফিরে আসার মূহুর্তে পৌঁছেছে। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ সিনাই অঞ্চলে তার নিকট এই আয়াত ওহী করেছেনঃ “ফিরআউনের কাছে যান, নিশ্চয়ই সে সীমালজ্ঘন করেছে।” তাহলে তিনি তখন ছিলেন সিনাইয়ে আর ফিরআউন ছিল মিসরে। অতএব তিনি এখন পর্যন্ত তার নিকট পৌঁছাননি। মুসা عَلَيۡهِالسَّلَام এখন পর্যন্ত মিসরে পৌঁছাননি, মিসরে প্রবেশ করেননি এবং ফিরআউনের নিকট পৌঁছাননি। এসত্ত্বেও আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাকে তাগুত নামে আখ্যায়িত করেছেনঃ “ফিরআউনের কাছে যান, নিশ্চয়ই সে সীমালজ্ঘন করেছে।” অর্থাৎ সে সীমা অতিক্রম করেছে। যেহেতু সে সীমালজ্ঘন করেছে আর "طغى" এটা একটি ফে’য়েল। এর ইসম হলঃ তাগুত। অতএব ফিরআউন হল তাগুত। আল্লাহর নাবী মুসা ফিরআউনের নিকট যাওয়ার পূর্বে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى মিসরের ফিরআউনকে তাগুত নামে আখ্যায়িত করেছেন; কারণ এই আদেশটি ছিল সিনাইয়ে যেমন আমি আপনার নিকট উল্লেখ করেছিলাম। মিসরের ফিরআউন মিসরে ছিল। মুসা عَلَيۡهِالسَّلَام এখন পর্যন্ত তার নিকট এসে পৌঁছাননি। আর ফিরআউনের উপর এখন পর্যন্ত হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। এসত্ত্বেও আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাকে তাগুত নামে আখ্যায়িত করেছেন।

সুতরাং এটা যখন আসলী কাফিরের ক্ষেত্রে যে, আপনি তাকে তাগুত নামে আখ্যায়িত করবেন—এব্যাপারে হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হয় না তখন আপনি মুরতাদের ব্যাপারে কী বলবেন, যে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়ে তাগুতে পরিণত হয়েছে?

অতএব এটা আরো অধিক অগ্রগণ্য যে, তার উপর হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করা হবে

[105] সুরা নাযিআতঃ ১৭

না; কারণ রাসুল ﷺ যখন কাফিরদের দেশে হামলা করতেন তখন তিনি অপেক্ষা করতেন - যখন তিনি রাতে বের হতেন - তিনি প্রভাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। অতঃপর যখন তিনি আযান শুনতেন তখন ফিরে আসতেন। আর যখন তিনি আযান শুনতেন না তখন তাদের উপর হামলা করতেন। কারণ আযান হল মুসলিমদের আলামতসমূহের একটি আলামত। তাহলে আযান পাওয়া না গেলে তাদের উপর আক্রমণ করা হবে। কেন? কারণ আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর রিসালাতের মাধ্যমে তাদের উপর হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অতএব এই সকল ব্যক্তিদের তাগুত নামকরণের ক্ষেত্রে - খোদ তাদের মধ্য থেকে মুরতাদদের ক্ষেত্রে - কোন হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন নেই। এটা হল প্রথম দলিল।

আরেকটি দলিলঃ এই সকল ব্যক্তিরা দ্বীনের কোন বিষয়ে অজ্ঞ যে কারণে আমরা তাদের উপর হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করব? তারা কি এ বিষয়ে অজ্ঞ যে, আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ একটি কিতাব নাযিল করেছেন যার নাম কুরআন?! তারা কি এ বিষয়ে অজ্ঞ যে, আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ একজন রাসুল প্রেরণ করেছিলেন যার নাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ? নিশ্চিতভাবেই এই সকল শাসকদের কেউ এর কোন বিষয়ে অজ্ঞ নয়; বিপরীতে তাদের কেউ যখন টিভি-চ্যানেলে কিছু সময় গর্ব করতে চায় তখন আপনি তাকে দেখতে পাবেন, সে বসে শুরুতে কুরআন পাঠ করে। তাহলে সে বিশ্বাস করে অথবা জানে যে, আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এই কিতাব নাযিল করেছেন। যে ইরাক শাসন করেছিল আমরা তাকে দেখতাম সে কিভাবে কুরআন পড়ত, আমরা গাদ্দাফীকে দেখেছি সে কিভাবে কুরআন তিলাওয়াত করত, আমরা অমুককে দেখেছি কিভাবে সে কুরআন পড়ত, আমরা দেখেছি আমেরিকার গোলাম কিভাবে কুরআন পড়ত এবং ইংরেজদের গোলাম কিভাবে কুরআন পড়ত। বরং মুয়াম্মার আল-গাদ্দাফী আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাবের মুজতাহিদদের একজন ছিল। সে বলত, "সুরা ইখলাছ শুরু হয়েছেঃ আল্লাহ এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি জন্ম দেননি এবং জন্ম গ্রহণ করেননি।" কিভাবে? সে বলেছে, "কারণ "قل" তথা 'আপনি বলুন' কালিমা–এটি মুহাম্মাদ ﷺ -এর প্রতি জিবরীলের উক্তি। এটা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর উক্তি নয়!" তাহলে লোকটি শুধু এমন ছিল না যে, সে জানত একটি কিতাব আছে যার নাম

কুরআন। বরং সে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাবের ব্যাপারে ইজতিহাদ করত। অতএব তারা এই বিষয়ে জানত।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ রাসুল ﷺ তার জীবদ্দশায় এই সমস্ত বিধিবিধান দ্বারা শাসন করেছেন। অতঃপর তার পরে খুলাফায়ে রাশিদীনরা এই বিধিবিধান গ্রহণ করেছেন এরপর তাদের পরে যে সমস্ত খলিফাগণ এসেছেন তারা এই বিধিবিধান গ্রহণ করেছেন—এই সকল শাসকরা কি এই বিষয়ে অজ্ঞ? এই ঐতিহাসিক বিষয়টি কি এই ব্যক্তিদের নিকট গোপন আছে? অথচ বিষয়টি চৌদ্দশত বছর ধরে বিস্তৃত হয়ে এসেছে। অর্থাৎ বিষয়টি একদিন বা দুই দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যে আমরা বলব, বিষয়টি অমুকের কাছে অস্পষ্ট হয়ে আছে এবং দ্বিতীয়ত তাকে বিষয়টি জানানো হয়নি!! না, বরং বিষয়টি চৌদ্দশত বছরের। এই সকল খলিফাগণের প্রত্যেকেই এই সমস্ত বিধিবিধান দ্বারা শাসন করেছেন যেগুলো আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাবে এবং তার রাসুল ﷺ -এর সুন্নাহ'তে রয়েছে। এই সকল ব্যক্তিরা খোদ এই বিষয়টির ব্যাপারেও অজ্ঞ নয়।

এই ব্যক্তিরা কি এ বিষয়ে অজ্ঞ যে, ইসলামী খিলাফাহ'র প্রধান নগরী আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর শহর ইয়াসরিবে ছিল এরপর কুফাতে, এরপর দামেস্কে, এরপর বাগদাদে, এরপর কর্ডোবাতে। এই বিষয়গুলো কি এই সকল ব্যক্তিদের নিকট অস্পষ্ট রয়েছে? নিশ্চিতভাবেই তারা জানে যে, ঐ সমস্ত প্রধান নগরীতে থেকে যে সকল খলিফাগণ শাসন করেছিলেন তারা এই কিতাব তথা কুরআন এবং আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর সুন্নাহ দ্বারা শাসন করেছিলেন।

এই সকল ব্যক্তিদের নিকট কি দ্বীনের প্রকাশ্য বিষয় বা মাস'আলাগুলো অস্পষ্ট যেগুলো মুসলিমদের ছোটদের নিকট এবং মুসলিমদের শিশুদের নিকট অস্পষ্ট নয়? মুসলিমদের মধ্যে কে জানে না যে, মদ হারাম? মুসলিমদের মধ্যে কে জানে না যে, যিনা করা হারাম? মুসলিমদের কে জানে না যে, সুদ হারাম? এই প্রকাশ্য বিষয়গুলো কি এই সকল ব্যক্তিদের নিকট গোপন রয়েছে অথচ তাদের শাসন বা সরকার ব্যবস্থা মদ, যিনা এবং সুদের উপর প্রতিষ্ঠিত? এই সকল ব্যক্তিরা কি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর বিধিবিধানের ব্যাপারে অজ্ঞ?

আর মুরসী আল্লাহর কিতাবের একজন হাফিজ ছিল। যখন সে বিশ্বব্যাংক থেকে সাড়ে চার বিলিয়ন ঋণ চেয়েছিল যার পুরোটাই হল সুদ ভিত্তিক। আমি কি তার উপরেও হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করব অথচ সে আল্লাহর কিতাবের একজন হাফিজ? এমনিভাবে বাকিদের অবস্থা একই। এই সকল ব্যক্তিদের নিকট কি এটা অস্পষ্ট যে, সেই কিতাবে কতিপয় হদমূলক বিধিবিধান রয়েছে যেগুলো আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ প্রণয়ন করেছেন? তারা কি জানে না যে, কোন ব্যক্তি যিনা করলে যখন তার মাঝে যিনার শর্তগুলো প্রমাণিত হবে যদি সে বিবাহিত হয় তাহলে তাকে রজম তথা পাথর মেরে হত্যা করা হবে। আর যদি সে অবিবাহিত হয় তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে? তারা কি এব্যাপারে অজ্ঞ যে, চোরের মাঝে যখন চুরির সকল শর্ত প্রমাণিত হবে তখন তার হাত কাটা হবে? এই সকল ব্যক্তিরা কি এই সমস্ত বিধিবিধান জানে না? এমনকি এরপরেও একজন মুরজিয়া এসে বলে, আমরা তার উপর হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করার পরই কেবল তাকে তাগুত নামে আখ্যায়িত করতে পারব–এটা মুরজিয়াদের বক্তব্য। সঠিক বক্তব্য হলঃ আসলী কাফিরের ক্ষেত্রে কোন প্রকার হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হয় না। আর আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর দ্বীন থেকে মুরতাদদের ক্ষেত্রে তো আরো অধিক অগ্রগণ্য যে, তার উপর হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হবে না। বরং তারা হচ্ছে তাগুত। এটা হল আরেকটি দলিল।

তৃতীয় দলিলঃ হে ভাইগণ! এই সকল ব্যক্তিরা কেবল ইসলামই জানে না। উপরন্তু তারা ইসলামের শাখাগত বিষয়ও জানে। এজন্য আপনি তাদেরকে দেখবেন, তারা সূফী মতবাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখে। আপনি তাদেরকে দেখবেন, তারা হিযবুল ইরাকীর সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখে। আপনি তাদেরকে দেখবেন, তারা মুরজিয়াদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখে। আর যখন বিষয়টি আহলুস সুন্নাহ’র নিকট এসে পৌঁছায় তখন তারা আহলুস সুন্নাহ’র মধ্যে বসে থাকা ব্যক্তির মাঝে এবং মুজাহিদের মাঝে পার্থক্য করতে পারে; আপনি যে তাকে তাগুত নামে আখ্যায়িত করবেন–এরপরেও কি তার উপর আপনার হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হবে?

আর বাথ পার্টির সময়ের কথা আপনারা স্মরণ করুন, কোন মুরজিয়ার মুখে

যখন দাড়ি থাকত তখন সেটা অনুমোদিত ছিল। আর যখন অন্য ব্যক্তির মুখে দাড়ি থাকত তখন সেটা অবৈধ ছিল। কিভাবে তারা এই ব্যক্তির মাঝে এবং ওই ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য করত? তাদের ধারণা অনুযায়ী এই ব্যক্তি মুসলিম এবং ওই ব্যক্তি মুসলিম। কেন মুরজিয়ার জন্য দাড়ি ছেড়ে দেওয়া বৈধ হয় অপরদিকে অন্য ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে দফতরে নিয়ে এসে কৈফিয়ত চাওয়া হয় বরং তাকে হুমকি দেওয়া হয় যদি সে দাড়ি মুণ্ডন না করে। কিভাবে তারা এই ব্যক্তির মাঝে এবং ঐ ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য করত? অতএব তারা শুধু ইসলামই জানত না বরং তারা ইসলামের শাখাগত বিষয়গুলো জানত। তারা জানত, তাদের জন্য কঠোরতার স্থান কোথায় এবং নম্রতার স্থান কোথায়।

আপনারা বাথ পার্টির সময়ের কথা স্মরণ করুন, যারা মিম্বার এবং মাসজিদের দায়িত্বে থাকত তারা হল সূফী মতবাদের লোক। তাদের কারো ব্যাপারে যখন তারা প্রমাণ করত যে, সে একজন ওয়াহাবী তখন তাৎক্ষণিকভাবে তাকে বর্জন করা হত এবং তারা এই প্রতিষ্ঠান তথা সূফী মতবাদের প্রতিষ্ঠান থেকে ঐ সময়ে সনদপ্রাপ্ত একজন খতিবকে নিয়ে আসত; অতএব এই সকল শাসকরা মুসলিমদের দলগুলোর ব্যাপারেও জানে—কারা তাদের ক্ষতি করে আর কারা তাদের ক্ষতি করে না। এরপরেও কি আপনি এসে বলবেন, তাকে তাগুত নামে আখ্যায়িত করার ব্যাপারে তার উপর কি হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে? বরং সে দ্বীনের এমন বিষয়ও জানে যার ব্যাপারে স্বয়ং আপনি অজ্ঞ! তাহলে এই সকল ব্যক্তিদেরকে তাগুত নামে আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন নেই।

আমি এর সাথে সংযুক্ত করছিঃ আপনি ভুলে যাবেন না যে, তাদের নামগুলো হচ্ছে ইসলামী নাম। তারা ইসলামী সমাজে, ইসলামী পরিবেশে এবং পরিবারে জীবন-যাপন করে - আল্লাহ তাদের হিসাব গ্রহণকারী। আমরা ঐ সকল লোকদের অবস্থা কী—তা জানি না - কিন্তু নিশ্চিতভাবেই তারা প্রত্যেকেই ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত, নিশ্চিতভাবেই তারা যে অঞ্চল থেকে শাসনের এই পদমর্যাদায় এসেছে তারা জানে যে, সে অঞ্চলে অনেক মাসজিদ রয়েছে, সেখানে সালাত আদায় করা হয়, সেখানে খুতবা দেওয়া হয় এবং সেখানে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর দ্বীনের অনেক

বিষয় রয়েছে। এই সকল বিষয়গুলো তারা জানত। আপনি ভুলে যাবেন না যে, তারা এমন ব্যক্তি নয় যারা দুনিয়ার বিষয়াদিতে অকেজো। বরং তারা মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষকে শাসন করে। তাহলে তারা সাধারণ মানুষ নয়। এই ধরনের ব্যক্তিদের উপর কি হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করা হবে যে, আমরা তাদেরকে তাগুত নামে আখ্যায়িত করব কি করব না? অতএব এই সকল ব্যক্তিদের উপর হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করা আমাদের প্রয়োজন নেই। বরং তারা তাগুত যেমন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদের নামকরণ করেছেন।

স্বভাবত এই মাস'আলাটি নাম এবং বিধানের মাস'আলার অন্তর্ভুক্ত। কারণ আপনি যেমন জানেন যে, শারীয়াহ'র বিধিবিধান তিন স্তরে বিভক্তঃ শিরকে আকবারের মাস'আলা, প্রকাশ্য বিষয়ের মাস'আলা, অস্পষ্ট মাস'আলা। শিরকে আকবারের মাস'আলা এবং প্রকাশ্য বিষয়ের মাস'আলার হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা হয় কয়েকটি শর্তের আলোকে। আর অস্পষ্ট মাস'আলার হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা হয় অন্য কিছু শর্তের আলোকে।

তৃতীয় মাস'আলাঃ এই সকল তাগুতদের ব্যাপারে আপনার কোন বিষয়গুলো জানা উচিৎ যারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়ে যায়?

প্রথম বাস্তবতা যা আমাদের জানা উচিৎঃ এই সকল সরকার ব্যবস্থার সদস্যদের দ্বীন হলঃ আইন ও সংবিধান। ইসলাম নয়। এই সকল সরকার ব্যবস্থার দ্বীন হল আইন ও সংবিধান ইসলাম নয়। যদিও সে দাবি করে যে, সে একজন মুসলিম এবং যদিও সে মনে করে যে, সে মুসলিম। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হল আমার উল্লেখিত এই সমস্ত রূপে গঠিত এই শাসকদের দ্বীন হল আইন ও সংবিধান। এর দলিল কী?

আপনাদের স্মরণ আছে যে, আমরা যখন সংবিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম তখন বলেছি যে, এই সকল আইন ও সংবিধান হল দ্বীন। আমরা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর এবাণীর মাধ্যমে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃতি পেশ করেছিঃ

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾

"তাদের কি এমন শরীক রয়েছে, যারা তাদের জন্য আইন প্রণয়ন করে এমন ধর্মের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?"[106] আমরা বলেছি যে, দ্বীন তিন ভাগে বিভক্ত– একটি হল আল্লাহর দ্বীনঃ

﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾

"তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু চায়? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবকিছুই ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় তার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। আর তার দিকেই তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।"[107] এবং শাসকের দ্বীনঃ

﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾

"শাসকের (রাজার) দ্বীন তথা আইন অনুযায়ী সে তার সহোদর ভাইকে আটক করতে পারত না।"[108] তাহলে দ্বীন হল দুইটিঃ হয়তো আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর দ্বীন অথবা শাসকের দ্বীন। এই সকল ব্যক্তি যারা আল্লাহর বান্দাদের এবং দেশসমূহ শাসন করছে তারা এখন শাসকের দ্বীন দ্বারা শাসন করছে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর দ্বীন দ্বারা নয়। আল্লাহর দ্বীন স্পষ্ট। সেটাকে অকেজো করে এক পার্শ্বে সরিয়ে রাখা হয়েছে। আর শাসকের দ্বীন দেশ ও আল্লাহর বান্দাদের উপর কর্তৃত্বকারী এবং বিজয়ী। অতএব আমার সম্মানিত ভাই! আপনি দৃঢ়ভাবে বলুন যে, এই সকল তাগুতদের দ্বীন হল আইন ও সংবিধান ইসলাম নয়।

এও কি সম্ভব যে, আমরা একত্র করব এবং বলব, তাদের দ্বীন হল দ্বীনে হক্ব ইসলাম। অর্থাৎ তাদের মধ্যে ইসলামের কিছু বিষয় আছে যেহেতু তারা সালাত আদায় করে, সিয়াম রাখে, হজ্জ উমরা করে ও অন্যান্য বিষয় পালন করে এবং এই

---

[106] সুরা শুরাঃ ২১

[107] সুরা আলে-ইমরানঃ ৮৩

[108] সুরা ইউসুফঃ ৭৬

সত্য দ্বীনের পাশাপাশি তাদের মধ্যে বাতিল দ্বীনের কিছু বিষয় আছে। অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনের মাঝে এবং শাসকের দ্বীনের মাঝে একত্রিকরণ।

একই মানুষের মধ্যে শাসকের দ্বীনের সাথে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর দ্বীন একত্রিত করা কখনোই সম্ভব নয়। এই বিষয়টি অসম্ভব; কারণ পূর্বে আমরা এ আয়াতে কারীমা উল্লেখ করেছিলাম যে,

﴿وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا﴾

“তারা বলে, ‘আমরা কিছু অংশের উপর ঈমান আনি এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করি।’ আর তারা এর মাঝামাঝি একটা পথ গ্রহণ করতে চায়।”[109] আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেন,

﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾

“তারাই প্রকৃত কাফির।”[110] আমরা পূর্বে শিরকের সাথে ইসলামের মাস’আলার ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি উল্লেখ করেছিলাম। আমরা বলেছিঃ “ইসলাম এবং শিরক দু’টি বিরোধী বিষয় যে বিষয় দু’টি একত্রিত হয় না এবং দু’টি বিপরীত বিষয় যে দু’টি একত্রিত হয় না এবং একসাথে উঠেও যায় না।” সুতরাং মানুষ একই সময় দুই দ্বীনের উপর থাকা সম্ভব নয়। যখন আমরা সত্য দ্বীন–দ্বীনে ইসলাম সাব্যস্ত করব তখন শাসকের বাতিল দ্বীন উঠে যাবে। আর যখন আমরা শাসকের বাতিল দ্বীন সাব্যস্ত করব নিশ্চিতভাবেই তখন আল্লাহর দ্বীন ইসলাম–দ্বীনে হক্ব উঠে যাবে। একজন মানুষের মধ্যে দুই দ্বীন একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়।

অতএব যেহেতু এই সকল ব্যক্তিদের দ্বীন হল সংবিধান ও আইন, কারণ তারা এই সমস্ত আইন দ্বারা বিচার-ফায়সালা বা শাসন করে তাই আমাদের এটা বলা সম্ভব নয় যে, এই ব্যক্তিদের দ্বীন হল ইসলাম; কারণ তাদের দ্বীন যদি ইসলাম

---

[109] সুরা নিসাঃ ১৫০

[110] সুরা নিসাঃ ১৫১

হত তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন করত। এই সকল তাগুতদের সম্পর্কে এই বাস্তবতাটি আপনার জানা উচিৎ।

দ্বিতীয় বাস্তবতাঃ এই সকল মুরতাদ তাগুতী সরকার ব্যবস্থার রব হলঃ সংবিধান প্রণয়ন কমিটি।

তাদের রব সংবিধান প্রণয়ন কমিটি...এর দলিল কী?

আপনাদের স্মরণ আছে যে, আমরা যখন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর এবাণী সম্পর্কে আলোচনা করেছিলামঃ

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ۝ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“আর নিশ্চয়ই অধিকাংশ মানুষ ফাসিক্ব। তবে কি তারা জাহিলিয়্যাতের বিধিবিধান কামনা করে? আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে আর কে শ্রেষ্ঠতর?”[111] আমরা আরো একটি আয়াত উল্লেখ করেছিলামঃ

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾

“তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও পাদ্রীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।”[112] তখন আমরা বলেছিলাম যে, এগুলো হচ্ছে জাহিলী বিধিবিধান। কিন্তু আপনি ভুলে যাবেন না, আমরা বলেছিলাম যে, ইহুদীদের আলেমরা যখন আল্লাহর নাবী মুসার শারীয়াহ পরিবর্তন করেছিল এবং খ্রিষ্টানদের আলেমরা যখন আল্লাহর নাবী ঈসার শারীয়াহ পরিবর্তন করেছিল এবং ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা তাদের আলেমদের আনুগত্য করেছিল তখন তাদের আলেমরা আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী আল্লাহকে বাদ দিয়ে রবে পরিণত হয়েছিলঃ “তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও পাদ্রীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।” অতএব কিছু মানুষ আইন প্রণয়ন করেছে আর এই সরকার ব্যবস্থা তাদের তথা সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রণয়নকৃত এই

[111] সুরা মায়িদাহঃ ৪৯-৫০

[112] সুরা তাওবাঃ ৩১

দ্বীনের ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করে। বাতিল দ্বীন 'শাসকের দ্বীনের' প্রণয়নকারী হচ্ছে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি। এই সকল সরকার ব্যবস্থা এই প্রণীত দ্বীনের ক্ষেত্রে সংবিধান প্রণয়ন কমিটির আনুগত্য করে; তাহলে ফলাফলে আমাদের এটা বলা আবশ্যক হয় যে, তাদের দ্বীন হল আইন ও সংবিধান। অতএব অনিবার্যভাবে তাদের রব হল এই দ্বীন প্রণয়নকারী, এই আইন প্রণয়নকারী এবং এই সংবিধান প্রণয়নকারী–আর তারা হচ্ছে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি।

অর্থাৎ বিষয়টি নিম্নবর্তী বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়েছেঃ ইহুদী এবং খ্রিষ্টান। অন্য দিক থেকে তাগুতী সরকার ব্যবস্থা। ইহুদীদের আলেমরা এবং খ্রিষ্টানদের আলেমরা পরিবর্তন করেছে, সংবিধান প্রণয়ন কমিটি পরিবর্তন করেছে। ইহুদীরা এবং খ্রিষ্টানরা আনুগত্য করেছে, এই সরকার ব্যবস্থা আনুগত্য করেছে।

সাদৃশ্যের দিকঃ একশত'এ একশ। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এই ইহুদীদের নামকরণ করে বলেছেন, তোমরা এখন তোমাদের পণ্ডিতদেরকে এবং তোমাদের পাদ্রীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছো। কেন? কারণ তারা পরিবর্তনকৃত শারীয়াহ বা আইনের ক্ষেত্রে তাদের আলেমদের আনুগত্য করেছিল। আর এই সকল তাগুতরা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আইনকে পরিবর্তনকারী বিকৃতকারী সংবিধান ও আইনের ক্ষেত্রে সংবিধান প্রণয়ন কমিটির আনুগত্য করেছে। সুতরাং এই হুকুমের ক্ষেত্রে তারা এবং ইহুদীরা একইরকম। বরং তারা ইহুদীদের এবং খ্রিষ্টানদের চেয়ে নিকৃষ্ট। এই সকল মুরতাদ তাগুতী সরকার ব্যবস্থাগুলো ইহুদীদের থেকে এবং ইহুদীদের পণ্ডিত ও খ্রিষ্টানদের পাদ্রীদের থেকে বেশি নিকৃষ্ট। কিভাবে?

ঐ সকল ব্যক্তিরা যখন বিকল্প আইন নিয়ে এসেছিল তখন তারা মানুষকে তাদের নিয়ে আসা বিকল্প আইনের প্রতি অনুগত হওয়ার ব্যাপারে শক্তির মাধ্যমে চাপপ্রয়োগ করেনি। ইহুদীদের আলেমরা এবং খ্রিষ্টানদের আলেমরা মানুষকে তাদের নিয়ে আসা বিকল্প আইনের প্রতি অনুগত হওয়ার ব্যাপারে শক্তি দ্বারা চাপপ্রয়োগ করেনি। আর এই সকল তাগুতরা ইহুদী-খ্রিষ্টানদের থেকে এবং তাদের আলেমদের থেকে বেশি নিকৃষ্ট; কারণ তারা এখন এই বাতিল দ্বীন শাসকের দ্বীনের প্রতি অনুগত হওয়ার ব্যাপারে শক্তির মাধ্যমে মুসলিমদেরকে আক্রমণ করে। অতএব তারা এই

দিক থেকেও অধিক নিকৃষ্ট।

আরেক দিক থেকে নিকৃষ্টঃ ইহুদীদের আলেমরা এবং খ্রিষ্টানদের আলেমরা যখন পরিবর্তন করেছিল তখন তারা ইহুদীদের এবং খ্রিষ্টানদের এই পর্যবেক্ষণ করত না যে, তারা কি তাদের দ্বীন পালন করছে নাকি তাদের নিয়ে আসা বিকল্প আইন পালন করছে। তাদের নিকট মানুষের বিষয় অনুসরণ করার এবং পর্যবেক্ষণ করার কোন কমিটি ছিল না। মানুষ কি বিকল্প আইন পালন করছে নাকি পালন করছে না। আর এই সকল তাগুতী সরকার ব্যবস্থা –আপনি যেখানেই যাবেন সেখানে মানুষের উপর একজন পর্যবেক্ষক রয়েছে–আপনি সেখানে কি আইন অমান্য করেছেন নাকি অমান্য করেননি। এটা জানা বিষয় যে, পার্লামেন্টের সদস্যদের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে যে, মন্ত্রীপরিষদের হিসাব চাওয়া যখন তারা সংবিধানের অথবা আইনের কোন বিষয় অমান্য করবে। এজন্য আপনি কিছু দলকে দেখবেন, যখন তারা এরকম অমুক মন্ত্রীকে তলব করার মত বিষয় পায় তখন তাকে পার্লামেন্টে ডাকা হয় এবং জবাবদিহি করা হয় যে, আপনি সংবিধানের অমুক ধারা অমান্য করেছেন, আপনি আইনের অমুক বিধি অমান্য করেছেন। অতএব এই সকল ব্যক্তিরা মানুষকে এই বাতিল দ্বীন শাসকের দ্বীনের প্রতি অনুগত হওয়ার জন্য শক্তির মাধ্যমে প্ররোচিত করে। অতঃপর তাদের রয়েছে গুপ্তচর বাহিনী এবং তাদের এমন কিছু লোক আছে যারা এই আইন অমান্যকারীদের পর্যবেক্ষণ করে। ফলে তারা যখন এমন ব্যক্তিকে খুঁজে পায় যে আইন অমান্য করে তখন তারা তাকে আনুগত্য করার জন্য শক্তির মাধ্যমে প্ররোচিত করে। অতএব এখানেও তারা ইহুদীদের আলেমদের থেকে এবং খ্রিষ্টানদের আলেমদের থেকে নিকৃষ্ট।

তৃতীয় দিক থেকে তারা নিকৃষ্টঃ তারা অমান্যকারীদের জন্য শাস্তি প্রণয়ন করেছে। অর্থাৎ কোন মানুষ আইন অথবা সংবিধান অমান্য করলে আইন অনুযায়ী এবং সংবিধান অনুসারে তাকে শস্তি দেওয়া হবে। আমি আপনার জন্য একটি উদাহরণ উল্লেখ করছিঃ যদি তাদের কেউ দুঃসাহস দেখিয়ে তার বাড়িতে মদ তৈরি করে আপনি কি জানেন তাকে আইনগতভাবে শাস্তি দেওয়া হবে? কারণ এটা নয় যে, মদ তৈরি করা হারাম। বরং কারণ হল সে আইন বহির্ভূত একটি জিনিস তৈরি

করেছে। এটা আইন বিরোধী তাই এর জন্য তার কাছে হিসাব চাওয়া হবে। আমাদের অঞ্চলে এক লোক ছিল যে মদ তৈরি করে অন্য এক সময় আপনি তাকে পুলিশের সাথে দেখলেন যে, তাকে গ্রেফতার করে ফাঁড়িতে নেওয়া হয়েছে। কেন? কারণ তার বাড়িতে রেড দিয়ে মদ পেয়েছে। তারা বলল, তোমার নিকট কোন লাইসেন্স নেই অথচ তুমি মদ তৈরি করছো। আইন তোমাকে এই কাজের জন্য শাস্তি দিবে। ঐ লোককে কারাগারে পাঠানো হয়।

তাহলে তারা শক্তির মাধ্যমে এই বাতিল দ্বীনের প্রতি অনুগত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছে। এরপর তারা অমান্যকারীকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য গোয়েন্দা বাহিনী নিয়োগ দিয়েছে। অতঃপর তারা অমান্যকারী ব্যক্তির জন্য শাস্তি প্রণয়ন করেছে। তাহলে নিশ্চিতভাবেই তারা পণ্ডিত ও পাদ্রীদের চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট এবং তারা ইহুদীদের চেয়ে নিকৃষ্ট ইহুদীরা তাদের আলেমদের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে। এই তাগুতী সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে মুসলিমদের জন্য এই বিষয়টি জানা উচিৎ।

সর্বশেষ বিষয় এই সকল মুরতাদ তাগুতী সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে যা আপনার জানা উচিৎঃ

হে ভাইগণ! এই সকল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমার আপনার উপর আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আদেশের কারণে ওয়াজিব। একটি আয়াত পূর্বে আলোচনা হয়েছে—যার মাধ্যমে আমরা অসংখ্যবার প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃতি পেশ করেছি। সুরা বাকারাহ এবং সুরা আনফালে রয়েছে। আমি সুরা আনফালের ৩৯ নং আয়াত উল্লেখ করছি- আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

﴿وَ قَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ﴾

“আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়। তারপর যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ তো তার সম্যক দ্রষ্টা।” এই সকল ব্যক্তিরা আল্লাহর জন্য কিছুই করেনি। যদি তারা প্রতিটি বিষয় আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে একটি বিষয় আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সাব্যস্ত করে তাহলে আপনি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আদেশের

মাধ্যমে এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নির্দেশিত। আপনার কি হল যে, তারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর জন্য কোন বিষয় সাব্যস্ত করেনি। তারা তা সাব্যস্ত করেই নি উপরন্তু তারা বিকৃত করেছে। তারা সেটাকে সংবিধানের অধীন এবং আইনের ধারার অধীনে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাই তারা সংবিধান ও আইন দ্বারা শাসন করছে যেমনটি আমরা পূর্বে বলেছিলাম। তারা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর নামে শাসন করে না।

এজন্য আপনি তাদের দেখবেন, যখন পার্লামেন্ট থেকে সিদ্ধান্ত প্রকাশ হয় যদিও সে "ইবরাহীম নিমাহ" হয় - যে বিবৃতি পাঠ করে সে "বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম" বলতে সক্ষম হয় না। সে বলে "জনগণের নামে"। কারণ বিধিবিধান জনগণের নামে তাদের প্রতিনিধিত্ব করে প্রকাশিত হয়; কেননা এই ব্যক্তিরাই জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তারা মানুষদেরকে জনগণের নামে শাসন করে। তাই যখন তারা কোন আইন প্রণয়ন করে তখন সেটাকে আল্লাহর নামের মাধ্যমে আখ্যায়িত করা হয় না এমনকি যদিও সেটা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শারীয়াহ'র মুওয়াফিক্ব হয়। সেটাকে জনগণের নামে আখ্যায়িত করা হয়। অতএব আপনি যেহেতু জানেন যে, তাদের দ্বীন হল শাসকের দ্বীন সংবিধান ও আইন এবং যেহেতু জানেন যে, তারা সংবিধান প্রণয়ন কমিটিকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে তাই আপনি জেনে রাখুন যে, আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ আপনাকে এই সকল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ করেছেন যতক্ষণ না দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়। আমরা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ব্যতীত অন্যের জন্য শাসনের কোন অংশকে মেনে নিব না। অন্যথায় সাহাবীগণ আমাদের পর্যন্ত এই দ্বীনকে সরলভাবে পৌঁছে দিতে কেন এত সব কষ্ট সহ্য করেছেন? এরপরেও কি আমরা দ্বীনকে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ব্যতীত অন্যের জন্য সাব্যস্ত করব অথচ আমরা এই দ্বীনের প্রতি ঈমান আনি?! বিষয়টি এমন হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। অতএব "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়।"

এই সকল তাগুতদের সম্পর্কে আপনার আরো যা জানা উচিৎঃ মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন থেকে দূরে রাখার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে তারাই বেশি আগ্রহী। একজন মুসলিমকে তার দ্বীন থেকে দূরে রাখার ব্যাপারে কাজ করাটাই

তাদের একমাত্র চিন্তা। বাথ পার্টির সময়ের অবস্থা আপনার স্মরণ আছে যে, কোন যুবক যখন মাসজিদে বারবার আসা-যাওয়া করত তখন গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে, নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে এবং দলের পক্ষ থেকে তার পিছু নেওয়া হত। এরপর যখন এই মুসলিম তার নিজের ব্যাপারে উপলব্ধি করত এবং সে অবহিত হত যে, তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে যতক্ষণ না বিষয়টি বিভ্রান্তিকর হয়ে যায় তখন সে ক্যাসিনোতে যেত, কফি হাউজে গিয়ে কিছু করত; এখানে সেখানে গিয়ে কিছু করত... ফলে সর্বশেষ রিপোর্ট লেখা হত যে, “তার চরিত্র ভাল হয়েছে।” এরপর তারা তাকে আর অনুসরণ করত না।

বর্তমান সময়ে তাগুতরা মুসলিমদের দেশগুলোতে যা করছে তা এর চেয়েও অনেক বেশি কঠিন। আপনি কি জানেন, তিউনিসিয়ায় যাকে তলব করা হত সর্বপ্রথম তার পা অনাবৃত করে দেখা হত, তার পায়ে সিজদার কোন চিহ্ন আছে কিনা! কারণ মুসলিম যখন তার পায়ের উপর বসে তখন সেখানে ক্ষত চিহ্ন হয়। এই চিহ্ন প্রমাণ করে যে, আপনি সালাত আদায় করেন। ঐ সময়ে এর জন্য মুসলিমকে তিরস্কার করা হত। যে ফজরের সময় আলো জ্বালায়–এর অর্থ হল এই বাড়িতে ভোরে সালাত আদায় করা হয়। এই ব্যক্তিকে অনুসরণ করা হবে। অতএব ফাসাদ ছড়িয়ে দেওয়া ছাড়াও–ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্ - তাদের একমাত্র চিন্তা হল তারা কিভাবে মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন থেকে দূরে রাখার জন্য কাজ করবে; কারণ তারা জানে যে, মুসলিমদের পক্ষ থেকে ব্যতীত এই তাগুতী চেয়ারকে কোন অনিষ্টতা ছুতে পারবে না। অতএব আবশ্যক হচ্ছে মুসলিম তার দ্বীনের উপর থাকবে না। তারা তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে যখন সে একজন শান্তিপূর্ণ ব্যক্তি হবে যেমনটি মিসরের ইখওয়ান চায় এবং হিযবুল ইরাকী চায়। একজন শান্তিপূর্ণ মানুষ যে কঠোরতাকে প্রত্যাখ্যান করে, মৌলিকভাবে সে ঈমান আনে না এবং সে মনে করে এটা জিহাদের সময় নয়। এই ধরনের মুসলিমকে তারা সমর্থন করে বরং তারা তাকে কাছে টেনে নেয়।

এই সকল তাগুতদের সম্পর্কে এই বিষয়গুলো মুসলিমের জানা উচিৎ। ইনশা’আল্লাহ আগামী দারসে আমরা আলোচনা করব এই সকল তাগুতদের

ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী।

আমি এতোটুকুই বললাম। আল্লাহ আপনাদেরকে জাযা খায়ের দান করুন এবং আপনাদেরকে বারাকাহ দান করুন!

আনুগত্যের শিরক সংক্রান্ত উৎকর্ষ বিবরণ

শাইখ আবু আলী আল-আনবারী
আল-কুরাইশী رحمه الله

অষ্টম দারসঃ

এই সকল তাগুতদের ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী?

الحَمدُ للّٰه والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسُولِ اللّٰه؛

হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে হক্বকে হক্ব হিসেবে দেখান এবং হক্ব অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করুন, বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখান এবং বাতিল বর্জন করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদের এমন বিষয় শিক্ষা দিন যা আমাদের উপকার করবে এবং আপনি আমাদের যা শিক্ষা দেন এর মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে আমাদের ইলম অনুযায়ী আমলকারী বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন আমাদের ইলমকে আমাদের জন্য দলিল বানিয়ে দিন এবং আমাদের বিরুদ্ধে দলিল বানাবেন না - - ইয়া আরহামার-রহিমীন! হে আমার রব! আপনি আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিন, আমার বিষয়াদি সহজ করে দিন এবং আমাদের মুখের জড়তা দূর করে দিন যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে। হে আল্লাহ আপনি আমার কর্মকে সৎ বানিয়ে দিন, আপনার সন্তুষ্টির জন্য খালিছ করে দিন এবং আপনার সৃষ্টির কারো জন্য এতে কোন অংশ রাখবেন না।

অতঃপর,

আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে আমরা গত দিনের বৈঠকে সংবিধান বাস্তবায়নকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি, বাস্তবায়নকারী দ্বারা উদ্দেশ্য হল যে সরকার তার তিনটি অবকাঠামো নিয়ে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত শাসন করে। অবকাঠামো তিনটি হলঃ আইন-সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষ, নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এবং বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। আমরা বলেছি, এই সকল ব্যক্তিদের ব্যাপারে তাগুত বিশেষণ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হয় না। এমনিভাবে আলোচনা করেছি, এই তাগুতদের সম্পর্কে মুসলিমের জন্য যে বিষয়গুলো জানা উচিৎ, এই বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে–আমরা বলেছি, এই সকল তাগুতী সরকারের দ্বীন হল সংবিধান এবং আইন ইসলাম নয়। যদি তারা

দাবি করে তখন এটা শুধুই একটি দাবি। তাদের দ্বীন হচ্ছে সংবিধান এবং আইন। এমনিভাবে আমরা বলেছি, তাদের রব হল সংবিধান প্রণয়ন কমিটি। আমরা বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে এব্যাপারে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃতি পেশ করেছি। অতঃপর আমরা অন্য আরেকটি বিষয় আলোকপাত করেছি—এই সকল ব্যক্তিরা স্বয়ং আহলুস সুন্নাহ'র বিরুদ্ধে শত্রুতা করে এবং তারা মুসলিমকে তার দ্বীন থেকে সরানোর জন্য এবং তাদের পছন্দনীয় শান্তিপূর্ণ মুসলিমের দিকে রূপান্তরিত করার জন্য কাজ করে।

আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়ের আলোচনা পূর্ণ করব। তা হলঃ এই সকল তাগুতদের ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী?

যখন এটা নিশ্চিত হল যে, এই সকল সরকার হল তাগুতী সরকার—যেমনটি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদের নাম দিয়েছেন তখন এই সকল তাগুতী সরকারের ব্যাপারে - আমরা মুসলিম - আমাদের করণীয় কী? আমি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাহায্যে বলছিঃ

প্রথম বিষয় যা এই তাগুতদের সম্পর্কে একজন মুসলিমের জন্য জানা উচিৎঃ আপনি এই সকল তাগুতদেরকে অস্বীকার করবেন। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাব থেকে এর দলিল আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর বাণীঃ

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾

"সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করল সে মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল যা বিচ্ছিন্ন হবে না।"[113]

এই আয়াতের অর্থ অথবা এই আয়াতের তাফসীরঃ এই আয়াতটি একটি শর্তযুক্ত আয়াত। এই আয়াত শুরু হয়েছে শর্তের অব্যয় "من" দ্বারা– "فَمَنْ يَكْفُرْ" আর প্রতিটি শর্তের অব্যয় - যেমনটি আমরা পূর্বে বলেছি - একটি ফে'য়েল দাবি করে যা আপনি সম্পাদন করবেন। অতঃপর এই ফে'য়েল সম্পাদন করার কারণে যা সাব্যস্ত হয়—সেটাকে বলা হয় "جواب الشرط" তথা শর্তের জওয়াব। অর্থাৎ আপনি

[113] সুরা বাকারাহঃ ২৫৬

এই ফে'য়েল বা ক্রিয়া সম্পাদন করবেন। ফলে এই ফে'য়েল বা ক্রিয়া যা আপনি সম্পাদন করেছেন—এর ভিত্তিতে জওয়াব বা উত্তর অর্জিত হয়। সুতরাং বিষয়টি দাঁড়ায়ঃ শর্তের অব্যয়, ফে'য়েলে শর্ত এবং জওয়াবে শর্ত।

এখানে শর্তের অব্যয় হলঃ "مَن" তথা যে ব্যক্তি। আর ফে'য়েলে শর্ত হলঃ আমার এবং আপনার জন্য কী করা উচিৎ? আল্লাহ বলেছেন, "সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করল।" তাহলে ঈমানের ক্ষেত্রে শর্ত হলঃ আমাদের তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। তাই যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে... শর্তের জওয়াব হলঃ "সে মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল যা বিচ্ছিন্ন হবে না।"

মুফাসসিরগণ رَحِمَهُمُ اللهُ মজবুত হাতলের তাফসীরে কিছু উক্তি উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মজবুত হাতলের অর্থ বলেছেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। কেউ বলেছেন, "কুরআন"। কেউ বলেছেন, "রাসুল"। কেউ বলেছেন, "ইসলাম"। কিন্তু মজবুত হাতলের ব্যাপারে এই সবগুলো অর্থই সহীহ। অতএব আমরা যেন মজবুত হাতল আঁকড়ে ধারণকারী হতে পারি—এক্ষেত্রে শর্ত হল প্রথমতঃ আমরা এই সকল তাগুতদের অস্বীকার করব অতঃপর আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর প্রতি ঈমান আনব। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর প্রতি ঈমান এনেছে কিন্তু এই সকল তাগুতদের, এই সকল তাগুতী সরকার ব্যবস্থাকে অস্বীকার করেনি এই ব্যক্তি মজবুত হাতল আঁকড়ে ধারণকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেন? কারণ ফে'য়েলে শর্ত তথা শর্তের ক্রিয়ার ক্ষেত্রে তার ত্রুটি রয়েছে। সে ঈমান এনেছে কিন্তু সে তাগুতকে অস্বীকার করেনি; অতএব সে শর্তের ক্রিয়া সম্পাদন করেনি যেমন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ আদেশ করেছেন। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى আপনার থেকে দুইটি বিষয় চেয়েছেনঃ প্রথম বিষয়ঃ আপনি তাগুতকে অস্বীকার করবেন। দ্বিতীয় বিষয়ঃ আপনি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবেন। তাই যে ব্যক্তি বলে, আমি ঈমান আনি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর প্রতি, আল্লাহর রাসুল ﷺ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে—এর প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, কিতাবের প্রতি এবং নাবীর প্রতি। সে এই সবগুলোর প্রতি ঈমান আনে। কিন্তু সে

এই সকল তাগুতী সরকার ব্যবস্থাকে অস্বীকার করেনি... আমরা তাকে বলবঃ আপনি মজবুত হাতল আঁকড়ে ধারণকারীদের অন্তর্ভুক্ত নন। কারণ শর্তের ক্রিয়ার ক্ষেত্রে আপনার ত্রুটি রয়েছে। আর শর্তের ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ত্রুটি বিদ্যমানতার কারণে শর্তের জওয়াব সাব্যস্ত হবে না তাই আপনি মজবুত হাতল আঁকড়ে ধারণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না; অতএব এই সকল তাগুতদের ব্যাপারে আমাদের প্রথম করণীয় হলঃ আমরা এই সকল তাগুতী সরকার ব্যবস্থাকে অস্বীকার করব।

আপনি জানেন যে, শাহাদাতাইন তথা দুই শাহাদাহ'র সাথে এই আয়াতের একটি সম্পর্ক রয়েছে। যে ব্যক্তি বলে, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই" আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি যখন বলেছেন "সত্য কোন ইলাহ নেই" তখন কি আপনি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি, এই সকল তাগুত এবং পার্লামেন্টের সদস্যদের থেকে উলুহিয়্যাতকে অস্বীকার করেছেন? আপনি কি তাদের থেকে উলুহিয়্যাতকে অস্বীকার করেছেন? যদি আপনি সেটাকে অস্বীকার করে থাকেন তাহলে আপনি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর জন্য উলুহিয়্যাত সাব্যস্ত করলেন। অতএব আপনি শাহাদাহ তথা সাক্ষ্য নিয়ে এসেছেন। আর যদি আপনি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি, পার্লামেন্টের সদস্যদের–যাদের আইন প্রণয়ন করার অধিকার রয়েছে– তাদের থেকে উলুহিয়্যাত এবং রুবুবিয়্যাত অস্বীকার না করেন তাহলে আপনার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলার কী ফায়েদা রয়েছে?! আপনার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলা কোন উপকারে আসবে না যদি-না আপনি এমন প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে উলুহিয়্যাতকে অস্বীকার করেন যে নিজেকে ইলাহ দাবি করে অথবা যাকে ইলাহ বলে দাবি করা হয়।

অতএব এটা দুই শাহাদাহ'র সাথে সংশ্লিষ্ট একটি মাস'আলা। প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব হচ্ছে এই আয়াতের তাৎপর্য অনুধাবন করা যাতে সে জানতে পারে কিভাবে সে মজবুত হাতল আঁকড়ে ধারণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এখানে প্রশ্ন আসে যে, আমি এই সকল তাগুতদেরকে অস্বীকার করতে চাই। কিন্তু কিভাবে আমি অস্বীকার করব? আমি তাগুত অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে আমাকে কী করতে হবে?

আমি “আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা” বুঝি... কিন্তু কিভাবে আমি এই সকল তাগুতদের অস্বীকার করব যাতে আমি এই আয়াতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি? “সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করল সে মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল যা বিচ্ছিন্ন হবে না। এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।”

এই প্রশ্নের জবাব আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর বাণীতে রয়েছেঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

“তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তার সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল; তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের অস্বীকার করছি। এবং তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হল যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো।”[114] এই আয়াতের মধ্যে কিছু মাস'আলা রয়েছে আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে যেগুলো আমরা আলোচনা করব। এই আয়াতের ভিত্তিতে কিভাবে আমি এই সকল তাগুতদের অস্বীকার করব–এ সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আমরা কিছু বিষয় উল্লেখ করছি...

প্রথম বিষয়ঃ কেন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এই আয়াতে আল্লাহর নাবী ইবরাহীমকে আমাদের জন্য আদর্শ বানিয়েছেন?

এটা একটি জানা বিষয় যে, আমাদের নাবী হলেন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ তার সম্পর্কে এই বরকতময় কিতাবে বলেছেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

[114] সুরা মুমতাহিনাহঃ ০৪

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[115] সুতরাং একই বিষয়ে আল্লাহর নাবী ইবরাহীমের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম কেন? কেন তিনি এই আয়াতে অথবা এই একই বিষয়ে আমাদের আদর্শ?

প্রথম কারণঃ কেননা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ইবরাহীমকে সকল মানুষের জন্য ইমাম বানিয়েছেন। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর বাণীতে রয়েছেঃ

﴿قَالَ اِنِّیۡ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ ؕ قَالَ لَا یَنَالُ عَهۡدِی الظّٰلِمِیۡنَ﴾

"আল্লাহ বললেন, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে মানুষের ইমাম বানাবো। তিনি বললেন, 'আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও?' আল্লাহ বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি জলিমদেরকে পাবে না।"[116] তাহলে আল্লাহর নাবী ইবরাহীমকে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ সকল মানুষের জন্য ইমাম বানিয়েছেন। এজন্য আপনি দেখবেন, ইহুদীরা দাবি করে আল্লাহর নাবী ইবরাহীম ইহুদী ছিলেন, খ্রিষ্টানরা দাবি করে তিনি খ্রিষ্টান ছিলেন। তারা আল্লাহর নাবী ইবরাহীমের নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনে। এমনিভাবে খ্রিষ্টানরাও ঈমান আনে। মুশরিকরাও ঈমান আনত। বরং অধিকাংশ ধর্মের অনুসারীরা এখনো আল্লাহর নাবী ইবরাহীমের নবুওয়াতের স্বীকৃতি দেয়। কেন? কারণ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাকে সকল মানুষের জন্য ইমাম বানিয়েছেন। ইমাম–এর অর্থঃ অর্থাৎ অগ্রগামী ব্যক্তি। এজন্য যে ব্যক্তি আমাদের মাঝে সালাত পড়ায় আমরা তাকে ইমাম নামে অভিহিত করি।

অতএব বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা আল্লাহর নাবী ইবরাহীমের নবুওয়াতকে স্বীকৃতি দিয়েছে। উপরন্তু ইহুদীরা মুসার প্রতি ঈমান এনেছে কিন্তু তারা মুহাম্মাদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনেনি। খ্রিষ্টানরা ঈসার প্রতি ঈমান এনেছে কিন্তু তারা আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনেনি। ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام ব্যতীত অন্যান্য নাবীগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতি এবং ধর্মের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে। এজন্য আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ইহুদীদের এবং খ্রিষ্টানদের সম্পর্কে বলেছেন,

---

[115] সুরা আহযাবঃ ২১

[116] সুরা বাকারাহঃ ১২৪

﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوۡرَىٰةُ وَٱلۡإِنجِيلُ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِهِۦٓۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ﴾

"হে আহলে কিতাবগণ! ইবরাহীম সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর, অথচ তাওরাত ও ইঞ্জীল তো তার পরেই নাযিল হয়েছে! সুতরাং তোমরা কি বুঝ না।"[117] কিভাবে তুমি বল– তিনি ইহুদী অথচ তোমার ধর্ম তার পরে এসেছে? কিভাবে তুমি বল– তিনি একজন খ্রিষ্টান অথচ তোমার ধর্ম তার পরে এসেছে?

﴿مَا كَانَ إِبۡرَٰهِيمُ يَهُودِيّٗا وَلَا نَصۡرَانِيّٗا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفٗا مُّسۡلِمٗا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾

"ইবরাহীম ইহুদীও ছিলেন না, খ্রিষ্টানও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"[118] অতএব প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা আল্লাহর নাবী ইবরাহীমের জন্য ইমামত তথা নেতৃত্বকে এবং নবুওয়াতকে স্বীকৃতি দেয়। কারণ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাকে সকল মানুষের জন্য ইমাম বানিয়েছেন।

তাই যখন আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন, "তোমাদের জন্যে ইবরাহীমের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে।" ইহুদীদের সাথে এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদের বিতর্ক করা সম্ভব যখন তুমি আল্লাহর নাবী ইবরাহীমের নবুওয়াত এবং তার ইমামতকে স্বীকৃতি দিবে। সুতরাং এটা তার কর্ম। খ্রিষ্টানদের সাথে এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদের বিতর্ক করা সম্ভব যখন তুমি আল্লাহর নাবী ইবরাহীমের নবুওয়াত এবং ইমামতকে স্বীকৃতি দিবে। অতএব এটা হল আল্লাহর নাবী ইবরাহীমের কর্ম। যে সকল কাজ তিনি সম্পন্ন করেছেন সেগুলো সম্পন্ন করা আপনার উপর আবশ্যক; অতএব ইমামত এবং তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার কারণে তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে এই আয়াত প্রমাণস্বরূপ পেশ করা যাবে। এটাও একটি কারণ অথবা এটাও একটি হিকমা হতে পারে।

[117] সুরা আলে-ইমরানঃ ৬৫

[118] সুরা আলে-ইমরানঃ ৬৭

আরেকটি হিকমা–আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى অধিক জানেন এবং অধিক প্রজ্ঞাবানঃ আল্লাহর নাবী ইবরাহীম একটি কাজের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন অথচ তিনি ছিলেন দূর্বল এবং একা। যখন তার গোত্রের লোকেরা এসে তাকে ঈদ তথা উৎসবে বের হওয়ার জন্য আহ্বান করল তখন তিনি কারণ পেশ করলেন যে, তিনি অসুস্থ। কিন্তু তার গোত্রের লোকেরা তাকে ছেড়ে যাওয়ার পর তিনি বললেন,

وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ۞ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ

“আর আল্লাহর কসম, তোমরা পিছন ফিরে চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করব। অতঃপর তিনি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন মূর্তিগুলোকে, তাদের প্রধানটি ছাড়া; যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে।”[119] অতএব তিনি ছিলেন একা। তিনি একাই এই মূর্তিগুলো ভেঙ্গেছেন। তার গোত্রের লোকেরা যখন তাদের উপাস্যগুলোকে ভাঙ্গা টুকরা টুকরা অবস্থায় দেখলঃ

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۞ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ۞ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۞

“তারা বলল, আমাদের মা’বুদগুলোর প্রতি এরূপ করল কে? সে নিশ্চয়ই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত। লোকেরা বলল, আমরা এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি; তাকে বলা হয় ইবরাহীম। তারা বলল, তাহলে তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর, যাতে তারা দেখতে পারে।”[120] আল্লাহর নাবী ইবরাহীম যে কাজের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন–সে কারণেই তিনি এই বিষয়ে সকল মানুষের ইমাম হওয়ার উপযুক্ত। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى –ই অধিক প্রজ্ঞাবান - আল্লাহর নাবী ইবরাহীমকে এই আয়াতে আমাদের জন্য এবং অন্যদের জন্য আদর্শ বানানোর এটাও একটি কারণ হতে পারে।

---

[119] সুরা আম্বিয়াঃ ৫৭-৫৮

[120] সুরা আম্বিয়াঃ ৫৯-৬১

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, "ও তার সঙ্গিগণ।" তার সঙ্গিগণ কারা? ইমাম জাসসাস رَحِمَهُ اللهُ তার তাফসীরে বলেন, "ও তার সঙ্গিগণ"—এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলঃ অর্থাৎ যে ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام -এর যুগে তার প্রতি ঈমান এনেছিল।" এটা একটি উক্তি।

আরেকটি উক্তি—তিনি বলেন, "সকল নাবীগণ এই মানহাজ বা পথের উপর ছিলেন যে পথের উপর আল্লাহর নাবী ইবরাহীম ছিলেন।" অতএব যে ব্যক্তি তার যুগে তার প্রতি ঈমান এনেছিল—সেও হতে পারে এবং "ও তার সঙ্গিগণ।" অর্থাৎ নাবীগণও হতে পারেন যাদেরকে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ প্রেরণ করেছেন—তারা এই আয়াতে আমার উল্লেখিত শর্তসমূহের ক্ষেত্রে আল্লাহর নাবী ইবরাহীমের সাথে ছিলেন।

আমি বলি - আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -ই অধিক জানেন এবং অধিক প্রজ্ঞাবানঃ আয়াতটিতে দুইটি অর্থের সম্ভাবনা আছেঃ সম্ভাবনা আছে যে, আল্লাহর নাবী ইবরাহীমের প্রতি যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল এবং আরেকটি সম্ভাবনা আছে যে, সকল নাবী ও রাসুলগণ। এর দলিল আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর কিতাবে সুরা আলে-ইমরানের এক আয়াতে রয়েছে। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেন,

﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرٰهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ اٰمَنُوا ۗ وَ اللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾

"নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে তারাই ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নাবী ও যারা ঈমান এনেছে; আর আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক।"[121] অতএব যারা তার সাথে ছিল তারা তাকে অনুসরণ করেছিল। তথাপি আপনি ভুলে যাবেন না, নাবী এবং নাবীর প্রতি যে ঈমান আনে সেও আল্লাহর নাবী ইবরাহীমের সাথে রয়েছে। তাহলে "তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তার সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে।" অর্থাৎঃ যে ইবরাহীমের প্রতি ঈমান এনেছে সে এই মানহাজের উপর ছিল, আল্লাহর রাসুল ﷺ এই মানহাজের উপর ছিলেন এবং যে ব্যক্তি যথাযথভাবে আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর প্রতি ঈমান এনেছে সে এই মানহাজের উপর

[121] সুরা আলে-ইমরানঃ ৬৮

রয়েছে।

“ও তার সঙ্গিগণ।” কিভাবে আমরা আল্লাহর নাবী ইবরাহীমকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করব এবং কিভাবে এই আদর্শ গ্রহণের মাধ্যমে আমরা স্বয়ং আমাদের নিজেদের মধ্যে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর এ বাণীঃ “সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করল সে মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল।” বাস্তবায়ন করব?

প্রথমতঃ “তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।” আল্লাহর নাবী ইবরাহীমকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এটা হল প্রথম শর্ত। আপনারা আপনাদের জাতির লোকদের বলবেন যে, আমরা তোমাদের থেকে সম্পর্ক মুক্ত। এই শর্তের উপলব্ধি দুইটি বিষয় দাবি করেঃ

প্রথম বিষয়ঃ আমি "براءة" তথা সম্পর্ক মুক্ত শব্দের অর্থ বুঝবো। সম্পর্ক মুক্ত হওয়ার অর্থ কী? এরপর যখন আমি সম্পর্ক মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে জানব তখন আমি কার থেকে সম্পর্ক মুক্ত হব? সুতরাং এই দুইটি বিষয় বাস্তবায়িত হওয়ার মাধ্যমে আপনার মধ্যে প্রথম শর্ত বাস্তবায়ন হবে।

সম্পর্ক মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে যেমন ‘মুখতার আস-সিহাহ’এ এসেছেঃ সে সম্পর্ক মুক্ত হলঃ সে মুক্ত থাকল, সে ছেড়ে দিল এবং বিচ্ছিন্ন হল। ‘মুখতার আস-সিহাহ’ এর লেখক বলেন, “লোকটি তার স্ত্রীর থেকে পৃথক হয়েছে অর্থাৎঃ সে তাকে ছেড়ে গিয়েছে, লোকটি তার অংশীদার থেকে পৃথক হল অর্থাৎঃ সে তাকে ছেড়ে দিল।” অতএব ‘তারা সম্পর্ক মুক্ত’ এর অর্থ তারা মুক্ত, বিচ্ছিন্ন। এটা হল সম্পর্ক মুক্ত হওয়ার অর্থ।

সুতরাং আপনি যখন এই বিষয়টি জানবেন তখন আপনি কার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন—এটা জানা আপনার উপর আবশ্যক। এই বিষয়টি আপনার উপর বাধ্যতামূলক করে যে, আপনি এলাকায় বিদ্যমান সকল দল সম্পর্কে অবগত হবেন এবং ঐ সকল দলের আক্বীদাহ-বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত হবেন। যে ব্যক্তি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ’র মানহাজের উপর রয়েছে তার থেকে আপনার

সম্পর্কচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। আর যখন এমন কোন দল পাবেন যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ'র মানহাজের উপর নেই তখন তাদের থেকে আপনার সম্পর্কচ্ছেদ করা আপনার উপর আবশ্যক হবে। কারণ আল্লাহর নাবী ইবরাহীমকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এটা হল প্রথম শর্তঃ "তোমাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।"

বর্তমান সময়ে মাঠে বিদ্যমান দলগুলো হচ্ছেঃ হয়তো তারা আসলী কাফির এবং এদের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা যোগ দিচ্ছে অথবা তারা আসলী মুশরিক এবং এই মুশরিকদের সাথে যোগ দিচ্ছে সূফীরা, এই মুশরিকদের সাথে যোগ দিচ্ছে ইরাকী পার্টি এবং এই মুশরিকদের সাথে যোগ দিচ্ছে মুরজিয়ারা। আর রাফিদীদের সম্পর্কে আমরা কোন আলোচনা করব না; কারণ তারা মুসলিম নয়। তাই আমরা আমাদের আলোচনায় তাদের উল্লেখ করব না। কেননা ইসলামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

অতএব আপনি "মুক্ত হওয়া, খালি হওয়া এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া অর্থে" বারা তথা সম্পর্কচ্ছেদ করার অর্থ জানলেন অতঃপর বিদ্যমান দলগুলো সম্পর্কে এবং এই সকল দলের আক্বীদাহ-বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত হলেন। আপনি জেনেছেন যে, সূফীবাদের লোকদের মাঝে দু'আর শিরক রয়েছে। আপনি জেনেছেন যে, ইরাকী পার্টির মধ্যে আনুগত্যের শিরক রয়েছে; তাহলে উক্ত আয়াত আপনাকে বাধ্য করে যে, যখন আপনি আল্লাহর নাবী ইবরাহীমকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে চাইবেন তখন আয়াত আপনাকে বাধ্য করে যে, আপনি এই সকল দল থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন। কিভাবে?

আপনি এই সকল দলের আক্বীদাহ-বিশ্বাস থেকে মুক্ত হবেন। আপনার মধ্যে তাদের আক্বীদাহ-বিশ্বাসের কোন বিষয় থাকা যাবে না। আপনি স্বয়ং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন। তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন এবং আপনি তাদের থেকে মুক্ত হবেন। তাই যখন আপনার মধ্যে এই বিষয়টি বাস্তবায়িত হবে তখন আপনার মধ্যে এই আয়াত বাস্তবায়িত হবেঃ "তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল; তোমাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।" আর আপনি যেমন জানেন, এই বিষয়টি আল-

ওয়ালা ওয়াল-বারা'র অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি ঈমানের উপর ছিল -আমরা আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাই- অতঃপর মানুষের মধ্যে যে সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি সে অন্য পক্ষে থাকে (কুফরের পক্ষে) আপনার উপর আবশ্যক হল তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা– "তোমাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।" এই বিষয়টি আপনাকে বাধা দেয় না যে, আপনি তাকে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর দিকে আহ্বান করবেন এবং তার নিকট অস্পষ্ট থাকা হক্ব অথবা যে হক্ব থেকে সে বিমুখ হয়ে আছে আপনি তার কাছে তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করবেন। এ বিষয়টি তাকে আপনার দাওয়াহ দেওয়া থেকে বাঁধা দেয় না। কিন্তু আপনার উপর আবশ্যক হল আপনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ'র গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায় এমন প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন।

সাহাবীগণ এই মানের ছিলেন। এজন্যই আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ কুরআনে উল্লেখ করে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে ধরুনঃ বদর যুদ্ধে মুসআব ইবনে উমাইর رَضِيَاللّٰهُعَنْهُ - বন্দিদের মধ্যে তার এক ভাই ছিল যার নাম আযীয ইবনে উমাইর। তিনি একজন সাহাবীকে দেখলেন, তার ভাইকে শক্ত করে বাঁধছে। কারণ সে বন্দি ছিল। মুসআব এটা দেখে সাহাবীকে বললেন, তাকে শক্ত করে বাঁধো। কারণ তার মা বিত্তশালী। অতঃপর আযীয (তার বংশীয় ভাই) মুসআবকে বলল, এটাই কি আমার ব্যাপারে তোমার উপদেশ অথচ তুমি আমার ভাই? মুসআব বললেন, তুমি নও বরং সে আমার ভাই। যে তোমাকে বাঁধছে সে আমার ভাই। আর তুমি আমার ভাই নও। "তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।"

দ্বিতীয় শর্তঃ এই সকল দল সম্পর্কে আপনার জানার পর, এই সকল দল থেকে আপনার সম্পর্কচ্ছেদ করার পর এবং তাদের সাথে সম্পর্ক থেকে আপনার মুক্ত হওয়া ও তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আপনার উপর আবশ্যক হচ্ছে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ব্যতীত তাদের মা'বুদ তথা তাদের উপাস্যগুলোকে আপনার চেনা।

যেহেতু এগুলো হচ্ছে ভ্রষ্ট দল তাই আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ব্যতীত তাদের কিছু মা'বুদ

রয়েছে। আর আপনার উপর আবশ্যক হচ্ছে আপনি তাদের আক্বীদাহ-বিশ্বাস জানবেন যেন আপনি তাদের উপাস্যদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারেনঃ “তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।” প্রতিটি দলের জন্যই আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করার একটি ধরন থাকে। আপনার উপর আবশ্যক হল আপনি এই দল থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন এবং এই দলের মা’বুদ থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন। কিন্তু মা’বুদের মাস’আলার ক্ষেত্রে আমাদের উপর আবশ্যক হল আমরা দুইটি বিষয়ের মাঝে পার্থক্য করবঃ

কিছু মা’বুদ বা উপাস্য রয়েছে যেগুলোর সত্ত্বা থেকে আমরা সম্পর্কচ্ছেদ করব। অর্থাৎঃ সেগুলোর সত্ত্বা থেকে। আর কিছু উপাস্য রয়েছে যেগুলোর সত্ত্বা থেকে আমরা সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারব না। মা’বুদ যখন মূর্তি হবে অথবা পাথর বা গাছ হবে তখন আমরা এই মা’বুদের সত্ত্বা থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করব। অর্থাৎ আমরা তার জন্য কোন উলুহিয়্যাতের স্বীকৃতি দিব না–সে উপকার করতে পারে না এবং অপকার করতে পারে না।

আর কিছু মা’বুদ রয়েছে যাদের সত্ত্বা থেকে আমরা সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারব না। আপনি জানেন যে, খ্রিষ্টানরা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام -এর ইবাদাত করে। সুতরাং আমরা খ্রিষ্টানদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করব। কিন্তু ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام -এর সত্ত্বা থেকে আমার সম্পর্কচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। তাহলে কিভাবে আমি তাদের এ মা’বুদকে অস্বীকার করব? আমি ঈসার জন্য উলুহিয়্যাতের স্বীকৃতি দিব না। অর্থাৎ আল্লাহ তাকে তার নিকট উঠিয়ে নেওয়ার পর তিনি উপকার করতে পারেন না এবং অপকার করতে পারেন না।

এমনিভাবে আলী ইবনে আবী তালিব رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, হাসান এবং হুসাইন رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - আমরা এই সকল ব্যক্তিদের সত্ত্বা থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারি না। কারণ তারা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। আর আপনি জানেন যে, রাফিদীরা তাদের ইবাদাত করে। কিভাবে আমি রাফিদীদের মা’বুদদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করব?

অর্থাৎ আমি তাদের ব্যাপারে এ স্বীকৃতি দিব না যে, তারা ইলাহ–আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদাত করা হয়। আমরা তাদের ব্যাপারে এ স্বীকৃতি দিব না যে, তারা উপকার করতে পারেন অথবা তারা অপকার করতে পারেন অথবা তারা কল্যাণ দান করতে পারেন বা তারা অকল্যাণ দূর করতে পারেন। অতএব আমরা তোমাদের অস্বীকার করছিঃ “তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।”

এমনিভাবে শাইখ আব্দুল কাদীর জিলানী رَحِمَهُ اللهُ - আমরা তার সত্ত্বা থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারি না–আল্লাহই তার হিসাব গ্রহণকারী। কারণ তিনি আহলুস সুন্নাহ’র একজন আলেম হিসেবে পরিচিত। কিন্তু এই পথভ্রষ্ট দল তাকে প্রতীক বানিয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে এমন সব কল্পকাহিনী তৈরি করেছে যেগুলো আপনারাও জানেন না। তাই আমরা আব্দুল কাদীর জিলানীর সত্ত্বা থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করি না। কিন্তু আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার যে ইবাদাত করা হয়–তা থেকে আমরা সম্পর্কচ্ছেদ করি। অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাকে ডাকা হয়, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাকে মাধ্যম বানানো হয় এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার নিকট চাওয়া হয়। আমরা তার জন্য এ স্বীকৃতি দিব না যে, তিনি অনিষ্ট দূর করতে পারেন বা তিনি ক্ষতি করতে পারেন অথবা তিনি কল্যাণ দান করতে পারেন। “তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।”

আর আমাদের আলোচ্য বিষয় হল এই তাগুতী সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কেঃ আপনার উপর আবশ্যক হচ্ছে আপনি স্বয়ং এই সরকার ব্যবস্থা থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন–এই সরকার ব্যবস্থার প্রতিটি অবকাঠামো থেকে। আপনি তাদের মা’বুদদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন। আমরা পূর্বে বলেছি যে, তাদের মা’বুদ হল সংবিধান প্রণয়ন কমিটি। আপনার উপর ওয়াজিব হল আপনি এই সরকার ব্যবস্থা থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন এবং তাদের মা’বুদ সংবিধান প্রণয়ন কমিটি থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করবেনঃ “তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।” অর্থাৎঃ তোমরা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ কে বাদ দিয়ে

যাদের আনুগত্য কর।

তৃতীয়ঃ "আমরা তোমাদের অস্বীকার করছি।" আমরা তোমাদের অস্বীকার করছি–এর অর্থঃ অর্থাৎ তোমরা যে আক্বীদাহ-বিশ্বাসের উপর রয়েছো–আমরা তোমাদের জন্য তা স্বীকৃতি দিব না। আমরা রাফিদীদের জন্য তাদের দ্বীনের এবং তাদের আক্বীদাহ-বিশ্বাসের স্বীকৃতি দিব না। আমরা সূফী মতবাদের লোকদের জন্য তাদের দ্বীনের এবং তাদের আক্বীদাহ-বিশ্বাসের স্বীকৃতি দিব না। আমরা ইরাকী পার্টির জন্য তাদের আক্বীদাহ-বিশ্বাসের এবং তাদের দ্বীনের স্বীকৃতি দিব না। কেননা তাদের দ্বীন হচ্ছে গণতন্ত্র। আমরা এই তাগুতী সরকার ব্যবস্থার জন্য শাসনের ও কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দিব না। আমরা তাদেরকে শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দিব না। তারা যে আইন ও সংবিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালা বা শাসন করে–আমরা সেটারও স্বীকৃতি দিব না। অতএব "আমরা তোমাদের অস্বীকার করছি।" অর্থাৎঃ তোমরা যে বিষয়ের উপর রয়েছো সেব্যাপারে আমরা তোমাদেরকে স্বীকৃতি দিব না। আমরা তোমাদের জন্য কোন ক্ষমতার এবং কোন কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দিব না। সুতরাং যে ব্যক্তির মধ্যে এই শর্তটি বাস্তবায়িত হবে তার মধ্যে আল্লাহর নাবী ইবরাহীম عَلَيْهِالسَّلام কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে তৃতীয় শর্ত বাস্তবায়িত হবে।

চতুর্থ শর্তঃ "এবং তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা শুরু হল।" "بدا" তথা শুরু হল–এর অর্থঃ প্রকাশিত হল এবং স্পষ্ট হল। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহর নাবী ইবরাহীমকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে চায় এবং এই আয়াতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় তার উপর আবশ্যক হচ্ছে সে এই সকল তাগুতদের জন্য এবং এই সকল পথভ্রষ্ট দলের জন্য সামর্থ্যানুযায়ী শত্রুতা প্রকাশ করবে। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى আমাদের প্রত্যেকের সামর্থ্যের ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। এরপর আমরাও আমাদের সামর্থ্যের ব্যাপারে জ্ঞাত। এখানে কাঙ্ক্ষিত শত্রুতা হচ্ছে আপনি আপনার সামর্থ্যানুযায়ী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে এই তাগুতদের জন্য শত্রুতা প্রকাশ করবেন– "এবং তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা শুরু হল।" এখানে শত্রুতা হবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে। আর যে ব্যক্তি তাদের জন্য শত্রুতা প্রকাশ করবে না সে আল্লাহর নাবী ইবরাহীমকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণকারীদের

অন্তর্ভুক্ত নয়। অনিবার্যত সে তাগুতকে অস্বীকার করেনি– "এবং তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা শুরু হল।"

এব্যাপারে আব্দুল লতীফ আলুশ-শাইখ رَحِمَهُمُاللهُ -এর একটি উক্তি রয়েছে। শত্রুতা প্রকাশ করার মাস'আলায় আমি চমৎকার একটি উক্তি পড়ছিঃ আব্দুল লতীফ ইবনে আব্দুর রহমান আলুশ-শাইখ رَحِمَهُمُاللهُ বলেন, - আপনি যেমন জানেন তিনি হলেন শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব رَحِمَهُاللهُ -এর নাতী। তিনি 'আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ'তে বলেন, "এটা কল্পনাও করা যায় না যে, একজন ব্যক্তি তাওহীদ বুঝে এবং এর উপর আমল করে অথচ সে মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করে না। - কল্পনাও করা যায় না যে, হোক তারা পথভ্রষ্ট দল অথবা তাগুতী সরকার ব্যবস্থা তা সমান - আর যে ব্যক্তি তাদের সাথে শত্রুতা করে না তার ক্ষেত্রে এটা বলা হবে না যে, সে তাওহীদ বুঝে এবং এর উপর আমল করে।"[122] অতএব এই সকল ব্যক্তিদের সাথে শত্রুতা না করার সাথে তাওহীদকে তাওহীদ হিসেবে গণ্য করা হয় না। আপনার উপর ওয়াজিব হচ্ছে আপনি আপনার সামর্থ্যানুযায়ী এই সকল তাগুতদের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করবেন।

এরপর পঞ্চম শর্তঃ "ও বিদ্বেষ।" অর্থাৎ আপনি এই সকল তাগুতদের ব্যাপারে আপনার অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করবেন যে ব্যাপারে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ জ্ঞাত– "এবং তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হল।" আর আপনি জানেন যে, বিদ্বেষ পোষণ করা অন্তরের কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত। বিদ্বেষ ভালবাসার বিরোধী। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ﴿﴾

"আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে এমন কোন সম্প্রদায়কে আপনি পাবেন

[122] আদ-দুরারুস সানিয়্যাহঃ ৮/৩৫৯

না, তারা এমন ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করে, যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তারাই ঐ সকল লোক, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তার পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতসমূহে যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়।”[123]

এমনিভাবে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর বাণীঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَ عَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۝

“হে মু’মিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে, তারা তা অস্বীকার করে।”[124] অতএব আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে এই সকল ব্যক্তিদেরকে ভালবাসা–এ দু’টি বিষয় অন্তরে একত্রিত হতে পারে না। অন্তরে কেবলমাত্র একত্রিত হতে পারে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং এই সকল তাগুতদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা; কেননা বিদ্বেষ পোষণ করা আল্লাহর নাবী ইবরাহীমকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত।

আমি একটি ঘটনা উল্লেখ করছি যে ঘটনাটি আমার নিকট এক শাইখ বর্ণনা করেছেন - আমি আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর নিকট কামনা করি তিনি যেন তাকে ইল্লিয়্যিনে কবুল করেন। এটা শত্রুতা করা, বিদ্বেষ পোষণ করা এবং আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা’র মাস’আলা। তিনি বলেছেন, তাবেঈ আলেমগণের একজন খুরাসানে ছিলেন যার নাম বাহলুল। তিনি আমার কাছে এ ঘটনার সূত্র উল্লেখ করেননি। আমি তার থেকে এটা সরাসরি শুনেছি। তিনি বলেছেন, খুরাসানের সেই তাবেঈ আলেম তার এক গোলামকে দোকানীর কাছে পাঠালেন তার জন্য এক দিরহামের তেল

[123] সুরা মুজাদালাহঃ ২২

[124] সুরা মুমতাহিনাঃ ১

কিনতে। অতঃপর গোলামটি দোকানীর কাছে গিয়ে বলল, এক দিরহামের তেল দাও। আর দোকানী ছিল একজন খ্রিষ্টান। অতঃপর খ্রিষ্টান বলল, তেল কার জন্য? সে বলল, বাহলুলের জন্য। অতঃপর খ্রিষ্টান বলল, তুমি বিষয়টি খেয়াল কর– তোমরা যেমন বাহলুলকে তার দ্বীনের কারণে ভালবাসো আমরাও তাকে তার আখলাকের কারণে ভালবাসি। এই নাও দুই দিরহামের তেল। অর্থাৎ পরিমাণ বাড়িয়ে দিল। গোলাম তেল নিয়ে বাহলুল رَحِمَهُ اللهُ -এর কাছে ফিরে আসল। তিনি দেখতে পেলেন এক দিরহামে যা ক্রয় করা হয় তার থেকে বেশি পরিমাণ তেল রয়েছে। ফলে তিনি গোলামকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কী? সে বলল, খ্রিষ্টান ব্যক্তিটি যখন জানল যে, তেল আপনার তখন সে পরিমাণে দ্বিগুণ করে দিয়েছে। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, হে গোলাম! তুমি তেল নিয়ে খ্রিষ্টানের কাছে ফিরে যাও। কারণ আমি ভয় করছি যে, আমি যদি এই তেল খেতে থাকি তাহলে তার ব্যাপারে আমার অন্তরে কিছু মুহাব্বাত সৃষ্টি হবে। ফলে আমি ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব যাদের ব্যাপারে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন, “আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে এমন কোন সম্প্রদায়কে আপনি পাবেন না, তারা এমন ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করে যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র হয়।”

আল্লাহ সহায় হোন!! হে যুবকগণ! এই ধরনের ব্যক্তিদের মাধ্যমেই খুরাসানে দ্বীন পৌঁছেছে।

যে শাইখ আমার নিকট এই বিষয়টি আলোচনা করেছেন তিনি কারাগারে ছিলেন। তিনি বলেছেন, জেলার আমাদেরকে ডেকে পাঠালো যে, এক অফিসার কারাগার পরিদর্শনে এসেছে। আমরা ছিলাম তিনজন। তারা আমাদের জন্য চা নিয়ে আসল। আমাদের একজন সাইম তথা রোজাদার ছিলেন। আল্লাহ তাকে এই চায়ের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করেছেন। তৃতীয়জন পান করল। আর আমি পান করা থেকে বিরত থাকলাম। ফলে অফিসার আমাকে বলল, আপনি চা পান করছেন না কেন? আমি বললাম, তুমি যে চা নিয়ে এসেছো তা আমি পান করব না। সে বলল, আমরা কারাগারে যে চা দেই সেটা কেন পান করেন? আমি বললাম, সেটা এমন জিনিস

যেটাতে আমি সকলের সাথে অংশগ্রহণ করি। আর এই জিনিসটি তুমি আমার জন্য খাস করেছো। আমি এমন জিনিস চাই না যেটা তুমি আমার জন্য খাস করেছো।

এই ধরনের ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ জিহাদের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন এবং এদের হাতেই আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে অনেক বিজয় দান করেছেন।

হে যুবক ভাইগণ! কিছু আয়াত রয়েছে যখন আমরা সেগুলো পড়ি তখন আমরা সেগুলো অনুধাবন করতে পারি না যদি না আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি। বরং আমরা সে আয়াতগুলো পড়ব সাথে সাথে আমরা সেগুলো অনুধাবন করব এবং সেগুলোর উপর আমল করব; কেননা আমলহীন ইলমের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যখন ক্বিয়ামতের দিন আমাদের হিসাব নিবেন এবং আমরা তার সামনে দাঁড়াবো... আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর বাণীঃ "কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের পদদ্বয় একটু নড়তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে....... সে যে জ্ঞানার্জন করেছিল, তদানুসারে সে কী আমল করেছে?"[125] তিনি বলেননি, "সে যা বলেছে।" বরং "সে যে জ্ঞানার্জন করেছিল, তদানুসারে সে কী আমল করেছে?" সুতরাং সকল আয়াত আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ শুধু এজন্য নাযিল করেননি যে, এগুলো তিলাওয়াত করার মাধ্যমে আমরা ইবাদাত করব। বরং আমরা ইবাদাত করব, অনুধাবন করব এবং আমল করব। অতএব এভাবেই আমরা এই সকল তাগুতী সরকার ব্যবস্থাকে অস্বীকার করব। এই সকল তাগুতদের ব্যাপারে একজন মুসলিমের এই বিষয়টি জানা উচিৎ এবং এটাই তার করণীয়।

এই সকল তাগুতদের ব্যাপারে দ্বিতীয় করণীয়ঃ

আপনি লড়াইয়ের ধরনসমূহের কোন ধরন দিয়ে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করবেন না–না অস্ত্রের মাধ্যমে, না কথার মাধ্যমে, না ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে এবং না সাহায্য করার প্রকারসমূহের কোন প্রকারের মাধ্যমে। কারণ কখনো কখনো কথাও সাহায্য হয়। আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর থেকে একটি হাদিস বর্ণিত

[125] তিরমিযী বর্ণনা করেছেন

হয়েছে–আলেমগণের কেউ এই হাদিসটিকে হাসান বলেছেন এবং কেউ দূর্বল বলেছেন। তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি সামান্য কথার দ্বারাও কোনো মু’মিনের হত্যার ব্যাপারে সহযোগিতা করল, সে এমন অবস্থায় আল্লাহ তা’আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে যে, তার কপালের মধ্যে লেখা থাকবে- আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ।” তাহলে সাহায্য কখনো কখনো কথার মাধ্যমে হয়। “যে ব্যক্তি সামান্য কথার দ্বারাও কোনো মু’মিনের হত্যার ব্যাপারে সহযোগিতা করল, সে এমন অবস্থায় আল্লাহ তা’আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে যে, তার কপালের মধ্যে লেখা থাকবে- আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ।”[126] অতএব আমরা এই ব্যক্তিদের সাহায্য করব না। তাদেরকে রক্ষা করার জন্য আমরা লড়াই করব না। আমাদের উপর এই বিষয়টি জানা ওয়াজিব–সেটা লড়াই করার যে প্রকারেই হোক না কেন।

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাব থেকে এর দলিলঃ আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর বাণীঃ

اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا يُقَاتِلُوۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۚ وَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا يُقَاتِلُوۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ الطَّاغُوۡتِ فَقَاتِلُوۡۤا اَوۡلِيَآءَ الشَّيۡطٰنِ ۚ اِنَّ كَيۡدَ الشَّيۡطٰنِ كَانَ ضَعِيۡفًا ﴿۷۶﴾

“যারা মু’মিন তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর যারা কাফির তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল।”[127] ইনশা’আল্লাহ আমরা আগামীকাল এই আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করব।

<<উপস্থিত একজন হাদিসটি পুনরাবৃত্তি করার আবেদন করল>>

শাইখঃ হাদিসটি দূর্বল– “যে ব্যক্তি সামান্য কথার দ্বারাও কোনো মু’মিনের হত্যার ব্যাপারে সহযোগিতা করল, সে এমন অবস্থায় আল্লাহ তা’আলার সাথে

[126] ইবনে মাজাহ সুনানে বর্ণনা করেছেন। হদিস নং ২৬২০ সনদঃ ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ যুহরী থেকে তিনি সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব থেকে তিনি আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেছেন। যাহাবী رَحِمَهُ اللهُ বলেছেন, “এটা একটি বাতিল জাল হাদিস।”

[127] সুরা নিসাঃ ৭৬

সাক্ষাৎ করবে যে, তার কপালের মধ্যে লেখা থাকবে- আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ।” হাদিসটি দূর্বল। কতিপয় আলেম এটাকে সহীহ বলেছেন। যদি হাদিসটি সহীহ হয় তাহলে এ হাদিসটি আপনাকে আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর আরেকটি হাদিস স্মরণ করিয়ে দিবেঃ “তোমাদের কেউ তার আমলের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসুল আপনিও না? তিনি বললেন, আমিও না। তবে আল্লাহ আমাকে তার পক্ষ থেকে রহমত এবং অনুগ্রহ দ্বারা আচ্ছন্ন করে রেখেছেন।”[128]

অতএব আপনি রহমতের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। এই ব্যক্তির দুই চোখের মাঝে লেখা থাকবে - যদি হাদিসটি সহীহ হয় - সে আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ। তাহলে সাহায্য কখনো কখনো কথা বা শব্দের মাধ্যমেও হয়। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যদি আমাদের জন্য কাজকে সহজ করে দেন এবং আমাদের হায়াত দীর্ঘ করেন তাহলে ইনশা’আল্লাহ আগামীকাল এই আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করব বি-ইযনিল্লাহ।

এখানে তৃতীয় আরেকটি বিষয় রয়েছে এই তাগুতদের ব্যাপারে যা জানা আপনার উপর আবশ্যকঃ

আপনি তাদেরকে আপনার বিষয়ে কর্তৃত্ব দিবেন না। অর্থাৎ অমুক মন্ত্রী যখন কোন আদেশ জাড়ি করবে তখন আপনি এই আদেশে অন্তর্ভুক্ত হবেন না। কারণ আপনি মন্ত্রণালয়সমূহের কোন মন্ত্রণালয়কে অনুসরণ করবেন না।

এর দলিল আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাবে রয়েছেঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴿﴾

“যারা ঈমান এনেছে তাদের অভিভাবক আল্লাহ, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে

[128] মুত্তাফাকুন আলাইহি

আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরি করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত, সে তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।”[129] প্রত্যেক মুসলিমের এটাই করা উচিৎ। এই সকল তাগুতদের ব্যাপারে এটা জানা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব।

আরেকটি বিষয়ঃ

আপনার উপর আবশ্যক হল আপনি তাদেরকে বর্জন করবেন। অর্থাৎ আপনি সম্পৃক্ত হওয়ার ধরনসমূহের কোন ধরনের মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পৃক্ত হবেন না। আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** -এর কিতাব থেকে এর দলিলঃ আল্লাহ **تَبَارَكَ وَتَعَالَى** বলেছেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

“আমি প্রত্যেক উম্মাতের মাঝে রাসুল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তাগুতকে বর্জন করবে।”[130]

আপনি জানেন যে, পরিহার করার ক্ষেত্রে হারামের দলিলের চেয়ে পরিহার করার ক্ষেত্রে বর্জন করার দলিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। হারামের দলিলের চেয়ে বর্জন করার দলিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ; কারণ আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** যখন বলেছেন,

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾

“তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী।”[131] এ বিষয়টি সম্ভব যে, আমি একটি কামরায় উপস্থিত থাকব যে কামরায় মৃত বস্তু রয়েছে। আমি শারয়ী দিক থেকে এই কামরা ত্যাগ করতে বাধ্য নই। কিন্তু - আল্লাহ না করুন - যদি আপনি এমন স্থানে উপস্থিত হোন যে স্থানে এক চুমুক মদ (অল্প পরিমাণ মদ) থাকে

[129] সুরা বাকারাহঃ ২৫৭

[130] সুরা নাহলঃ ৩৬

[131] সুরা মায়িদাহঃ ৩

তাহলে আপনার জন্য ওয়াজিব হল আপনি সেই কামরা থেকে প্রস্থান করবেন। কেন? কারণ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন,

﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الأَنْصَابُ وَ الأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

“নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।[132] অর্থাৎ মদ আছে এমন স্থানে আপনার উপস্থিত থাকা আপনার জন্য জায়েয নয়। এজন্য আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর হাদিসে রয়েছে যে, তিনি ﷺ মদের সাথে সম্পৃক্ত সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে লা’নত করেছেনঃ মদ পানকারীর উপর, যে মদ পান করায় তার উপর, মদ বিক্রেতার উপর, মদ ক্রেতার উপর, মদ তৈরিকারীর উপর..... এই ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই অভিশপ্ত। কেন? কারণ তারা মদ বর্জন করেনি।[133]

অতএব আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যখন আমাদেরকে তাগুত বর্জন করার আদেশ করেছেন –অর্থাৎ আমরা যেন সম্পৃক্ত হওয়ার ধরনসমূহের যেকোনো ধরনের মাধ্যমে এই সকল ব্যক্তিদের সাথে সম্পৃক্ত না হই। আর চাকুরীর বিষয়টি - আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যদি আমাদের জন্য সহজ করে দেন আমরা অবশ্যই চাকুরী এবং মন্ত্রণালয়সমূহের স্তরে এই তাগুতী সরকার ব্যবস্থার সাথে থেকে চাকুরী করার ব্যাপারে আলোচনা করব বি -ইযনিল্লাহ। এই বিষয়টি জানাও আপনার জন্য ওয়াজিব।

সর্বশেষ যে বিষয়টি আপনার অবহিত হওয়া আবশ্যক [ইতিপূর্বে আমরা এর আলোচনা করেছি]

তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আপনার উপর ওয়াজিব। তাহলে আপনার উপর

---

[132] সুরা মায়িদাহঃ ৯০

[133] আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “রাসুলুল্লাহ ﷺ মদের উপর, মদ পানকারীর উপর, যে মদ পান করায় তার উপর, মদ বিক্রেতার উপর, মদ ক্রেতার উপর, মদ তৈরিকারীর উপর, মদের ফরমায়েশকারীর উপর, মদ বহনকারীর উপর এবং যার জন্য মদ বহন করা হয় তাদের উপর আল্লাহ লা’নাত করেছেন।”

আবশ্যক হল আপনি তাদেরকে অস্বীকার করবেন, আপনার উপর ওয়াজিব হচ্ছে আপনি তাদেরকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করবেন না, আপনার উপর ওয়াজিব হচ্ছে আপনি তাদেরকে আপনার বিষয়ে কর্তৃত্ব দিবেন না, আপনার উপর আবশ্যক হল আপনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন।

আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

﴿وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾

"আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়।"[134]

আমি আপনাদের নিকট এই সকল তাগুতদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মাস'আলায় ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ اللهُ -এর উক্তি নকৃল করছি...

ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ اللهُ তার কিতাব 'মাজমুউল ফাতাওয়া'তে বলেন, আপনি ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ اللهُ -এর উক্তি লক্ষ্য করুন- তিনি বলেছেন, "যে দল ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং ইসলামের প্রকাশ্য মুতাওয়াতির কতিপয় শারয়ী বিষয় থেকে নিবৃত্ত থাকে সকল মুসলিমগণের ঐক্যমতে সেই দলের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব যতক্ষণ না দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়। যেমন আবু বকর সিদ্দীক এবং সকল সাহাবীগণ যাকাত দিতে বাধাদানকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।" এটা লড়াই করার মাস'আলায় ইবনে তাইমিয়্যাহ'র উক্তির মূল অংশ।

তার আরো একটি উক্তি 'আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ' নামক কিতাবে রয়েছে তিনি বলেন, "ফক্বীহগণ ত্বইফাতুল মুমতানিআহ তথা নিবৃত্ত দলের ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছেন।" ত্বইফাতুল মুমতানিআহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলঃ এমন জামাআহ বা দল যে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শারয়ী বিষয়সমূহের মধ্য থেকে কোন শারয়ী বিষয় থেকে নিবৃত্ত থাকে যে অবস্থায় তাদের ক্ষমতা ও তাদের শক্তি রয়েছে। আপনি

[134] সুরা আনফালঃ ৩৯

শক্তির মাধ্যমে নিবৃত্ত দলের ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়্যাহ'র উক্তিটি লক্ষ্য করুন। এই সকল তাগুতরা শক্তির মাধ্যমে নিবৃত্ত রয়েছে - আপনি যেমন জানেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বারষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সাহওয়াত এবং সর্বশেষ এই সমস্যাটি হল এই হাশদে শা'বী - আল্লাহ এদের সকলকে লাঞ্ছিত করুন... আমরা আল্লাহর নিকট কামনা করি, তিনি যেন তাদেরকে হিদায়াত দান করেন এবং তাদেরকে হক্বের পথে নিয়ে আসেন। "ফক্বীহগণ ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছেন। যদি সেই দল ধারাবাহিকভাবে সুন্নাহ ছেড়ে দেয় যেমন ফজরের দুই রাকাআত। দুই বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে এ দলের বিরুদ্ধে লড়াই করা কি জায়েয হবে।" এটা হল ফজরের দুই রাকাআতের ক্ষেত্রে। যখন কোন দল শক্তির মাধ্যমে বিরত থাকবে–ফক্বীহগণের কেউ কেউ বলেছেন, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব এবং তাদের আরেক দল বলেছেন, না। আপনি ইবনে তাইমিয়্যাহ'র উক্তির সংযুক্তিটা লক্ষ্য করুনঃ "আর প্রকাশ্য ও ব্যাপক ওয়াজিব এবং হারাম বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ঐক্যমতে যুদ্ধ করা হবে।" এটা হল ঐক্যমতে। দ্বীনের মধ্যে প্রকাশ্য - যে সকল মাস'আলা আপনারা জানেন - ও ব্যাপক ওয়াজিব এবং হারাম বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ঐক্যমতে যুদ্ধ করা হবে। অর্থাৎ সকল মুসলিমগণ ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে একমত যদি সেই দল দ্বীনের ওয়াজিব বিষয়সমূহের কোন একটি থেকে বিরত থাকে অথবা দ্বীনের হারাম বিষয়সমূহের কোন একটি সম্পাদন করে।

'আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ' নামক কিতাবে ইবনে তাইমিয়্যাহ'র তৃতীয় আরেকটি উক্তি রয়েছে। ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ الله বলেন, "সুতরাং কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মাহ'র ইজমা সাব্যস্ত হয়েছে যে, এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে যে ইসলামের শারীয়াহ থেকে বের হয়ে যায়। যদিও সে দুই শাহাদাহ উচ্চারণ করে।"

সুতরাং আমাদেরকে যেন বলা না হয় কিভাবে তোমরা যুদ্ধ কর অথচ এই ব্যক্তিরা সালাত পড়ে, সিয়াম রাখে এবং সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। কারণ তারা যদি এই সকল বিষয় সম্পাদনও করে তাহলে তারা এমন বিষয়ও সম্পাদন করে যা তাদেরকে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আল্লাহ আপনাদের উত্তম জাযা দান করুন এবং আপনাদেরকে বারাকাহ দান করুন!

আনুগত্যের শিরক সংক্রান্ত উৎকর্ষ বিবরণ

শাইখ আবু আলী আল-আনবারী
আল-কুরাইশী رحمه الله

নবম দারসঃ

অস্ত্রের মাধ্যমে তাগুতদের সাহায্যকারীদের বাস্তবতা কী? এবং তাদের ব্যাপারে শারীয়াহ'র হুকুম কী?

الحَمدُ للّه والصّلاةُ والسّلامُ على رسُولِ اللّه؛

হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে হক্বকে হক্ব হিসেবে দেখান এবং হক্ব অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করুন, বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখান এবং বাতিল বর্জন করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদের এমন বিষয় শিক্ষা দিন যা আমাদের উপকার করবে এবং আপনি আমাদের যা শিক্ষা দেন এর মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে আমাদের ইলম অনুযায়ী আমলকারী বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন আমাদের ইলমকে আমাদের জন্য দলিল বানিয়ে দিন এবং আমাদের বিরুদ্ধে দলিল বানাবেন না - - ইয়া আরহামার-রহিমীন! হে আমার রব! আপনি আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিন, আমার বিষয়াদি সহজ করে দিন এবং আমাদের মুখের জড়তা দূর করে দিন যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে। হে আল্লাহ আপনি আমার কর্মকে সৎ বানিয়ে দিন, আপনার সন্তুষ্টির জন্য খালিছ করে দিন এবং আপনার সৃষ্টির কারো জন্য এতে কোন অংশ রাখবেন না।

অতঃপর,

আমরা এই সকল সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা শেষ করেছি। আমরা জেনেছি যে, এ সরকার ব্যবস্থার শারয়ী নাম হল তাগুতী সরকার ব্যবস্থা। আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে আজ আমাদের আলোচনা হবে তাগুতদের সাহায্যকারীদের নিয়ে। আপনি যেমন জানেন, তাগুতদের সাহায্যকারীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্তঃ

এক শ্রেণী যারা তাগুতদেরকে অস্ত্রের মাধ্যমে সাহায্য করেঃ এই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হবে কোন পার্থক্য করা ছাড়াই প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সকল অবকাঠামো এবং যে তাদেরকে সাহায্য করে। আরো অন্তর্ভুক্ত হবে–ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্ - যারা সাহওয়াত নামে পরিচিত, বর্তমানে যারা হাশদে শা'বী নামে

পরিচিত। এই সকল ব্যক্তিদের প্রত্যেককেই অভিহিত করা হয়–অস্ত্রের মাধ্যমে তাগুতদের সাহায্যকারী। **এটা হল প্রথম শ্রেণী।**

দ্বিতীয় শ্রেণীঃ কথার মাধ্যমে তাগুতদের সাহায্যকারী। এই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হবে তথ্য মন্ত্রণালয়। এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যে কোন বিষয় লেখালেখি করে বা প্রচার করে অথবা কোন ফোটো বা এই সকল তাগুতী সরকার ব্যবস্থার ভিত্তিসমূহকে শক্তিশালীকরণের জন্য সকল গণমাধ্যমের কোন একটিতে এই সকল বিজ্ঞপ্তিসমূহের যেকোনোটি প্রচার করে যেমন ভিডিও, অডিও, প্রতিবেদন–এই ব্যক্তিদেরকে কথার মাধ্যমে তাগুতদের সাহায্যকারী হিসেবে গণ্য করা হবে। এই ব্যক্তিদের সাথে মাসজিদসমূহের কতিপয় খতিবরা অন্তর্ভুক্ত হবে–যারা এই তাগুতী রাষ্ট্রের ভিত্তিসমূহ শক্তিশালীকরণের দিকে আহ্বান করে। আর মুসলিমদের সকল দেশগুলোতে এদের সংখ্যা অনেক। অতএব তথ্য মন্ত্রণালয় এবং কতিপয় খতিব–এদেরকে কথার মাধ্যমে তাগুতদের সাহায্যকারী হিসেবে গণ্য করা হবে। ইনশা'আল্লাহ আমরা আলোচনা শুরু করবঃ

অস্ত্রের মাধ্যমে তাগুতদের সাহায্যকারীদের বাস্তবতা কী? এবং এদের ব্যাপারে শারীয়াহ'র হুকুম কী?

আমি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাহায্যে বলছিঃ আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর কিতাবে একটি আয়াত রয়েছে–আয়াতের ভাষ্য হচ্ছেঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا۝

"যারা মু'মিন তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর যারা কাফির তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল।"[135]

---

[135] সুরা নিসাঃ ৭৬

এই আয়াতে কারীমা কিছু মাস'আলা এবং কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছেঃ

প্রথমতঃ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ দুইটি দলের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এই দুই দলের প্রত্যেকটি দলের কর্ম উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি এই দুই দলের প্রত্যেকটি দলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি এই আয়াতে প্রতিটি দলের হুকুম উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি প্রথম দলের মাঝে এবং দ্বিতীয় দলের মাঝে বন্ধন উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি এই দুই দলের প্রতিটি দলের পরিণাম উল্লেখ করেছেন। এই সবগুলো বক্তব্যই এই আয়াতে কারীমার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বিস্তারিত ব্যাখ্যা কী?

আমরা বলেছি যে, আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى এই আয়াতে কারীমায় দুইটি দলের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম হল আয়াতের শুরুতে এরকমই রয়েছে—আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদের সম্পর্কে বলেছেন, "যারা মু'মিন তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে।" এটা হল প্রথম দল। দ্বিতীয় দলঃ আল্লাহ বলেন, "আর যারা কাফির তারা তাগুতের পথে লড়াই করে।" এটা দ্বিতীয় দল।

আমরা প্রাথমিকভাবে প্রথম দলের নিকট অবস্থান করবঃ আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى প্রথম দলের ব্যাপারে বলেছেন, "যারা মু'মিন।" এখানে ঈমান উদ্দেশ্য। এই আয়াতে ঈমানের গণ্ডিতে যে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এই আয়াতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যে অন্তর্ভুক্ত হবেঃ

''যারা মু'মিন''—এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলঃ যে ব্যক্তি আক্বীদাহ'র ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ'র মানহাজের উপর থাকবে। আমি এর দ্বারা বুঝাচ্ছিঃ একজন মুসলিম বিশ্বাস করবে যে, ঈমান হল কথা এবং আমলের সমন্বয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ'র আক্বীদাহ হলঃ ঈমান শুধুমাত্র মুখের কথা এবং অন্তরের সত্যায়নের উপর সীমাবদ্ধ নয়। এর সাথে যুক্ত হবে আমল। কারণ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ'র নিকট আমল ঈমানের পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত।

যখন আমরা এই বক্তব্য বলব তখন এই আয়াতের নির্ধারিত ব্যক্তিদের থেকে মুরজিয়ারা বের হয়ে যাবে। কারণ তারা আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য

করে না। তারা সাধারণভাবে আমলকে ঈমান পূর্ণতার শর্তের অন্তর্ভুক্ত মনে করে। অর্থাৎ একজন মানুষ যখন তার মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে এবং অন্তরে এ কালিমাকে সত্যায়ন করবে এরপর সে আমল করবে কি করবে না—এটা বিবেচ্য হবে না। যদি সে আমল করে তাহলে তার ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে। আর যদি সে আমল না করে তাহলে তার ঈমান হ্রাস পাবে। কিন্তু তারা আমলের কারণে কোন ব্যক্তিকে মিল্লাহ থেকে বের করে দেয় না। কারণ মুরজিয়াদের নিকট আমল ঈমানের পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আর খারিজিরা এর বিপরীত অবস্থানে রয়েছে; কারণ যে ব্যক্তি কোন একটি আমল ছেড়ে দেয় হোক সেটা ঈমান পূর্ণ হওয়ার আমলের অন্তর্ভুক্ত বা আবশ্যকীয় ঈমান পূর্ণ হওয়ার আমলের অন্তর্ভুক্ত অথবা সেই আমল আসলুল ঈমান তথা ঈমানের ভিত্তির অন্তর্ভুক্ত তা সমান - তারা তাকে মিল্লাহ থেকে বের করে দেয়। পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাহ এদের মতো নয় এবং ওদের মতো নয়। কারণ এদের মতে ঈমান হল এমন কথা যা আমরা বর্ণনা করেছি।

তারা যখন আমলের নিকট আসে তখন তারা আমলকে তিন ভাগে বিভক্ত করেঃ কিছু আমল রয়েছে—যেগুলো মুস্তাহাব ঈমানের অন্তর্ভুক্ত অথবা এমন আমল—যেগুলো মুস্তাহাব পূর্ণ হওয়ার অন্তর্ভুক্ত। সকল মুস্তাহাব আমল ঈমান পূর্ণ হওয়ার অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে সকল ওয়াজিব আমল করা আপনার উপর আবশ্যক। যদি এগুলো সম্পাদন করা হয় তখন সেটা ঈমান পূর্ণ হওয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ ঈমান বৃদ্ধি পাবে এবং ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে। ঈমানের তৃতীয় আরেকটি প্রকার রয়েছে যেটা আসলুল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আসলুল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত কোন আমল যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তখন মানুষ মিল্লাহ থেকে বের হয়ে যাবে। আসলুল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কাজও যদি সে সম্পাদন করে তাহলেও সে মিল্লাহ থেকে বের হয়ে যাবে।

অতএব ঈমান হল কথা এবং আমলের সমন্বয়ে। সুতরাং আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর বাণীঃ "যারা মু'মিন।" তাদের দ্বারা উদ্দেশ্য হল এরা—অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ।

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এই দলের কর্ম উল্লেখ করেছেন। অবশ্যই এর সাথে যুক্ত হবে যে, যার মাঝে দু'আর শিরক আছে সে এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। যার মধ্যে দু'আর শিরক আছে সে এই আয়াতে "যারা মু'মিন"–এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। এমনিভাবে যার মধ্যে আনুগত্যের শিরক আছে সেও এই আয়াতের নির্ধারিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

একজন প্রশ্ন করে বললঃ হে শাইখ! খারিজিরা কি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে না?

শাইখঃ না, খারিজিদেরকে কেবলমাত্র তিনজন আলেম তাকফীর করেছেন। মুসলিমগণ একমত যে, খারিজিরা মুসলিম। কিন্তু তারা বাগী তথা বিদ্রোহী। আলী ইবনে আবী তালিব رَضِيَاللهُعَنْهُ তাদেরকে তাকফীর করেননি। তাদেরকে তাকফীর করেছেন ইবনুল আরাবী এবং অন্যান্য আলেমগণের মধ্য থেকে কেবল দুইজন তাদেরকে তাকফীর করেছেন। আর বাকি আলেমগণ একমত যে, খারিজিরা মুসলিম; এজন্য যখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তখন বাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ন্যায় যুদ্ধ করা হয় মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত নয়।

অতএব "যারা মু'মিন।" আপনি জানলেন যে, আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সম্বোধন "যারা ঈমান আনে"–এর মধ্যে যে অন্তর্ভুক্ত হবে সে হল, যে বলে ঈমান হল কথা এবং আমলের সমন্বয়ে, যার মধ্যে দু'আর কোন শিরক থাকবে না, আনুগত্যের কোন শিরক থাকবে না অথবা ভালবাসা অথবা ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের কোন শিরক থাকবে না। এটা হল প্রথম মাস'আলা।

দ্বিতীয় মাস'আলাঃ মু'মিনদের এই দলের কর্ম হচ্ছে তারা লড়াইকারী হবে। "যারা মু'মিন তারা লড়াই করে।" অতএব মু'মিনদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আমার উল্লেখিত গুণের - ঈমান হল কথা ও আমলের সমন্বয়ে এবং শিরকের কোন অস্তিত্ব থাকবে না - এ গুণের উপর থাকবে কিন্তু সে যুদ্ধ করে না তাহলে এই ব্যক্তি এই আয়াতের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আপনি জানেন যে, মানুষ নিজ নফসকে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাবের সামনে পেশ করে। যখন আপনি কোন একটি

আয়াত পাঠ করবেন তখন নিজেকে প্রশ্ন করুন এই আয়াতের ব্যাপারে আমি কোথায়? এবং আমার ব্যাপারে এই আয়াত কোথায়? আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন, “যারা মু’মিন তারা লড়াই করে।” সুতরাং যে ব্যক্তি যুদ্ধ করেনি সে এই আয়াতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদের যুদ্ধ করার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। অতএব তারা হবে মু’মিন, তাদের সিফাত হবে–তারা যুদ্ধ করবে। উপরন্তু তাদের যুদ্ধের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে। আল্লাহর রাস্তা ব্যতীত যুদ্ধের কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তাদের নেই। কারণ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এই আয়াতে এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন।

“তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে”–এর অর্থ কী? আবু মুসা আল-আশআরী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -এর হাদিস ইমাম বুখারি رَحِمَهُ الله বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, “এক ব্যক্তি নাবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল, এক ব্যক্তি গনীমতের জন্য লড়াই করে, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য লড়াই করে এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখানোর জন্য লড়াই করে। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে লড়াই করল? তিনি বললেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর কলিমা বুলন্দ হওয়ার জন্য লড়াই করে সে-ই আল্লাহর পথে লড়াই করল।” ইমাম মুসলিম رَحِمَهُ الله আরো কিছু রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারি رَحِمَهُ الله কিছু রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেনঃ “যে ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে, যে ব্যক্তি গোত্রের স্বার্থ রক্ষার জন্য লড়াই করে।”

অতএব এই মু’মিন দলের যুদ্ধ করার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল তারা আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করে। তাহলে “যারা মু’মিন তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে।” তারা হল এই দল। আর যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে না সে এই দলের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আপনি যখন ফিরক্বাতুন নাজিয়াহ তথা নাজাতপ্রাপ্ত দলের এবং ত্বইফাতুল মানসুরাহ বা সাহায্যপ্রাপ্ত দলের ব্যাপারে আলোচনা করবেন তখন দেখবেন প্রত্যেকেই দাবি করে সে ফিরক্বাতুন নাজিয়াহ’র অন্তর্ভুক্ত। এমনকি ইরাকী পার্টি

দাবি করে তারা ফিরক্বাতুন নাজিয়াহ। মুরজিয়ারা দাবি করে তারা ফিরক্বাতুন নাজিয়াহ; কারণ তারা কিছু আয়াত গ্রহণ করেছে এবং কিছু হাদিস গ্রহণ করেছে। কিন্তু ফিরক্বাতুন নাজিয়াহ'র মাঝে এবং এই লোকদের মাঝে পার্থক্যকারী বিষয় হচ্ছেঃ যুদ্ধ।

এর দলিলঃ ইমাম মুসলিম رَحِمَهُاللهُ বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মাতের একদল লোক হক্বের উপর দৃঢ় থেকে বিজয়ীরূপে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে।" অতএব উদ্দিষ্ট দল হচ্ছে যে দল ক্বিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। এ দলের বুনিয়াদি বৈশিষ্ট্য হল তারা লড়াইকারী হবে। সহীহ মুসলিমে ইমাম মুসলিম رَحِمَهُاللهُ -এর বর্ণনায় যুদ্ধ উল্লেখ করেননি। এই দল সম্পর্কে সহীহ মুসলিম ব্যতীত অন্য কিতাবে রয়েছেঃ "আমার উম্মাতের একটি দল..." কিন্তু রাসুল ﷺ যুদ্ধ উল্লেখ করেননি।

সহীহ মুসলিমে আরো একটি হাদিস রয়েছে রাসুল ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মাতের একটি দল আল্লাহর বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে লড়াই করে যাবে। তারা তাদের শত্রুদের মোকাবিলায় অত্যন্ত প্রতাপশালী হবে। যারা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবে চলতে চলতে তাদের নিকট ক্বিয়ামত এসে যাবে আর তারা এর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" এ থেকে আমি বুঝতেছি যে, এই দল ক্বিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে এবং এ দল যুদ্ধ করবে মানুষ তাদেরকে সাহায্য করুক বা তাদেরকে সাহায্য করা বর্জন করুক তা সমান—এই বিষয়টি তাদেরকে উদ্বিগ্ন করবে না। সর্বদাই আপনি তাদেরকে দেখবেন তারা হক্বের উপর বিজয়ী, তারা হক্বের উপর রয়েছে এবং আপনি দেখবেন হক্বও তাদের সাথে রয়েছে। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এই আয়াতে যে প্রথম দলের কথা উল্লেখ করেছেন এগুলো হচ্ছে তাদের বৈশিষ্ট্য।

আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি উল্লেখ করছিঃ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এই সকল ব্যক্তিদের ব্যাপারে ঈমানের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "যারা মু'মিন।" সুতরাং যে ব্যক্তি অস্ত্র ধারণ করে এবং আল্লাহর কালিমা বুলন্দ

হওয়ার জন্য লড়াই করে এই আয়াতের চাহিদা অনুসারে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তার জন্য ঈমানের সাক্ষ্য দেন; কারণ সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শর্তসমূহ আদায় করে এবং ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য লড়াই করে। আর যে ব্যক্তি ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহের কোন একটির সাথে জড়িয়ে পড়ে সে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর দ্বীনকে সাহায্য করার জন্য এবং আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হওয়ার জন্য লড়াই করবে–এটা সম্ভব নয়। আপনি দেখতে পাবেন যে, সূফী মতবাদের লোকেরা এক সময় অস্ত্র ধরেছিল। এই ব্যক্তিরা আল্লাহর পথে লড়াই করে না। এই প্রমাণের ভিত্তিতে যে, - আল্লাহ না করুন - আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যখন তাদেরকে কোন ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব দান করবেন তখন আপনি দেখবেন মাজারগুলো ঐ সমস্ত ভূমিতে ছড়িয়ে পড়বে, শিরকী বিষয়গুলো বিস্তৃত হবে এবং তারা অবশ্যই মানুষকে শিরকী বিষয়সমূহ শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়গুলো খুলে দিবে। অতএব এই সকল ব্যক্তিরা আল্লাহর পথে এবং আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হওয়ার জন্য লড়াই করেনি।

এমনিভাবে ইরাকী পার্টি - যখন চিন্তা করেছে - একটা সময় অস্ত্র ধরবে অথবা মিসরের ইখওয়ান - যখন চিন্তা করেছে - একটা সময় অস্ত্র ধরবে তারা কখনোই আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হওয়ার জন্য অস্ত্র ধরবে না। মিসরের দৃশ্যগুলো আপনার সামনে স্পষ্ট। চোখের পলকে একদিনে তাদের চার হাজার লোক নিহত হয়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল গণতন্ত্রের জন্য এবং আইনসিদ্ধ বিষয় ফিরিয়ে আনার জন্য!! আর আইনসিদ্ধ বিষয় দ্বারা তারা উদ্দেশ্য করেঃ মুরসী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছে তাই তাদের কর্তব্য যে, তারা মুরসীকে শাসনে ফিরিয়ে আনবে। কারণ এটাই হল শাসনের ক্ষেত্রে আইনসিদ্ধ পদ্ধতি!! অতএব যদিও তারা অস্ত্র ধরেছে কিন্তু তারা এই আয়াতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত নয়; কেননা তারা আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হওয়ার জন্য আল্লাহর পথে লড়াই করে না।

এই সকল দলের ব্যাপারে আমার উল্লেখ করার কারণ হলঃ আমি শুধুমাত্র চাচ্ছি আপনি পার্থক্য করবেন–এই সকল লোকদের ব্যাপারে আপনার অবস্থান কোথায়? **অতএব এটা হল প্রথম দল।**

আমরা দ্বিতীয় দলের ব্যাপারে আসি। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন, "আর যারা কাফির তারা লড়াই করে।" অতএব দ্বিতীয় দলটিও যোদ্ধা বা লড়াইকারী দল। অর্থাৎ অস্ত্র ধরা অথবা অস্ত্র ধরার ব্যাপারে সাহায্যকারী হওয়া। "আর যারা কাফির তারা লড়াই করে।" আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদের লড়াই করার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আর যারা কাফির তারা তাগুতের পথে লড়াই করে।"

আমরা বিগত দিনে ঐক্যমত হয়েছিলাম যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত শাসনকারী মুরতাদ সরকার ব্যবস্থাগুলো হচ্ছে তাগুতী সরকার ব্যবস্থা। এই বিষয়টির ক্ষেত্রে দুইজন মুসলিমও ইখতিলাফ করে না। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর এবাণীর দলিলের ভিত্তিতেঃ

﴿يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْۤا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَ قَدْ اُمِرُوْۤا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ﴾

"তারা তাগুতের কাছে বিচার চাওয়ার ইচ্ছা করে, অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন তা অস্বীকার করে।"[136] এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ'র আলেমগণের বুঝের দলিলের ভিত্তিতে। যেমন ইবনুল ক্বাইয়্যিম رَحِمَهُ الله 'ইলামুল মুআক্বীয়ীন'এ বলেছেন, "প্রত্যেক সম্প্রদায়ের তাগুত ঐ ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসুলকে বাদ দিয়ে যার নিকট বিচার চাওয়া হয়।" মুজাহিদ رَحِمَهُ الله -এর বুঝের দলিলের ভিত্তিতে তিনি বলেছেন, "তাগুত হল মানুষের সুরতে শয়তান যার নিকট তারা বিচার চায়।" এমনিভাবে ইমাম মালিক رَحِمَهُ الله -এর ব্যাখ্যা যেমনটি কুরতুবী رَحِمَهُ الله নকল করেছেন। অতএব আহলুস সুন্নাহ'র আলেমগণ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত বিচার-ফায়সালা বা শাসনকারীকে তাগুত নামের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এব্যাপারে ইখতিলাফ নেই। সুতরাং আমরা যখন আয়াতে আসব আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেনঃ "আর যারা কাফির তারা তাগুতের পথে লড়াই করে।" অর্থাৎ এই সকল সরকার ব্যবস্থার পক্ষে–দেশে তাদের ভিত্তিসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং

---

136 সুরা নিসাঃ ৬০

তাগুতের কালিমা বুলন্দ হওয়ার জন্য।

কিভাবে আমি তাগুতের পথে লড়াই করা বুঝব? “আর যারা কাফির তারা তাগুতের পথে লড়াই করে।” এখানে “তাগুতের পথ”—এর অর্থ কী?

‘আল্লাহর পথে’—আমি বুঝলাম। যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হওয়ার জন্য লড়াই করে সে আল্লাহর পথে লড়াই করে। আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর হাদিসের মাধ্যমে আমি বুঝেছি তাগুতের পথে লড়াই করার অর্থ কী। এরকম হবেঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হওয়ার জন্য লড়াই করে সে আল্লাহর পথে লড়াই করে”; অতএব যে ব্যক্তি তাগুতের কালিমা বুলন্দ হওয়ার জন্য লড়াই করে সে তাগুতের পথে লড়াই করে।

নিশ্চিতভাবেই তাগুতের পথ এবং তাগুতের কালিমা দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল বিবৃতি নয় যেগুলো তারা টিভি-চ্যানেলে প্রকাশ করে। তাগুতের কালিমা দ্বারা উদ্দেশ্য হলঃ আইন ও সংবিধান; কারণ তাগুত হল একটা ব্যক্তি যে চলে যাবে। কিন্তু সংবিধান ও আইন অবশিষ্ট থাকবে। প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে যতই ধ্বংস করা হয় মন্ত্রণালয় দু’টি টিকে থাকে। এই দুই মন্ত্রণালয়ের সদস্যরা সর্বদাই তাগুতের কালিমা বুলন্দ হওয়ার জন্য লড়াই করে; তাহলে তারা নিশ্চিতভাবেই সংবিধান সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে যাতে করে এই সমস্ত আইন ও এই সমস্ত সংবিধান দ্বারা মানুষ এবং দেশ শাসন করা যায়।

আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى এই সকল ব্যক্তিদের গুণ বর্ণনা করে বলেন, “আর যারা কাফির তারা তাগুতের পথে লড়াই করে।” তিনি কাজের এবং আমলের পূর্বে হুকুম উল্লেখ করেছেন। কেন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন, “যারা কাফির তারা তাগুতের পথে লড়াই করে”? কেন তিনি বলেছেনঃ “যারা কাফির”? কেন কাজের উপর হুকুমকে অগ্রবর্তী করেছেন?

কারণ কুরআন আরবদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। আর আরবরা সর্বদাই যে বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় তারা সেই বিষয়টিকে শুরুতে অগ্রবর্তী করে। এগুলো হল তাৎপর্য পৌঁছে দেয়ার জন্য আরবদের রীতি। যেমন ধরুন আমি যদি

বলি, "ذهب أحمد إلى السوق" তথা “আহমাদ বাজারে গিয়েছে।” একজন আরব বুঝবে যে, আমি “যাওয়ার” বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। কারণ আমি “যাওয়া”কে শুরুতে উল্লেখ করেছি। আর আমি যদি বলি, "إلى السوق ذهب أحمد" তথা “আহমাদ বাজারে গিয়েছে।” এর অর্থ হলঃ আমি বাজারকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। কারণ আমি বাজারকে শুরুতে উল্লেখ করেছি। আর যখন আমি বলি, "أحمد ذهب إلى السوق" তথা “আহমাদ বাজারে গিয়েছে।” আমি আহমাদকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি; অতএব আরবি ভাষার ক্ষেত্রে তারা এভাবেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উল্লেখ করে অতঃপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উল্লেখ করে। আর আমাদের রবের কিতাব আরবদের ভাষাতেই নাযিল হয়েছে। তাগুতদের সাহায্যকারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট এই আয়াতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাদের হুকুম। তাই আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ সাবধান করার জন্য, সতর্ক করার জন্য, তিরস্কার করার জন্য এবং ধমকি দেওয়ার জন্য আমলের উপর হুকুমকে অগ্রবর্তী করেছেনঃ “আর যারা কাফির তারা তাগুতের পথে লড়াই করে।”

সুতরাং আপনি জানেন যে, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে তাগুতের কালিমা “সংবিধান ও আইন” বিজয়ী হওয়ার জন্য লড়াই করে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাকে কুফরের হুকুম দিয়েছেন। অর্থাৎ এই তাকফীর তথা এই কাফির সাব্যস্তকরণ কোন মানুষের নয়। এটা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাবে ওহীকৃত আল্লাহ প্রদত্ত কাফির সাব্যস্তকরণ। তাই আমরা যখন বলি, প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, হাশদ এবং সাহওয়াতরা মুরতাদ তখন হুকুমদাতা আমি নই। আমি কেবল একটি হুকুম নকল করছি যে হুকুম আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ সাত আসমানের উপর থেকে দিয়েছেন। আর নকলকারীকে দোষারোপ করা সম্ভব নয়।

আমরা যখন জানলাম যে, এই সকল ব্যক্তিরা কাফির। তখন - খবিছ মুরজিয়াদের মত অনুসারে এটা কি বড় কুফর যা মিল্লাহ থেকে বের করে দেয় নাকি ছোট কুফর - এটা কি ‘কুফর দুনা কুফর’ তাগুতদের ব্যক্তিরা যার সাথে ঝুলে থাকে?

এখানে উল্লেখিত কুফর হল বড় কুফর যা মিল্লাহ থেকে বের করে দেয়।

এব্যাপারে দলিল অসংখ্যঃ

প্রথমতঃ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এই দল সম্পর্কে বলেছেন যে, এই দল তাগুতের পথে লড়াই করে। আর তাগুতের পথে লড়াই করার অর্থ কী–তা আপনি জেনেছেন। অর্থাৎ অস্ত্র বহন করা–যেন আইন ও সংবিধান দ্বারা আল্লাহর বান্দাদেরকে এবং দেশসমূহকে শাসন করা হয়। এব্যাপারে কেউ ইখতিলাফ করবে না। আর এটা একটি কুফরির কারণ; কেননা একজন ব্যক্তি যখন অস্ত্র ধরে – ঐ মুশরিক যে আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর যামানায় যুদ্ধ করত যেন জাহিলী বিধিবিধান দ্বারা শাসন করা যায় - তার মাঝে এবং বর্তমান সময়ের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, হাশদ এবং সাহওয়াতদের মাঝে কী পার্থক্য আছে? এ দু'য়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। ঐ ব্যক্তিরা জাহিলী বিধিবিধান দ্বারা শাসন করার জন্য লড়াই করত আর এই ব্যক্তিরা লড়াই করে যেন খোদ মুসলিমদেরকে শাসন করতে পারে, যেন তারা জাহিলী বিধিবিধান দ্বারা শাসন করতে পারে। অতএব এটা একটি কুফরির কারণ। যে ব্যক্তি তাগুতের পথে লড়াই করে - আর আমরা তাগুতের পরিচয় কী–তা জেনেছি - একজন খবিছ মুরজিয়া অথবা একজন খবিছ ইখওয়ানপন্থী লোক ব্যতীত কেউ এব্যাপারে ইখতিলাফ করবে না যে, এই সকল ব্যক্তিরা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর দ্বীন থেকে মুরতাদ। এটা হল কুফরির প্রথম কারণ।

কুফরির দ্বিতীয় কারণঃ বক্তব্যের ইশারা থেকে বুঝা যায়। বক্তব্যের ইশারা যেমন উছূল শাস্ত্রের আলেমগণ এর পরিচয় দিয়েছেনঃ এমন শব্দ যা তার উদ্দিষ্ট অর্থ ব্যতীত অন্য আবশ্যকীয় অর্থের উপর দালালত করে এবং বাক্য সঠিক হওয়া ও বিশুদ্ধ হওয়া এর উপর নির্ভর করে না।

আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর বাণীঃ

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾

"আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে।"[137] এটি একটি

[137] সুরা বাকারাহঃ ২৩৩

স্পষ্ট আয়াত। অন্য আরেক আয়াতে রয়েছেঃ

﴿وَ حَمۡلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوۡنَ شَهۡرًا ؕ﴾

“আর তার গর্ভ ধারণ ও তার দুধ ছাড়ানোর সময় ত্রিশ মাস।”[138] এই দুই আয়াত একত্র করার দ্বারা যে বক্তব্য ইঙ্গিত করে তাতে আপনি বলতে পারেন, কোন শিশু যদি ছয় মাসে জন্মগ্রহণ করে তাহলে তার জন্ম শারয়ীভাবে গণ্য করা হবে। কোন অবস্থাতেই যিনা-ব্যভিচারের সন্তান হিসেবে গণ্য করা হবে না। কেন?; কারণ “আর তার গর্ভ ধারণ ও তার দুধ ছাড়ানোর সময় ত্রিশ মাস।” “আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু’বছর দুধ পান করাবে।” ত্রিশ মাস থেকে চব্বিশ মাস বাদ দিলে ছয় মাস থাকে। কোন শিশু যখন ছয় মাসে জন্মগ্রহণ করবে তখন এই শিশু শারয়ী পদ্ধতিতে জন্মগ্রহণ করেছে। পিতা এই সন্তানের সম্পর্ক অস্বীকার করতে পারবে না। আমি যে কথা বললাম সেটা প্রথম আয়াতে পাওয়া যাবে দ্বিতীয় আয়াতে নয়। তাহলে আমরা এটা কোথা থেকে নিয়ে আসলাম? ইবনে আব্বাস এই হুকুম কোথা থেকে নিয়ে এসেছেন? আলেমগণ বলেন, এটা বক্তব্যের ইঙ্গিত থেকে বুঝা যায়ঃ এমন শব্দ যা তার উদ্দিষ্ট অর্থ ব্যতীত অন্য আবশ্যকীয় অর্থের উপর দালালত করে এবং বাক্য সঠিক হওয়া ও বিশুদ্ধ হওয়া এর উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ আমি এই কথা বলিনি। প্রথম আয়াত এই বক্তব্যের অর্থের উপর অবশিষ্ট আছে এবং দ্বিতীয় আয়াতটিও বক্তব্যের অর্থের উপর অবশিষ্ট আছে।

এই আয়াতে বক্তব্যের ইঙ্গিত কোথায়? “আর যারা কাফির তারা তাগুতের পথে লড়াই করে।” আপনি নিশ্চিতভাবেই বুঝেছেন যে, অবশ্যই তারা প্রথম দলের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, “যারা মু’মিন তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে।” এটা বুঝা অসম্ভব যে, তাদের একজন অপরজনকে হত্যা করবে। “অর্থাৎ প্রত্যেক দলের একজন অপরজনকে হত্যা করে।” এটা বুঝা অসম্ভব যে, তারা এমন কিছু লোকের বিরুদ্ধে লড়াই করে যারা তাগুতকে শাসক বানাতে চায় এবং তাগুতের কালিমা বিজয়ী করতে চায়। তারা শুধুমাত্র এমন লোকদের

[138] সুরা আহক্বাফঃ ১৫

বিরুদ্ধে লড়াই করে যারা আল্লাহর কালিমা বিজয়ী হওয়া চায়।

বক্তব্যের ইঙ্গিত থেকে আপনি বুঝেছেন যে, আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যে দলের ব্যাপারে কুফরের হুকুম দিয়েছেন নিশ্চিতভাবেই সে দল প্রথম দলের বিরুদ্ধে লড়াই করে যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর এটা হারাম রক্তকে হালাল সাব্যস্ত করার অন্তর্ভুক্ত; কারণ এই সকল ব্যক্তিদের ব্যাপারে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ঈমানের সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি তাদের কর্ম স্পষ্টকরে বর্ণনা করেছেন যে, তারা লড়াই করবে এবং তিনি তাদের লড়াইয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্পষ্টকরে বর্ণনা করেছেন যে, "আল্লাহর কালিমা বিজয়ী হওয়া।" অতএব এই রক্ত হল হারাম।

এর দলিলঃ ইমাম মুসলিম رَحِمَهُ اللهُ -এর সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -এর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেনঃ আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, "মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান হারাম।" এই ব্যক্তিরা হল মুসলিম। আল্লাহর সাক্ষ্যানুযায়ী মু'মিন এবং তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। তাদের রক্ত ঝরানো হারাম। তাই যে ব্যক্তি এই ব্যক্তিদের হত্যা করা হালাল বা বৈধ্য মনে করবে সে এমন বিষয় হালাল করল আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যা হারাম করেছেন।

আপনি ইমাম ত্বহাওয়ী رَحِمَهُ اللهُ -এর মূলনীতিটি জানেন, তিনি বলেছেন, "আমরা আহলুল ক্বিবলাহ'র কাউকে কোন গুনাহের কারণে তাকফীর করি না যতক্ষণ না সে এটাকে হালাল মনে করে।" রক্ত ঝরানো–এটা একটি গুনাহ। একজন মানুষ আরেকজনকে হত্যা করলে–এটা একটি পাপ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং কবিরাহ গুনাহ হিসেবে গণ্য করা হবে। আর যখন সে বলবে, "এই মুসলিমের রক্ত হালাল" তখন এই ব্যক্তি মিল্লাহ থেকে বের হয়ে যাবে।

এমনিভাবে ইমাম বুখারি رَحِمَهُ اللهُ সহীহ বুখারিতে আবু বাকারাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -এর হাদিস বর্ণনা করেছেন। বিদায় হজ্জের ভাষণে আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের ইয্যত-সম্মান তোমাদের জন্য তেমনি হারাম, যেমন হারাম তোমাদের এ দিনটি, তোমাদের এ মাস এবং তোমাদের এ শহর।" এই রক্ত হারাম। তাই যে ব্যক্তি এই রক্ত হালাল মনে করবে

সে মিল্লাহ থেকে বের হয়ে যাবে। আর এই সকল ব্যক্তিরা এমন ব্যক্তিদের রক্ত ঝরানো হালাল বা বৈধ মনে করে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যাদের ব্যাপারে ঈমানের সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং যারা আল্লাহর কালিমা বিজয়ী হওয়ার জন্য অস্ত্র ধরেছে। এটা হল কুফরির দ্বিতীয় কারণ যা নছের ইশারা থেকে বুঝা যায়।

এই সকল ব্যক্তিদের কুফরির তৃতীয় কারণঃ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এদের সম্পর্কে বলেছেন, "কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।" অতএব কুফরির তৃতীয় কারণ হল প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সাহওয়াত এবং হাশদ– এরা শয়তানের বন্ধু।

আলোচ্য বিষয়ে শয়তান কেন প্রবেশ করল? কেন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেননি, "সুতরাং তোমরা তাগুতের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।" যেহেতু পূর্বের আলোচনা তাগুতদের সম্পর্কে? "যারা কাফির তারা তাগুতের পথে লড়াই করে সুতরাং তোমরা তাগুতদের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।" কেন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এটা বলেননি? এই আলোচ্য বিষয়ে কোন জিনিস শয়তানকে অন্তর্ভুক্ত করল?

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যাদের ব্যাপারে কুফরির হুকুম দিয়েছেন তাদের জন্য কুফরির তৃতীয় কারণ সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন যে, এই সকল ব্যক্তিরা শয়তানের বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত... কিভাবে আপনি প্রমাণ করবেন যে, এই ব্যক্তিরা শয়তানের বন্ধু?

প্রথমতঃ আপনার কি স্মরণ আছে যে, আমরা বলেছিলামঃ এই সমস্ত আইন ও সংবিধান হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে ওহী?

﴿وَإِنَّ الشَّيٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِهِمۡ لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ﴾

"নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা (ওহী) দেয়।"[139] এই আইন ও সংবিধান শয়তানের পক্ষ থেকে ওহীর ফল। প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সাহওয়াত এবং হাশদ এই সমস্ত আইন ও সংবিধান

[139] সুরা আনআমঃ ১২১

দ্বারা শাসন করার জন্য লড়াই করে যেগুলো হল শয়তানের ওহীর অন্তর্ভুক্ত। অতএব এই ব্যক্তিরা কি শয়তানের বন্ধু নয়? নিশ্চিতভাবেই; কারণ এখানে ওয়ালীর অর্থ হলঃ মুহাব্বাতকারী, সাহায্যকারী এবং মিত্র। আর এই ব্যক্তিরা শয়তানকে মুহাব্বাত করে এবং শয়তান তাদেরকে মুহাব্বাত করে। এজন্য তারা এমন আইন ও সংবিধান রক্ষা করার জন্য লড়াই করে যা শয়তান তার বন্ধুদের নিকট ওহী করে। অতএব এই সকল ব্যক্তি যারা তাগুতের পথে লড়াই করে তারা শয়তানের বন্ধু। এটা হল প্রথম দলিল।

অন্য আরেকটি দলিলঃ প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শারীয়াহ'র কোন বিষয় অমান্য করে সে শয়তানের অনুগত্য করে। হোক সেটা বড় বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে অথবা ছোট বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে তা সমান। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শারীয়াহ'র প্রতিটি অমান্যতাই শয়তানের জন্য আনুগত্য।

এর দলিলঃ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর বাণীঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি আশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"[140] অতএব আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ অশ্লীলতা থেকে নিষেধ করেন। অপরদিকে সুরা বাকারাহ'র ২৬৮ নং আয়াতে রয়েছেঃ

﴿اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ﴾

"শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে।" তাহলে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ নিষেধ করেন আর শয়তান আদেশ করে... এজন্য

[140] সুরা নাহলঃ ৯০

আপনি যখন আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে কোন উপমায় আসবেনঃ আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ বলেন,

﴿وَ لَا تَقۡرَبُوا الزِّنٰۤی اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَ سَآءَ سَبِیۡلًا﴾

“আর তোমরা যিনা-ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না, নিশ্চয়ই তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।”[141] অতএব আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ অশ্লীলতা থেকে নিষেধ করেন। যিনা হচ্ছে অশ্লীলতা। তাই আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ অশ্লীলতা থেকে যিনা থেকে নিষেধ করেন। শয়তান যিনার আদেশ করে; কারণ যিনা অশ্লীলতার অন্তর্ভুক্ত। অতএব আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আদেশের অথবা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর শারীয়াহ’র প্রতিটি অমান্যতাই শয়তানের জন্য আনুগত্য। এটা হল প্রথম দলিল।

আরেকটি দলিলঃ সুরা আনআমে আল্লাহর নাবী ইবরাহীমের ব্যাপারে এসেছেঃ

﴿وَ اِذۡ قَالَ اِبۡرٰهِیۡمُ لِاَبِیۡهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصۡنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّیۡۤ اَرٰىكَ وَ قَوۡمَكَ فِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ﴾

“আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বলেছিলেন, আপনি কি মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে দেখছি।” এটা সুরা আনআমে আয়াত নং ৭৪ আর সুরা শুআরার ৬৯-৭১ নং আয়াতে রয়েছেঃ

وَ اتۡلُ عَلَیۡهِمۡ نَبَاَ اِبۡرٰهِیۡمَ ﴿۶۹﴾ اِذۡ قَالَ لِاَبِیۡهِ وَ قَوۡمِهٖ مَا تَعۡبُدُوۡنَ ﴿۷۰﴾ قَالُوۡا نَعۡبُدُ اَصۡنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِیۡنَ

“আর আপনি তাদের কাছে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন। যখন তিনি তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা কিসের ইবাদাত কর? তারা বলল, আমরা মূর্তির ইবাদাত করি। সুতরাং আমরা নিষ্ঠার সাথে সেগুলোকে আঁকড়ে থাকব।” সুরা আনআমের আয়াতের মাধ্যমে এবং সুরা শুআরার আয়াতের মাধ্যমে আমার নিকট প্রমাণ হল যে, আল্লাহর নাবী ইবরাহীমের পিতা মূর্তি পুজা করতেন... “আর স্মরণ

[141] সুরা ইসরাঃ ৩২

করুন, যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বলেছিলেন, আপনি কি মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেন?”

আপনি ভুলে যাবেন না যে, আল্লাহর নাবী ইবরাহীমের পিতা আযর রাফিদীরা এটা স্বীকৃতি দেয় না। - আমরা আলোচ্য বিষয় থেকে কিছু সময়ের জন্য বের হচ্ছি। কারণ যেহেতু আমরা এটা উল্লেখ করেছি তাই আমরা এই বিষয়টিও উল্লেখ করব - রাফিদীরা আল্লাহর নাবী ইবরাহীমের পিতা আযর সম্পর্কে একথা মেনে নেয় না যে, আযর তার পিতা... তারা বলে এই ব্যক্তি তারা চাচা। তাহলে তার পিতা কে? তারা বলে, তার পিতা হল তারিহ। আপনি কি জানেন, তাওরাতে আল্লাহর নাবী ইবরাহীমের পিতার নাম হল তারিহ? আর কুরআনে আছে আযর। তারা এটা আল্লাহর নাবী ইবরাহীম عَلَيْهِالسَّلام কে ভালবাসার কারণে বলে না, না তার পিতাকে আর না তার চাচাকে। যখন ইবরাহীম عَلَيْهِالسَّلام -এর পিতা জাহান্নামে প্রবেশ করা বৈধ হবে তখন এরপর এতে আবু তালিবের প্রবেশ করা বৈধ হয়ে যায়। কিন্তু যদি সে তার চাচা হয় তাহলে তো হবে না... বিষয়টি ভিন্ন হবে। এই রাফিদীরা হল নিকৃষ্ট লোক। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর বিধিবিধানের কোন একটি বিষয় অমান্য করে সে শয়তানের আনুগত্য করল।

আমি সুরা আনআমের আয়াত উল্লেখ করেছিলামঃ “আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বলেছিলেন, আপনি কি মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেন?” তাহলে নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর নাবী ইবরাহীমের পিতা মূর্তির ইবাদাত করত। অপরদিকে সুরা মারইয়ামের ৪৪ নং আয়াতে রয়েছেঃ

﴿يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾

“হে আমার পিতা! আপনি শয়তানের ইবাদাত করবেন না। নিশ্চয়ই শয়তান রহমানের অবাধ্য ছিল।” আমি বুঝাতে চাচ্ছি সে কি মূর্তির ইবাদাত করত নাকি শয়তানের ইবাদাত করত? এটা এই আয়াতে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর পক্ষ থেকে একটি নছ। এটা এই আয়াতে আমাদের রবের কিতাবে একটি নছঃ “আপনি শয়তানের ইবাদাত করবেন না।” “আপনি কি মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেন?”

অতএব অবধারিতরূপে আপনি বুঝেছেন যে, মূর্তির ইবাদাত ছিল সরাসরি ইবাদাত। আর শয়তানের ইবাদাত সরাসরি ছিল না। কেননা মূর্তির অস্তিত্ব এসেছে শয়তানের সজ্জিত করার মাধ্যমে।

"আর যারা কাফির তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।" অতএব প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সাহওয়াত এবং হাশদ–এরা প্রত্যেকেই শয়তানের বন্ধু। এটা হল এই আয়াতে তৃতীয় কারণ। এই সকল ব্যক্তিদের কুফর হল বড় কুফর যা মিল্লাহ থেকে বের করে দেয়। আমরা আয়াতটি পূর্ণ করব। প্রথম দল "যারা মু'মিন" এদের মাঝে এবং দ্বিতীয় দল "যারা কাফির" এদের মাঝে সম্পর্ক কী?

সম্পর্ক হল যুদ্ধের সম্পর্ক। যুদ্ধের এ আদেশ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর পক্ষ থেকে জাড়িকৃত। যুদ্ধের এ আদেশ কোন মানুষের নয়। এটা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর পক্ষ থেকে একটি আদেশ। তিনি বলেছেন, "যারা মু'মিন তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর যারা কাফির তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। কাজেই তোমরা লড়াই কর।" এই আদেশ কার প্রতি? প্রথম দলের প্রতি যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেনঃ "যারা মু'মিন তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে।" এদেরকে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ বলেছেন, "কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।" এই ব্যক্তিরা।

অতএব সৈনিক, পুলিশ, সাহওয়াত এবং হাশদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধের আদেশ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর পক্ষ থেকে, কোন মানুষের পক্ষ থেকে নয়। এই আদেশ প্রত্যেক এমন ব্যক্তির প্রতি যে এই কিতাবের উপর ঈমান এনেছে, প্রত্যেক এমন ব্যক্তির প্রতি যে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাবের উপর ঈমান এনেছে। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ তাকে আদেশ করেছেন সে যেন মু'মিনদের এই দলের অন্তর্ভুক্ত হয় যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং তিনি তাকে আদেশ করেছেন সে যেন কাফির দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যারা তাগুতের পথে লড়াই করে এবং যারা শয়তানের বন্ধু।

কিছু লোক এসে বলে, "ইরাকী রক্ত ঝরানো হারাম" যেমন পার্লামেন্ট গত অধিবেশনে অথবা এর পূর্বের অধিবেশনে আইন পাশ করেছে। তারা ইরাকী ব্যক্তির

রক্ত ঝরানো হারাম করে একটি আইন জাড়ি করেছে। অথচ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন, “কাজেই তোমরা লড়াই কর।” এই আইন প্রণয়ন -প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে রক্ত ঝরানো হারাম করার বিষয়টি - সর্বদাই এর উৎস হল ঐ সকল নিকৃষ্ট মিসরের ইখওয়ানরা; কারণ তারা ফিলিস্তিনেও একটি সিদ্ধান্ত জাড়ি করেছে যার নাম দিয়েছে ফিলিস্তিনী ব্যক্তির রক্ত ঝরানো হারাম। এজন্য আপনি তাদের গাড়িগুলোতে দেহ টুকরা টুকরা অবস্থায় দেখতে পাবেন এবং আমরা কোন দিন শুনিনি ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের সাহায্য করার কারণে কোন ফিলিস্তিনীকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এটা শুনিনি... কেন?; কারণ ফিলিস্তিনী রক্ত হারাম! এমনকি যদিও সে তাদের নেতাদের হত্যা করে, তাদের আমীরদের হত্যা করে এবং তাদের কর্মস্থলে দেহ টুকরা টুকরা করে রেখে আসে–এটা কোন বিবেচ্য বিষয় না। কেন? কারণ ফিলিস্তিনী ব্যক্তির রক্ত ঝরানো হারাম।

এই একই কাজ তারা ইরাকেও করেছে। তারা বলে, ইরাকী রক্ত ঝরানো হারাম। অথচ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন, “কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।” অতএব যে ব্যক্তি বলে, সৈনিকের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না, পুলিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না, সাহওয়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না এবং হাশদের লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না–এই ব্যক্তির কথা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আদেশের বিপরীত। তিনি বলেছেন, “কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।”

আর যে ব্যক্তি বলে, এরা তো মুসলিম... আমরা বলি, এটা আপনার কথা। আমাদের রবের কথা হল–আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ কুরআনুল কারীমে তাদেরকে তাকফীর করেছেন। তিনি বলেছেনঃ “আর যারা কাফির তারা তাগুতের পথে লড়াই করে।” এরপর তাদের কারো বারংবার মাসজিদে আসা-যাওয়া, রমাদান মাসের সিয়াম পালন করা, হজ্জ করা এবং কুরআন পড়া–এগুলো আমাকে উদ্বিগ্ন করে না; কারণ এই সকল কাজ কোনোই উপকারে আসবে না যখন সে মিল্লাহ থেকে বের হয়ে যাবে। আপনি জানেন যে, আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ কিছু লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন যারা কেবল যাকাত দেওয়া থেকে বিরত ছিল। তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

সাক্ষ্য দিত, সালাত পড়ত এবং বাকি রুকুনগুলো পালন করত। কিন্তু শুধুমাত্র তারা যাকাত দেওয়া থেকে বিরত ছিল। অতঃপর তিনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এই ভিত্তিতে যে, তারা মুরতাদ। আর এটা সাহাবীগণের رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ইজমা।

অতএব আমরা ইসলামের সকল দরজা দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করি। কিন্তু একজন মানুষ কখনো কখনো একটি দরজা থেকে বের হয়ে যায়। যখন সে একটি দরজা থেকে বের হয়ে যায় তখন বাকি দরজাগুলো তার কোন উপকারে আসে না সেক্ষেত্রে সে মুসল্লী হোক অথবা অন্য কিছু হোক তা সমান।

উপস্থিত একজন নীচু আওয়াজে প্রশ্ন করল অতঃপর শাইখ تَقَبَّلَهُ اللهُ জবাব দিলেন।

শাইখঃ হ্যাঁ। মুরতাদের রিদ্দাহ'টা এমন রিদ্দাহ যা মুগাল্লাযা বা গুরুতর রিদ্দাহ। কারণ মানুষ কখনো কখনো মুসলিমদেরকে অথবা ইসলামকে কষ্ট দেওয়া ছাড়াই মিল্লাহ থেকে বের হয়ে যায়। সালাত পরিত্যাগকারী... এই রিদ্দাহ'টা এমন রিদ্দাহ যা মুজাররাদাহ বা সাধারণ রিদ্দাহ। তাকে তিনদিনের জন্য তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে। যদি সে তাওবা করে তাহলে ছেড়ে দেওয়া হবে আর যদি সে তাওবা না করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এই রিদ্দাহ'টা হল রিদ্দাহ'এ মুগাল্লাযা। তাকে পাকড়াও করার পূর্বে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে। আর যখন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তার বান্দাদেরকে সেই ব্যক্তির ব্যাপারে ক্ষমতা দিবেন তখন কেবলমাত্র তার জন্য হত্যা রয়েছে, তার জন্য কেবল হত্যা-ই রয়েছে। তাকে ফিদইয়ার বিনিময়ে মুক্ত করা হবে না, তার প্রতি অনুগ্রহ করা হবে না এবং অন্য কিছু করা হবে না... কেবল হত্যা করা হবে। এটা লড়াইকারী মুরতাদের হুকুম।

অতএব আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এই ব্যক্তিদেরকে তাকফীর করেছেন। আমি আপনার নিকট তাকফীর করার কারণগুলো আলোচনা করেছি। আমি বলেছিঃ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ প্রথম দলকে দ্বিতীয় দলের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ করেছেন। তাই যে ব্যক্তি বলবেঃ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে না—এটা তার কথা আর আমাদের রবের কথা

হলঃ “কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।”

আয়াতের শেষাংশে সুসংবাদ হলঃ “শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল।” এই সুসংবাদ প্রথম দলের জন্য। কারণ যখন সে অনুভব করে যে, তার বন্ধুরা জটিল ও কঠিন অবস্থান দিয়ে অতিক্রম করছে তখন সে তাদের থেকে সরে যাওয়ার জন্য কতই না তাড়াহুড়ো করেঃ

نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيۡهِ وَ قَالَ اِنِّىۡ بَرِىۡٓءٌ مِّنۡكُمۡ اِنِّىۡۤ اَرٰى مَا لَا تَرَوۡنَ اِنِّىۡۤ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيۡدُ الۡعِقَابِ

“সে পিছনে সরে পড়ল এবং বলল, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত, নিশ্চয়ই আমি এমন কিছু দেখছি যা তোমরা দেখতে পাও না। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি। আর আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।”[142] “শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল।” সুতরাং যখন শয়তানের চক্রান্ত দূর্বল ছিল তখন শয়তান যাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে এবং যারা শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের চক্রান্ত আরো বেশি দূর্বল।

এজন্য আপনি দেখতে পেয়েছেন যে, - এটা আমার কথা নয়, এটা এমন কথা যা টিভি-চ্যানেলে বলা হয়েছিল - সালাহুদ্দীন প্রদেশ হল আহলুস সুন্নাহ’র প্রদেশ যা মুজাহিদদের নিকট সমর্পণ করা হয়েছে। এটাকে সমর্পণ করা হয়নি। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদেরকে আধ ঘণ্টার মধ্যে এই প্রদেশের কর্তৃত্ব দান করেছেন। সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং সাহওয়াতদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার। আর যে যুবকরা প্রবেশ করেছিল তাদের সংখ্যা ছিল কেবলমাত্র তিনশ... “শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল।” আধ ঘণ্টার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার আর প্রবেশকারী যুবকদের সংখ্যা ছিল তিনশ! এমনিভাবে একই অবস্থা ছিল নিনাওয়া প্রদেশের শহর মাসুলে। এমনিভাবে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে যাম্মারে এই অংশগুলোর অবস্থা একই ছিল তখন রাফিদীরা ছিল তেলআফারে। অতএব আয়াতের শেষে সুসংবাদ হলঃ “শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল।”

---

[142] সুরা আনফালঃ ৪৮

হে সম্মানিত ভাইগণ! প্রাপ্ত ফলাফল যা বের হচ্ছে তা হলঃ প্রথম দলকে আমরা চিনেছি এবং দ্বিতীয় দলকেও আমরা চিনেছি। আর আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদেরকে কুফরের হুকুম দিয়েছেন।

আমি এতোটুকুই বললাম। আমি আল্লাহর নিকট আমার জন্য এবং আপনাদের জন্য ইস্তিগফার করছি। আল্লাহ আপনাদের জাযা খায়ের দান করুন এবং আপনাদেরকে বারাকাহ দান করুন!

আনুগত্যের শিরক সংক্রান্ত উৎকর্ষ বিবরণ

শাইখ আবু আলী আল-আনবারী আল-ক্বুরাইশী رحمه الله

দশম দারসঃ

আমরা কেন যুদ্ধ করি?

الحَمدُ للّه والصّلاةُ والسّلامُ على رسُولِ اللّه؛

হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে হক্বকে হক্ব হিসেবে দেখান এবং হক্ব অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করুন, বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখান এবং বাতিল বর্জন করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদের এমন বিষয় শিক্ষা দিন যা আমাদের উপকার করবে এবং আপনি আমাদের যা শিক্ষা দেন এর মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে আমাদের ইলম অনুযায়ী আমলকারী বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন আমাদের ইলমকে আমাদের জন্য দলিল বানিয়ে দিন এবং আমাদের বিরুদ্ধে দলিল বানাবেন না - - ইয়া আরহামার-রহিমীন! হে আমার রব! আপনি আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিন, আমার বিষয়াদি সহজ করে দিন এবং আমাদের মুখের জড়তা দূর করে দিন যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে। হে আল্লাহ আপনি আমার কর্মকে সৎ বানিয়ে দিন, আপনার সন্তুষ্টির জন্য খালিছ করে দিন এবং আপনার সৃষ্টির কারো জন্য এতে কোন অংশ রাখবেন না।

অতঃপর,

আল্লাহ আপনাদের দীর্ঘজীবী করুন! আমরা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর নিকট কামনা করি তিনি যেন আমাদের সাহায্য করেন যাতে আমরা উত্তমভাবে এই কোর্সটি সম্পন্ন করতে পারি এবং তিনি যেন আপনাদের মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করেন- নিশ্চয়ই তিনি এব্যাপারে সক্ষম। ইনশা'আল্লাহ আমরা এই দাওরাহ'তে (কোর্সে) আমার কিছু দারস থেকে শিরকুত ত্ব'আহ তথা আনুগত্যের শিরকের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মাস'আলা অন্তর্ভুক্ত করব। আমরা শিরকের এই প্রকারের সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করব; কারণ আপনি যেমন জানেন, উম্মাহ একটা সময় দু'আর শিরকের মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়েছে। অতঃপর শিরকের এই প্রকারটি কিছুটা কমে গিয়ে যেকোনো একটি প্রকার হিসেবে গুঁটিয়ে রয়েছে।

কিন্তু বর্তমান সময়ে যে প্রকারের শিরকটি বেড়ে গিয়েছে তা হল আনুগত্যের শিরক। ইনশা'আল্লাহ আমরা সামনের দিনগুলোতে এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করব আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ আমাদের জন্য যতটুকু সহজ করে দেন। আর আজকে আমাদের আলোচনা হল আমাদের কাজের সূচনার জন্য ভূমিকার ন্যায় একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়াঃ[143]

কেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা হয়?

আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর নিকট সাহায্য চেয়ে আমি বলি, আপনাদের নিকট এটা গোপন নয় যে, আপনাদের সন্তান ও আপনাদের ভাইগণ ২০০৩ সাল থেকে অস্ত্র বহন করছেন। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে তারা এখনো আছেন। রেকর্ড সম্পর্কে একজন বলেন, হে শাইখ আপনি যদি রেকর্ডের অনুমতি দিতেন! ইনশা'আল্লাহ আমরাই রেকর্ড করব। এরপর আপনাদেরকে রেকর্ড দেওয়া হবে। এমনকি ইনশা'আল্লাহ এটা কেন্দ্রীয়ভাবে করা হবে। কারণ আমি একজন মানুষ। আমিও কোন বিষয়ে ভুল করতে পারি। সুতরাং আমি মিলিয়ে দেখব......। তাই আমরাই শুধু রেকর্ড করব। আমি শুনে নিশ্চিত হব যে, আমি যা বলেছি–এর জন্য আমি পাকড়াও হবো না। তখন আপনাদের রেকর্ড দেওয়া হবে বি-ইযনিল্লাহ। আর যে ব্যক্তি কোন টিকা বা নোট লিখে রাখতে চায় তার জন্য অনুমতি রয়েছে।

তাহলে এই সকল ব্যক্তিরা কেন দীর্ঘ এতো বছর যাবৎ যুদ্ধ করছে?

প্রথম লক্ষ্যঃ আপনাদের নিকট যেমনটি গোপন নয় যে, আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর রাস্তায় জিহাদ করা একটি ইবাদাত। বরং এটা সবচেয়ে মহান ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى তার রাসুল ﷺ কে এই ইবাদাতের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণীতে রয়েছেঃ

﴿فَقَاتِلْ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ﴾

[143] এই দারসটি শুরুতে ছিল। কিন্তু সঙ্গত কারণেই প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ এই দারসটিকে শেষে নিয়ে আসা উপযুক্ত মনে করেছেন।

"সুতরাং আপনি আল্লাহর পথে লড়াই করুন; আপনি আপনার নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কিছুর যিম্মাদার নন।"[144] সুতরাং এখানে যুদ্ধ করা আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর উপর ফরজ। ইনশা'আল্লাহু তা'আলা আমরা সামনে এই আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাব।

আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -এর থেকে ইমাম বুখারি رَحِمَهُ اللَّهُ হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "এক লোক আল্লাহর রাসুলের কাছে এসে বলল, আমাকে এমন একটি আমল বাতলে দিন, যা জিহাদের সমতুল্য হবে। তিনি বললেন, আমি এ ধরনের আমল তো পাচ্ছি না।" নিশ্চিতভাবে যখন সে আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে তখন সে ইবাদাত সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করেছে। রাসুল ﷺ এই প্রশ্নের জবাবে ইবাদাতের কোন প্রকার খুঁজে পাননিঃ "আমাকে এমন একটি আমল বাতলে দিন, যা জিহাদের সমতুল্য হবে। তিনি বললেন, আমি এ ধরনের আমল তো পাচ্ছি না।" অতঃপর তিনি তাকে বললেন, "তুমি কি এরূপ করতে পারবে যে, মুজাহিদ যখন বের হয়ে যাবে, তখন থেকে তুমি মসজিদে ঢুকে অ-ক্লান্তভাবে সালাতে নিমগ্ন হবে এবং অবিরাম সিয়াম রাখবে। সে বলল, এমন কাজ কে করতে পারবে?"[145]

অতএব আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের প্রথম লক্ষ্য হলঃ ইবাদাত তথা দাসত্ব করা। এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ عَزَّ وَجَلَّ -এর নৈকট্য অর্জন করি। রাসুল ﷺ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতেন। যেমন আহযাবের যুদ্ধে কিছু লোক কতিপয় উপকরণের জন্য জিহাদের ব্যাপারে উজর পেশ করতে লাগল - যেগুলো আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ উল্লেখ করেছেনঃ

﴿يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾

"তারা বলছিলো, আমাদের বাড়ি-ঘর অরক্ষিত, অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না।

---

[144] সুরা নিসাঃ ৮৪

[145] সহীহ বুখারি

আসলে পালিয়ে যাওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।”[146] এমনিভাবে মুনাফিক্বদের সম্পর্কে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

“অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।”[147] এটা হচ্ছে যে জিহাদ থেকে পিছনে থেকে যায় এবং উজর পেশ করতে চায় ও বিলম্ব করতে চায়। এই সকল ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন, “অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।” সুতরাং এই আয়াতের নির্দেশনা স্বয়ং এই আয়াতের ক্ষেত্রে নেওয়া উচিৎ। আর অবশিষ্ট যে সকল আমলের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর অনুসরণ করি সেগুলোর ক্ষেত্রে এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদের প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃতি দেওয়া-এ দলিল পেশ করাও সঠিক। কিন্তু এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ হল কিছু লোক উজর পেশ করতে লাগল। অতঃপর আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ঐ সকল উজর পেশকারীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, “অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।” কারণ তিনি খন্দক খনন করেছেন এবং তিনি খন্দকে সাহাবীগণের সাথে অব্যাহতভাবে উপস্থিত থেকেছেন। এরপর তিনি তাদের সাথেই ছিলেন যখন তারা পাহারা দিয়েছিলেন। যখন তারা খন্দকের অন্য প্রান্তে মুশরিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তখনও তিনি তাদের সাথেই ছিলেন।

এমনিভাবে হিজরীর নবম বর্ষে যখন আল্লাহর রাসুল ﷺ তাবুকের উদ্দেশ্যে বের হন এবং মুনাফিক্বদের মধ্য থেকে যে বিলম্ব করার সে বিলম্ব করল ও যে উজর পেশ করার সে উজর পেশ করল তখন আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى এই সকল ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

اِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لاَ

[146] সুরা আহযাবঃ ১৩

[147] সুরা আহযাবঃ ২১

تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ ﴿﴾

“যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তো তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিররা তাকে বহিস্কার করেছিল এবং তিনি ছিলেন দুজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন; তিনি তখন তার সঙ্গীকে বলেছিলেন, বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।”[148] অতএব এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, জিহাদ করা একটি ইবাদাত যার মাধ্যমে আমরা ইবাদাত করি এবং আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর নৈকট্য লাভ করি। এটা হল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার প্রথম লক্ষ্য। আর অন্য আরো অনেক আয়াত এর দিকেই ইঙ্গিত করে। কিন্তু আমরা এই আয়াতগুলোতে বেশি সময় অবস্থান করব না; যেমন আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿﴾ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿﴾ وَ اُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿﴾

“হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর ঈমান আনবে এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে! তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম আবাসগুলোতেও (প্রবেশ করবেন)। এটাই মহাসাফল্য। এবং আরো একটি (অর্জন) যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং নিকটবর্তী বিজয়। আর আপনি মু’মিনদেরকে সুসংবাদ দিন।”[149]

---

[148] সুরা তাওবাঃ ৪০

[149] সুরা সফঃ ১০-১৩

আল্লাহ প্রদত্ত এই ব্যবসার শর্ত হচ্ছে তিনটিঃ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র মানহাজের উপর থেকে আপনাকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী মু'মিন হতে হবে এবং আল্লাহর রাসুলের প্রতি বিশ্বাসী মু'মিন হতে হবে। তবে আল্লাহ প্রদত্ত এই ব্যবসায় অংশগ্রহণ করার জন্য কেবলমাত্র এই দুইটি শর্ত যথেষ্ট হবে না যতক্ষণ না আপনি এ দু'টির সাথে তৃতীয়টি যুক্ত করবেনঃ আপনাকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে হবে। সুতরাং যখন মানুষ আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর কিতাবের নিকট নিজেকে পেশ করবে অতঃপর এই আয়াতের নিকট অবস্থান করে সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করেঃ আমি কি এই আয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হব নাকি হব না? সে যদি এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয় যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে তাহলে নিশ্চিতভাবে সে প্রশান্তচিত্তে তার অন্তর খুলে সে মনে করবে যে, আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন। ফলে আমি এই আয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। আর যে ব্যক্তি বসে থাকে যদিও সে আল্লাহ এবং তার রাসুলের প্রতি বিশ্বাসী মু'মিন হয় - তার জন্য এই ব্যবসার ক্ষেত্রে কোন অংশ থাকবে না এবং এই ব্যবসার উপার্জনের ক্ষেত্রে কোন অংশ থাকবে না। এটাই হল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার প্রথম লক্ষ্য।

দ্বিতীয় লক্ষ্য হচ্ছে এই সকল মানুষ অন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে তারা যেন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর ইবাদাতকারী হয়ে যায়। অর্থাৎ তারা অন্যদেরকে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর ইবাদাতকারী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। কেননা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন,

﴿وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ اِلا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

"আর আমি জ্বীন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য।"[150] অতএব আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যেন আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর ইবাদাতকারী হই। আপনি যেখানে বসবাস করেন যদি সেই স্থানে ভালোকরে

[150] সুরা যারিয়াতঃ ৫৬

দৃষ্টি দেন অথবা কিছু শহরের উপর জরীপ করেন তাহলে অবশ্যই আপনি জানতে পারবেন কতজন আল্লাহর ইবাদাতকারী রয়েছে আর কতজন শয়তানের ইবাদাতকারী রয়েছে। এখানে মুজাহিদের ভূমিকা এবং জিহাদের ভূমিকা আসবে। যা এই সকল ব্যক্তিদেরকে বান্দাদের দাসত্ব থেকে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর দাসত্বের দিক বের করার জন্য কাজ করে। আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর সাহাবীগণ এক ঘটনায় এটা বলেছিলেন, যে ঘটনা তাদের মাঝে এবং পারস্যের অধিবাসীদের মাঝে যুদ্ধের পূর্বে ঘটেছিল। পারস্যরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলঃ কোন জিনিস তোমাদেরকে নিয়ে এসেছে?

সাহাবীগণ এক কথায় জবাব দিয়েছেনঃ আমরা মানুষকে বান্দাদের দাসত্ব থেকে বান্দাদের রবের দাসত্বের দিকে বের করার জন্য এসেছি। নিশ্চিতভাবেই তারা দাওয়াহ দিতে আসেনি তারা এসেছে যুদ্ধ করতে। কারণ তারা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর রাস্তায় যুদ্ধ করেছিল।

এমনিভাবে সুরা বাকারার আয়াতে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

يَا أيها النّاسُ اعْبُدُوا رَبّكُمُ اَلّذِي خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ ۝ اَلّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وّ السّمَآءَ بِنَآءً وّ اَنزَلَ مِنَ السّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثّمَرٰتِ رِزْقًا لّكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلّهِ اَنْدَادًا وّ اَنتُمْ تَعلَمُونَ ۝

“হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা তাক্বওয়াবান হতে পার। যিনি যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আসমানকে করেছেন ছাদ এবং আকাশ হতে পানি অবতীর্ণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেছেন। কাজেই তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহ তা’আলার সমকক্ষ দাঁড় করিও না।”[151] অতএব আমাদেরকে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর ইবাদাত করতে আদেশ করা হয়েছে–যেমনটি সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এরপর আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ আমাদের জন্য ইবাদাতের উপায়-

[151] সুরা বাকারাহঃ ২১-২২

উপকরণ সহজ করার পর বলেছেন, “কাজেই তোমরা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিও না।” সুতরাং আমরা যখন এমন ব্যক্তিকে পাব যে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ স্থির করে তখন সেখানে জিহাদের ভূমিকা আসবে যা ঐ সকল ব্যক্তিদেরকে উৎসাহিত করবে তারা যেন আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর সাথে কোন সমকক্ষ নির্ধারণ না করে।

স্মৃতিপটে কিছু পর্যবেক্ষণ আসতে পারে; কিভাবে আপনি এই মাস'আলাকে আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর এবাণীর সাথে সামঞ্জস্য দিবেনঃ

﴿لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ﴾

“দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কেন জোর-জবরদস্তি নেই।”[152] এবং আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর এবাণীর সাথেঃ

﴿لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ﴾

“তোমাদের দ্বীন (কর্মফল) তোমাদের জন্য আর আমার দ্বীন (কর্মফল) আমার জন্য।”[153] আমরা সামনে এই মাস'আলার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করব বি-ইযনিল্লাহি তা'আলা - যখন আমরা গণতন্ত্রের ভিত্তিসমূহের প্রথম ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করব-তা হল বিশ্বাসের স্বাধীনতা। ঐ সময় আমরা এই সকল আয়াতের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করব যদি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ আমাদের জন্য সহজ করে দেন। কিভাবে আমরা মানুষদেরকে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর ইবাদাতকারী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করব? এই পথেই যেমনটি আপনারা জানেন, আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে আয়াতটি চোখের সামনে স্পষ্ট। সুতরাং আপনাদের ভাইয়েরা যখন জিহাদ শুরু করেছেন এবং আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى তাদেরকে যমীনে কর্তৃত্ব দান করেছেন তখন তারা মানুষদেরকে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর ইবাদাতকারী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে শুরু

[152] সুরা বাকারাহঃ ২৫৬

[153] সুরা কাফিরূনঃ ০৬

করেছে। তামকীনের (কর্তৃত্ব লাভের) পর তাদের কাজের গতিপথ ছিল তারা শিরকের এমন একটি স্থানও রাখেননি, যে স্থানে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাথে শিরক করা হয়। আর এখান থেকেই শিরকের স্থানগুলোর বিলুপ্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় - হোক সেটা সৎ ব্যক্তিদের কবরের উপর নির্মিত অথবা মাযার অথবা নাবীগণের এমন কবরের উপর নির্মিত ধারণা করা হয় যেগুলো নাবীগণের কবর। কারণ একমাত্র যে কবরের পরিচয় জানা যায় সেটা হচ্ছে আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর কবর। আর নাবীগণের কারো কবরের পরিচয় জানা যায় না.... এগুলো হচ্ছে ধারণাকৃত। এমনকি যদিও সেই ধারণা সঠিক হয়। সুতরাং জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদেরকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন আর তারা শিরকের স্থানগুলোকে বিলুপ্ত করেছে। নিশ্চিতভাবেই আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যে কিছু একটা মনে হচ্ছে যে, কিভাবে আমরা ঐ স্থানগুলো বিলুপ্ত করছি যেগুলোতে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সাথে শিরক করা হয়?

আপনি কেবলই জিহাদের মাধ্যমে এই লক্ষ্যে এসে পৌঁছাবেন। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর ইবাদাতের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার অন্য আরেকটি বিষয় হচ্ছে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে এমন স্থানগুলো বিলুপ্ত করা হয়েছে যেগুলোতে শিরকের আলোচনা করা হত - যেমন সূফী-সাধকের আশ্রম, হুসাইনিয়্যাত, ঐ সকল ইনিষ্টিটিউট ও কলেজ যেগুলো গঠনকৃত আইনসমূহ শিক্ষা দিত এবং এছাড়াও অন্যান্যগুলো।

অতএব জিহাদের মাধ্যমে শিরকের স্থানগুলো বিলুপ্ত করা হয়েছে, জিহাদের মাধ্যমে এমন স্থানগুলো বিলুপ্ত করা হয়েছে যেগুলো শিরকের শিক্ষা দিত এবং জিহাদের মাধ্যমে এমন ব্যক্তিকে অপসারণ করা হয়েছে যে মানুষকে শিরক শিক্ষা দিত। তাই আপনি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে দারুল ইসলামে প্রকাশ্যে তাদের কাউকে দেখতে পাবেন না। সুতরাং দ্বিতীয় লক্ষ্য হল মানুষদেরকে উদ্বুদ্ধ করা যেন তারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর ইবাদাতকারী হয়।

আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর রাস্তায় জিহাদ করার তৃতীয় লক্ষ্যঃ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -

এর এবাণীতে রয়েছেঃ

﴿وَ قَاتِلُوۡهُمۡ حَتّٰی لَا تَکُوۡنَ فِتۡنَۃٌ وَّ یَکُوۡنَ الدِّیۡنُ کُلُّهٗ لِلّٰهِ﴾

“আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়।”[154]

অতএব তৃতীয় লক্ষ্য হলঃ হে আমার সম্মানিত ভাই! আপনার অস্ত্র বহন করা এবং অস্ত্র বহন করে আপনার লক্ষ্য হচ্ছে এখানে যেন কোন ফিতনা অবশিষ্ট না থাকে। এই ফিতনা যুদ্ধ ব্যতীত দূর হবে না। এই আয়াতে ফিতনার অর্থঃ ইমাম আহমাদ رَحِمَهُ الله বলেন, “ফিতনা অর্থাৎ শিরক।” কিন্তু নিশ্চিতভাবে আপনাদের নিকট এটা গোপন নয় যে, আরবী ভাষায় কোন অবস্থাতেই ফিতনার অর্থ শিরক নয়। ফিতনার অর্থ হলঃ যাচাই করা, পরীক্ষা করা, পরিশোধন করা এবং কষ্ট প্রদান করা। এগুলো হচ্ছে ফিতনার অর্থ। তাহলে কিভাবে ইমাম আহমাদ رَحِمَهُ الله বললেন, “আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয়।” যতক্ষণ না শিরক নির্মূল হয়। কারণ ফিতনার অর্থসমূহের পঞ্চম অর্থ হচ্ছে মানুষকে তার দ্বীন বর্জন করার প্রতি প্ররোচিত করার জন্য শাস্তি ও আযাবের সামনে পেশ করা। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কিতাব থেকে এর দলিলঃ

﴿یَوۡمَ هُمۡ عَلَی النَّارِ یُفۡتَنُوۡنَ﴾

“যে দিন তাদেরকে আগুনে শাস্তি দেওয়া হবে।”[155] “তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে” –এর অর্থঃ অর্থাৎ তাদেরকে পেশ করা হবে। সুতরাং ফিতনার অর্থ হল কোন বস্তুকে আরেক বস্তুর জন্য পেশ করা।

ফিতনার অর্থ মুসলিমকে শাস্তি দেওয়া যেন সে তার দ্বীন বর্জন করার ব্যাপারে প্ররোচিত হয়। এর দলিল আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণীঃ

---

154 সুরা আনফালঃ ৩৯

155 সুরা যারিয়াতঃ ১৩

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا﴾

“নিশ্চয়ই যারা মু’মিন পুরুষ এবং মু’মিনা নারীগণকে বিপদাপন্ন করেছে তারপর তাওবা করেনি।”[156] আর আপনি জানেন যে, ফিতনার পদ্ধতি ছিল তারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর প্রতি বিশ্বাসী মু’মিনকে নিয়ে আসত এবং তাকে গর্তের আগুনের সামনে পেশ করত। অতঃপর যদি সে তার দ্বীনের উপর অনড় থাকত তাহলে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হত। আর যদি সে ফিরে আসত তাহলে তার পথ ছেড়ে দেওয়া হত। সুতরাং ফিতনার অর্থ হলঃ মানুষকে তার দ্বীন বর্জন করার ব্যাপারে প্ররোচিত করার জন্য শাস্তির সামনে পেশ করা। অর্থাৎ আমি এর মাধ্যমে তাগুতদের দেশগুলোতে কারাগার এবং বন্দিশালা উদ্দেশ্য করছি। আর আপনি জানেন যে, কিছু কারাগার প্রসিদ্ধি পেয়েছে—ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্ - যেমন আবু গারীব কারাগার, মুছান্না কারাগার, বাগরাম কারাগার এবং গুয়ান্তানামু কারাগার। এগুলো হচ্ছে প্রসিদ্ধ কিছু নাম। এটা জানা বিষয় যে, এই কারাগারগুলোর কারাবন্দী ছিল শুধুমাত্র মুসলিমরা। আর আমেরিকার কারাগারগুলোতে বিশেষত রাফিদীদের জন্য আলাদা অংশ ছিল।

অতএব যুদ্ধের লক্ষ্য হচ্ছেঃ এই কারাগারগুলো বন্ধ করা। এজন্য আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে যখন যুবকরা অস্ত্র ধরতে শুরু করেছে এবং তারা জিহাদের ময়দানে কয়েক বছর চলতে থাকার পরেও তাদের কর্মপরিকল্পনার একটি অংশ ছিলঃ আমরা কিভাবে ঐ সকল ব্যক্তিদের মুক্ত করব রাসুল ﷺ যাদের নাম দিয়েছেন “আনী” তথা বন্দি। “তোমরা বন্দীদেরকে মুক্ত কর।”[157] কিন্তু তা হবে যুদ্ধের মাধ্যমেঃ “আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয়।” সুতরাং কারাগারগুলো যুদ্ধের মাধ্যমে বন্ধ হবে। আর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে এ বিষয়টি আমরা শাইখ আবু মুসআবের সময় থেকে আমাদের দেশে অনুভব করেছি— আল্লাহর تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর নিকট কামনা করি তিনি যেন তাকে ইল্লিয়্যিনে কবুল করেন - জিহাদের ক্ষেত্রে তার অগ্রবর্তী উদ্যোগের একটি ছিল যুদ্ধের মাধ্যমে

[156] সুরা বুরূজঃ ১০

[157] সহীহ বুখারি

কারাগারগুলোর জন্য একটি পথ খুঁজে পাওয়া। যেন তিনি ঐ কারাগারগুলো থেকে ঐ সকল দুর্বল ব্যক্তিদের বের করতে পারেন। অল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদের মধ্য থেকে হাজার হাজার ব্যক্তিদের উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং তারা স্বল্প সময়ের মধ্যে বের হয়ে যান। এখন তাদেরকে বলা হয় স্বাধীন। কারণ তারা কারাগার থেকে স্বাধীন তথা মুক্ত হয়েছে।

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এই সমাধান স্থির করে দিয়েছেন এমন লোকজনকে বাধা দেওয়ার জন্য যারা আমাদেরকে শাস্তি দিয়ে আমাদের দ্বীন বর্জন করার ব্যাপারে আমাদের প্ররোচিত করে।

এই অঞ্চলে মুসিবত কোথায়? এই সকল লোকগুলো যখন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র কাউকে বন্দি করে যে তার দ্বীনের ব্যাপারে যত্নবান, অতঃপর তারা তাকে তার দ্বীন পরিত্যাগ করার জন্য প্ররোচিত করে। এটাই একটি মুসিবত যে, শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে যেন আপনি আপনার আপনার দ্বীন পরিত্যাগ করেন। অন্য আরেকটি মুসিবত হচ্ছেঃ যে ব্যক্তি কারাগারে অবস্থিত ঐ সকল ব্যক্তিদের সাথে ঘটে যাওয়া বিষয় শুনে আপনি তাকে দেখতে পাবেন, সে দ্বীনের অনেক বিষয় থেকে ফিরে যায় এই ভয়ে যে, তাকে গ্রেফতার করা হবে এবং তাকে কারাগারে ফেলে রাখা হবে। এরপরে তার ব্যাপারে সাজা নামানো হবে - অমুক, অমুক, অমুককে যা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কারাগারের ভিতরে অবস্থানরত ব্যক্তিকে তার দ্বীন পরিত্যাগ করার জন্য প্ররোচিত করা হয়। আর কারাগারের বাহিরে অবস্থানরত ব্যক্তি তার দ্বীনের অনেক বিষয় থেকে ফিরে যেতে শুরু করে এই ভয়ে যে, ঐ ব্যক্তির সাথে যা ঘটেছে তার সাথে তা ঘটতে পারে; এখান থেকেই শিরকের উৎপত্তি হয়—ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্। তাই যখন দ্বীন পালনকারী ব্যক্তিরা ফিরে যায় তখন অন্যদের মধ্যে যা আছে তাদের মধ্যে তাই থাকে। একারণে ইমাম আহমাদ বলেছেন, “আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয়।” যতক্ষণ না শিরক নির্মূল হয়।

কারাগারের ক্ষেত্রে যখন আপনি এই আয়াতগুলোকে নিরীক্ষণ করবেন তখন আপনি এ বিষয়টি বুঝতে পারবেন। তাগুতদের কারাগারগুলোতে একটি দলের

আত্মপ্রকাশ ঘটেছে যাদেরকে 'ফিরে আসা ব্যক্তি' হিসেবে জানা যায় এবং তাদেরকে 'ফিরে আসা' হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ তারা দ্বীনের যে বিষয়ের উপর ছিল তা থেকে ফিরে এসেছে। এ স্থানে বেশ কিছু পরিচিত নাম রয়েছে যারা আফগানিস্তানে জিহাদ করেছে, যারা ইয়েমেনে জিহাদ করেছে। কিন্তু যখন তাদেরকে বন্দি করে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয় তখন তারা যে মানহাজের উপর ছিল তা থেকে ফিরে আসে এবং তারা ফিরে আসাকে প্রচার করতে থাকে যে, এই সকল তাগুতরা সঠিক আর তোমরা ভুল....। সুতরাং তারা নিজেরাই ফিতনাগ্রস্থ হয়েছে। অতঃপর যে ব্যক্তি কারাগারের বাহিরে অবস্থান করছে তারা তার জন্য ফিতনায় পরিণত হয়েছে–ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্।

এটাই হল আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সমাধান। তাই যে ব্যক্তি এই সকল কারাগার ও এই সকল বন্দিশালাগুলো বন্ধ করার জন্য আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর আদেশ জানতে চায় তার জন্য একমাত্র সমাধান হল - "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।"

বিকল্প হলঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আদেশ বর্জন করে এবং এই আয়াতে কারীমাকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে না। এই সকল ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে তারা এমন কিছু সমাধান নিয়ে আসে যেগুলো বিকল্প। আমরা আমাদের দেশে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আদেশের বিকল্প ব্যবস্থা দেখতে পাই। সেগুলো হচ্ছে বিক্ষোভ মিছিল, তীব্র সমালোচনা করা, নিন্দা জানানো এবং টিভি চ্যানেলে মায়া কান্না করা। এই সবগুলোই হচ্ছে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর বাণীর বিকল্প ব্যবস্থাঃ "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয়।"

আপনি যখন তুলনা করবেন এই লোকদের মাঝে যারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর এ আদেশের সাড়া দিয়েছে– "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।" এবং ঐ লোকদের মাঝে যারা বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে এসেছে তখন এ দু'দলের মাঝে পার্থক্য দেখতে পাবেন; আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ কারাগারের হাজার হাজার বন্দিদের মুক্ত করার জন্য এই সকল লোকদের মাধ্যম বানিয়েছেন। আর ঐ সকল লোকেরা নিজেদেরকেই

রক্ষা করতে সক্ষম হয় না। বরং সোয়াট টিম বিক্ষোভকারীদের মাঝে প্রবেশ করে যাকে ইচ্ছা তাকে গ্রেফতার করে অতঃপর তারা তাকে কারাগারে ফেলে রাখে।

অতএব সে তার নিজেকেই রক্ষা করতে সক্ষম নয় এবং হবেও না। কেন? কারণ সে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সমাধানের বিপরীত সমাধান নিয়ে এসেছে। যদি সে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর নির্দেশিত সমাধান অনুসরণ করত, এই দল যদি আল্লাহর অনুমতিক্রমে সাড়া দিত তাহলে অবশ্যই আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদেরকে ঐ সকল কারাগার বিজয় করার জন্য এবং ঐ সকল কারাগারের শাস্তি বন্ধ করার জন্য মাধ্যম বানাতেন। সুতরাং এখানে শারয়ী সমাধান রয়েছে এবং এখানে শারয়ী সমাধানের বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে। দুই বছর সময় ধরে রাস্তা ও ফুটপাতে ঘুমানোর পর গ্রীষ্মের উত্তাপ এবং শীতের ঠাণ্ডা সহ্য করে কোন কিছু ছাড়াই বিক্ষোভ মিছিল শেষ হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى সমস্যাগুলো জানেন এবং তিনি এই সকল সমস্যার সমাধানও জানেন। তাই কোন দলের জন্য এটা সম্ভব নয় যে, তারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর সমাধানের বিকল্প নিয়ে আসবে অতঃপর তারা তাদের চেষ্টায় সফল হবে অথবা এমন ফলাফলে পৌঁছবে যা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى কে সন্তুষ্ট করবে। অতএব এটাই হল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার তৃতীয় লক্ষ্য। আর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে বিষয়টি ঘটেছে।

চতুর্থ লক্ষ্যঃ একই আয়াতে রয়েছেঃ "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়।" সুতরাং অস্ত্র ধারণ করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার চতুর্থ লক্ষ্য হলঃ আল্লাহর কালিমা বিজয়ী হওয়া। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর কালিমার সমতুল্য এমন কোন কালিমাকে আমরা মেনে নিব না; আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর কালিমার ঊর্ধ্বে কারো কালিমাকে মেনে নেওয়া তো দূরের কথা।

"এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়।" একশ'র মধ্য থেকে নিরানব্বইটি আল্লাহর জন্য আর একশ'র মধ্য থেকে একটি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য - যুদ্ধ চলতে থাকবে...।

তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আদেশ গ্রহণ করবে অবশ্যই আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ঐ লক্ষ্য বাস্তবায়িত করবেন যা তিনি এই আয়াতে উল্লেখ করেছেনঃ “আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়।” সুতরাং যখন আমরা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আদেশে সাড়া দিব নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর অনুমতিক্রমে এই ফলাফল অর্জিত হবে।

অতএব একমাত্র সমাধান হল আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শারীয়াহ দ্বারা শাসন করার জন্য যুদ্ধ করা। যে ব্যক্তি যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে এবং বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে আসবে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তার মাধ্যমে কিছু বাস্তবায়িত করবেন-এর থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। কারণ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শারীয়াহ দ্বারা শাসন করার জন্য যদি যুদ্ধের বিকল্প ব্যবস্থা থাকত তাহলে অবশ্যই আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى তা স্পষ্ট করতেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করতেন যে কারণে কুরআন ও সুন্নাহ একমাত্র এই মাধ্যম উল্লেখ করার উপর সীমাবদ্ধ থেকেছে। তাই আমরা সকল মুসলিমদের বলি, আপনারা যদি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শারীয়াহ দ্বারা শাসন করতে চান তাহলে আপনাদের সামনে যুদ্ধ ছাড়া কোন অবকাশ নেই।

এমনিভাবে আমি কারাগারের ব্যাপারে বলেছি - ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত কিছু মানুষ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর এ আদেশ “আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।” গ্রহণ করতে বিরত ছিল। অতঃপর তারা বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে আসল। বিকল্প ব্যবস্থা ছিল প্লেটোর–ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ -এর নয়।

বিকল্প ব্যবস্থা ছিল গণতন্ত্রে, বিকল্প ব্যবস্থা ছিল নির্বাচনে, বিকল্প ব্যবস্থা ছিল পার্লামেন্টে, বিকল্প ব্যবস্থা ছিল সংবিধানের উপর ভোট দেওয়াতে। এজন্য আপনি তাদের দেখবেন, তারা সবচেয়ে লাঞ্ছিত। তারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শারীয়াহ দ্বারা শাসন করবে তো দূরের কথা তারা নিজেদেরকেই রক্ষা করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং আল্লাহর শারীয়াহ দ্বারা শাসন করার মাধ্যম গণতন্ত্র নয়, আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর শারীয়াহ দ্বারা শাসন করার মাধ্যম নির্বাচন ব্যবস্থা নয় এবং আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর শারীয়াহ দ্বারা শাসন করার মাধ্যম পার্লামেন্টও নয়। যখন আমরা এই সকল

মাস'আলার ব্যাপারে আলোচনা করব তখন এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা'আল্লাহ।

কিন্তু আমি তড়িৎ করেই বলছিঃ আপনারা জানেন কারা গণতন্ত্রের দিকে আহ্বানকারী। তারা শুরুতে ছিল 'আল-হিযব'এ যা 'আল-হিযবুল ইসলামী আল-ইরাকী' নামে পরিচিত। কিন্তু - আল্লাহ যদি আমার হায়াত দীর্ঘ করেন - অবশ্যই আমি লেকচারগুলোতে 'আল-হিযবুল ইরাকী' নামে সীমাবদ্ধ রাখব। আপনি জানেন যে, আমি 'আল-হিযবুল ইসলামী আল-ইরাকী'কে উদ্দেশ্য করছি; কারণ আমি তাদের ক্ষেত্রে ইসলাম শব্দটিকে বেশি মনে করছি। তাই তাদের ক্ষেত্রে 'আল-হিযবুল ইরাকী' বলাই উত্তম। তাদের অবস্থা 'হিযবুশ-শুয়ুঈ' তথা সাম্যবাদী দলের অবস্থার মতই। তাদের অবস্থা ইরাকের অঙ্গনে বিদ্যমান অন্যান্য দলের অবস্থার মতই।

এই সকল ব্যক্তিরা হচ্ছে গণতন্ত্রের দা'য়ী তথা আহ্বানকারী। এরা হল প্লেটোর অনুসারী। তারা আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর অনুসারী নয়। কারণ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ মুসলিমদেরকে বলেছেন - যখন তারা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর শারীয়াহ দ্বারা শাসন করতে চাইবেঃ "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।" তাদের কেউ তার বাড়িতেও একটি অস্ত্রের মালিক না আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র ধরা তো দূরের কথা। আপনি আপনার ইচ্ছানুযায়ী তাদের কারো বাড়িতে যান আপনি তাকে দেখবেন না সে তার বাড়ির মধ্যে একটি গুলিরও মালিক। আপনি কিভাবে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর দ্বীনকে সাহায্য করবেন অথচ আপনি একটি অস্ত্রেরও মালিক না যার মাধ্যমে আপনি নিজেকে প্রতিরক্ষা করবেন? আপনি তাদের নেতাদের দেখবেন—ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্ - তারা আমেরিকান বাহিনীর পুরুষ সৈন্য ও নারী সৈন্যদের হাতে লাঞ্ছিত হত। এক নারী সৈনিক মুহসীন আব্দুল হামিদের মাথায় পনেরো মিনিটের জন্য তার পা রেখেছিল! অথচ সে প্রতিরোধ করতে পারেনি। আপনি নিজেকে রক্ষা করতে পারছেন না কিভাবে আপনি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর দ্বীনকে সাহায্য করবেন? কেন? কারণ তারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আদেশ বর্জন করেছে - "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর" এবং তারা প্লেটোর বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেঃ গণতন্ত্র, নির্বাচন ব্যবস্থা, পার্লামেন্ট এবং এছাড়া অন্যান্যগুলো।

এই সকল ব্যক্তিরা আপনি যেমন জানেন - যখন আমরা মিসরের ইখওয়ান নিয়ে কথা বলব তখন অবশ্যই এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব - ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত তারা একটি পার্লামেন্ট পায়নি। তবে আপনি তাদেরকে পাবেন, তারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও কাফিরদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে শাসন ক্ষমতায় পৌঁছানোর জন্য এবং মুসলিমদেরকে এই বলে ধোঁকা দেয় যে, আমরা অচিরেই এই পার্লামেন্টের তাবুর অধীনে থেকে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করব! ঐ সকল তাবুর অধীনে থেকে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর দ্বীন প্রতিষ্ঠা হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। কারণ ঐ সকল তাবুর অধীনে কোন যুদ্ধ নেই। যুদ্ধ হবে ঐ সকল তাবুর বাহিরে ঐ সকল তাবুওয়ালাদের বিরুদ্ধে।

অতএব বিকল্প ব্যবস্থা কোন ফলাফল নিয়ে আসে না। কারণ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ হলেন আলিমুল গাইব এবং তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। যদি তিনি জানতেন গণতন্ত্রের মধ্যে আমাদের জন্য কোন কল্যাণ রয়েছে তাহলে অবশ্যই তিনি কোন না কোন উপায়ে এব্যাপারে আমাদের ইঙ্গিত করতেনঃ একটি আয়াতের মাধ্যমে, একটি হাদিসের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন মাধ্যমে।

আমরা যদি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আদেশ পরিহার করিঃ “আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।”[158] আমরা যদি আল্লাহর রাসুল ﷺ এর উক্তি পরিহার করিঃ “আমাকে আদেশ করা হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে যতক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর তারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। যদি তারা এরূপ করে তবে তারা আমার হাত থেকে নিজেদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে নেবে।”[159] আমরা যদি আল্লাহর আদেশ বর্জন করিঃ “আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।” এবং রাসুল ﷺ এর আদেশ বর্জন করিঃ “আমাকে আদেশ করা হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে যতক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য দেয়

[158] সুরা আনফালঃ ৩৯

[159] সহীহ ইবনে হিব্বান

যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর তারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। যদি তারা এরূপ করে তবে তারা আমার হাত থেকে নিজেদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে নেবে।"[160] অতঃপর আমরা শান্তি ও শান্তিস্থাপনের নিকট আশ্রয় নেই এবং প্লেটোর বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে আসি তাহলে তারা তাদের নিজেদেরকে নিয়েই পরিহাস করবে এবং বলবে, আমরা পার্লামেন্টের মাধ্যমে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শারীয়াহ দ্বারা শাসন করতে চাই! এটা আমাদের দ্বীন নয় এবং আমাদের নাবী ﷺ এর মানহাজও নয়।

আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার অন্য আরেকটি লক্ষ্যঃ আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর বাণীতে রয়েছেঃ

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿۷۵﴾

"আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা জালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।"[161] সুতরাং আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ আমাদেরকে আদেশ করেছেন আমরা যেন তার রাস্তায় যুদ্ধ করি যাতে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঐ সকল দূর্বলদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে মাধ্যম হই।

রক্ষা করার পদ্ধতিঃ আমরা যখন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর এ আদেশ গ্রহণ করবঃ "আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা লড়াই করছ না!" অর্থাৎ তোমরা যুদ্ধ কর। সুতরাং যখন আমরা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর আদেশ গ্রহণ করে যুদ্ধ করব তখন ঐ সকল দূর্বল লোকেরা আমাদের নিকট আসতে তাদের জন্য পথ সহজকরণের ক্ষেত্রে

[160] সহীহ ইবনে হিব্বান

[161] সুরা নিসাঃ ৭৫

আমরা মাধ্যম হব। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে এটা একটি অর্জিত বিষয়। যেমন আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর সময় বিষয়টি হাসিল হয়েছিল যখন তিনি যুদ্ধ শুরু করলেন এবং আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাকে যমীনে কর্তৃত্ব দান করেছেন তখন জাযিরাতুল আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দূর্বল মুসলিমরা আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর মদিনায় হিজরত করতে শুরু করেছিল। এমনিভাবে বর্তমানে আমাদের অবস্থাও একই যখন আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তখন মুসলিমদের দেশগুলোতে দ্বীনের প্রতি অনড় থাকা দূর্বল ব্যক্তিরা আমাদের নিকট হিজরত করতে শুরু করেছে।

অতএব যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্য পথ সহজকরণের ক্ষেত্রে মাধ্যম হব যাতে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ আমাদেরকে তাদের রক্ষা করার ব্যাপারে মাধ্যম বানান। আর যখন আমরা যুদ্ধ ছেড়ে দিব নিশ্চিতভাবেই তখন কেউ আমাদের নিকট হিজরত করবে না এবং আমাদের নিকট কেউ আসবে না। এটাই হল প্রথম মাধ্যম।

দ্বিতীয় মাধ্যমঃ আপনি এই সকল জালিম অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন যারা যমীনে দূর্বল মুসলিমদেরকে জুলুম করে। অতঃপর আপনি তাদেরকে ইসলামের অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করবেন। ফলে আপনি পৃথিবীতে দূর্বলদের থেকে তাদের অনিষ্ট বাধা দিতে পারবেন। আর এ বিষয়টি আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর যামানায় ঘটেছে যখন তিনি মক্কা বিজয় করলেন - আল্লাহ একে সম্মানিত করুন এবং মর্যাদাবান করুন- মক্কায় অবস্থিত দূর্বলরা মক্কায় ছিল। কিন্তু বিজয়ের পর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে তারা স্বাধীন হয়ে যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -এর হাদিস। তিনি বলেন, আমি দূর্বলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম এবং আমার মাও দূর্বল নারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অতএব আপনি যুদ্ধ করবেন যাতে আপনি এই সকল লোকদেরকে ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। যখন তারা ইসলামের অনুসরণ করবে তখন অবশ্যই তাদের অঞ্চলগুলোতে দূর্বল মুসলিমদের প্রতি তাদের অনিষ্ট বন্ধ হয়ে যাবে।

তৃতীয় মাধ্যমঃ আপনি যুদ্ধ করবেন যতক্ষণ না এই সকল লোকদেরকে

অপসারিত করেন এবং দূর্বল মুসলিমদেরকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে আপনি মাধ্যম হন। আর এ বিষয়টি এই বরকতময় উলায়াতে ঘটেছে - আমরা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর নিকট কামনা করি তিনি যেন এই উলায়াতকে এবং এই উলায়াতের অধিবাসীদেরকে কল্যাণের সাথে রক্ষা করেন এবং আমাদের জন্য সকল কল্যাণ পূর্ণ করে দেন। যখন যুদ্ধ শুরু হল এবং অত্যাচারীরা আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে দূর্বল করে রাখতো - আমি অনেক ঘটনা এবং অনেক বর্ণনা শুনেছি - এই সকল ব্যক্তিরা এই উলায়াতের অধিবাসীদের সাথে কী আচরণ করত এবং এমনিভাবে অন্যান্য শহরগুলোতেও। এক বৃদ্ধ লোকের ঘটনা সে আমাকে বলল, "আল্লাহর কসম! এটা আমাদের জন্য দীর্ঘ ছিল! তাদের কেউ যখন আমার ইজ্জতে হস্তক্ষেপ করত তখন আমার কিছুই করার সক্ষমতা থাকত না।" আরেক লোক এসে আমাকে বলেছে, "কোন সৈন্য এসে মাঝ রাত দুইটায় দরজায় কাড়া নাড়তো। আমি বের হলে যখন সে আমাকে তার সামনে দেখতে পেত তখন সে বলত, তোমাদের নিকট যদি মাথা ব্যাথার ট্যাবলেট থাকে, আমি মাথা ব্যাথায় কষ্ট পাচ্ছি। সে বলল, আমি জানি বিষয়টি মিথ্যা। সে কড়া নাড়ে যাতে রাতের পরবর্তী সময়ে তার জন্য কোন মহিলা বের হয়।"

সুতরাং অত্যাচারীরা আহলুস সুন্নাহ'র লোকদেরকে দূর্বল করে রাখতো। কিন্তু আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদেরকে অপসারিত করলেন। ফলে মুজাহিদরা এই সকল অত্যাচারীদের থেকে দূর্বল ব্যক্তিদের উদ্ধার করার ক্ষেত্রে মাধ্যম হয়েছেন।

অতএব যুদ্ধের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল- "আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা জালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।" এটাই লক্ষ্য।

এখানে আরো একটি লক্ষ্য হচ্ছেঃ আমরা যুদ্ধ করি। যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ কাফিরদের শক্তি আমাদের থেকে দূরে রাখেন। যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ

আমাদের থেকে এবং সকল মুসলিমদের থেকে কাফিরদের শক্তি দূরে রাখেন। এর দলিল আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -এর এবাণীতে রয়েছেঃ

فَقَاتِلْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَأْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَ اللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّ اَشَدُّ تَنْكِيْلًا ۝ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيْتًا ۝

“সুতরাং আপনি আল্লাহর পথে লড়াই করুন; আপনি আপনার নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কিছুর যিম্মাদার নন এবং মু’মিনগণকে উদ্বুদ্ধ করুন, হয়ত আল্লাহ কাফিরদের শক্তি সংযত করবেন। আর আল্লাহ শক্তিতে অতি প্রবল এবং শাস্তিদানে কঠোরতর। কেউ কোন ভালো কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর নজর রাখেন।”[162]

ইমাম জাসসাস رَحِمَهُ اللَّهُ তার তাফসীরে বলেন, “আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ তার নাবীকে এই আয়াতে জিহাদের আদেশ করেছেন দুইটি উদ্দেশ্যেঃ তিনি তাকে যুদ্ধ করার এবং যুদ্ধে নিজেকে উপস্থিত থাকার আদেশ করেছেন অতঃপর তিনি তাকে জিহাদের মাধ্যমে মু’মিনদেরকে যুদ্ধের ব্যাপারে উৎসাহিত করার আদেশ করেছেন।”

ইমাম কুরতুবী رَحِمَهُ اللَّهُ তার তাফসীরে বলেন, “আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তার রাসুলকে যুদ্ধ করার আদেশ করেছেন। এমনকি যদিও তিনি একা হোন- “সুতরাং আপনি আল্লাহর পথে লড়াই করুন; আপনি আপনার নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কিছুর যিম্মাদার নন এবং মু’মিনগণকে উদ্বুদ্ধ করুন।” আল্লাহর অনুমতিক্রমে সামনে এটাই হবে আপনাদের পালা–আপনারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবেন এবং আপনারা মানুষদেরকেও আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন।

তাই যখন আমরা যুদ্ধ করব এবং যুদ্ধের ব্যাপারে অন্যদেরকে উৎসাহিত

---

[162] সুরা নিসাঃ ৮৪-৮৫

করব - যখন এই কাজটি আমরা সম্পাদন করব তখন কাফিরদের শক্তি আমাদের থেকে দূরে রাখার ব্যাপারে এই কাজটি মাধ্যম হবে। “হয়ত আল্লাহ কাফিরদের শক্তি সংযত করবেন। আর আল্লাহ শক্তিতে অতি প্রবল এবং শাস্তিদানে কঠোরতর।” আপনি যেমন জানেন, কুরআনে "عسى" এর ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বলেছেন, অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ যখন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেন, "عسى" নিশ্চয়ই তিনি "عسى" এর পরে যা উল্লেখ করেন তা বাস্তবায়ন করেন।

আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে এ বিষয়টি সংঘটিত হয়েছে। যখন ইরাকে জিহাদ শুরু হয় তখন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ মুসলিমদের থেকে আমেরিকান সৈন্যদের শক্তি দূর করেছেন। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে এখন একজন সৈন্য ইসলামের দেশগুলোর কোন ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় না। এজন্য আপনি আমেরিকান সেনাপ্রধানদের ধারাবাহিক একেরপর এক বিবৃতি পাবেন - আমরা ইরাক ও শামে পাদাতিক সৈন্য নিয়ে কখনোই প্রবেশ করব না। এটা সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাদের শক্তি আমাদের থেকে দূরে রেখেছেন যখন আমরা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছি।

এই সকল বিমান আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ আমাদের থেকে অবশ্যই দূরে রাখবেন যেহেতু আমরা ঐ সকল মাধ্যম গ্রহণ করেছি যেগুলোর ব্যাপারে তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেনঃ “সুতরাং আপনি আল্লাহর পথে লড়াই করুন; আপনি আপনার নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কিছুর যিম্মাদার নন এবং মু’মিনগণকে উদ্বুদ্ধ করুন।” যখন আমরা যুদ্ধ করব এবং উদ্বুদ্ধ করব তখন অবশ্যই আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ আমাদের থেকে এই বাহিনীর শক্তি দূরে রাখবেন - আল্লাহ তা’আলার অনুমতিক্রমে যা কোন কিছুরই সমতুল্য নয়।

﴿لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى﴾

“সামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।”[163] এটা

[163] সুরা আলে-ইমরানঃ ১১১

বেশি নয়। সুতরাং এটা হল ইসলামে যুদ্ধের লক্ষ্যসমূহের একটি লক্ষ্য।

এখানে আরো একটি লক্ষ্য হলঃ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শত্রুদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করা। আপনি জিহাদ করবেন। এমনকি তাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করবেন। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

وَ اَعِدُّوۡا لَهُمۡ مَّا اسۡتَطَعۡتُمۡ مِّنۡ قُوَّةٍ وَّ مِنۡ رِّبَاطِ الۡخَیۡلِ تُرۡهِبُوۡنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّکُمۡ وَ اٰخَرِیۡنَ مِنۡ دُوۡنِهِمۡ ۚ لَا تَعۡلَمُوۡنَهُمۡ ۚ اَللّٰهُ یَعۡلَمُهُمۡ

"আর তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর; যেমন শক্তি ও ঘোড়া প্রতিপালন, তা দিয়ে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে আর এরা ছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন।"[164] সুতরাং আমরা যখন শক্তি অর্জন করব এবং জিহাদ শুরু করব তখন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ কাফিরদের অন্তরে আমাদের পক্ষ থেকে ভয় ঢুকিয়ে দিবেন। যেমন ইমাম মুসলিম رَحِمَهُ اللهُ বর্ণনা করেছেন, "জেনে রাখো, শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা, জেনে রাখো শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা, জেনে রাখো শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা।"

অতএব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার মাধ্যমে এবং যুদ্ধের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করার মাধ্যমে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এই সকল লোকদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিবেন এবং আমরা ঐ সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হব যাদের ব্যাপারে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন,

﴿لَاَنۡتُمۡ اَشَدُّ رَهۡبَةً فِیۡ صُدُوۡرِهِمۡ مِّنَ اللّٰهِ ؕ﴾

"প্রকৃতপক্ষে এদের অন্তরে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয়ই বেশী।"[165] আপনি শুধুমাত্র আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর মানহাজ এবং তিনি আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর পক্ষ

---

[164] সুরা আনফালঃ ৬০

[165] সুরা হাশরঃ ১৩

থেকে যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন এর অনুকরণ করার মাধ্যমে। আপনি নিরস্ত্র কোন কিছুর মালিক না - আল্লাহর কসম! তারা আল্লাহকে যতটুকু ভয় পায় তার চেয়ে বেশি ভয় পায় আপনাকে। কারণ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেছেন, তিনি "أنتم" এর সাথে অন্য কিছু উল্লেখ করেননি। না তিনি কোন অস্ত্র, সরঞ্জাম ও যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি কেবল বলেছেন, "لأنتم" অর্থাৎ স্বয়ং তোমরা। তারা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ কে যতটুকু ভয় পায় তার চেয়ে তারা বেশি ভয় পায় আপনাদেরকে।

অতএব আমরা যুদ্ধ করব এমনকি আমরা এই সকল লোকদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করব। এই বিষয়টিও আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে ঘটেছে–আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এই সকল লোকদের মুখে নির্ধারণ করেছেন, তারা মুজাহিদদেরকে নাম দিয়েছে 'ইরহাবিয়্যুন তথা ভীতসন্ত্রস্তকারী'। তিনি তাদেরকে অন্য শব্দ নির্বাচন করার সক্ষমতা দেননি। কারণ তারা তাদের অন্তরে এটাই পেয়েছে। তাদের অন্তরে যা রয়েছে তারা মুখে তাই ব্যক্ত করে। ফলে তারা বলে, 'তোমরা সন্ত্রাসী'। আমরা যদি বলি, আমরা এই সকল কাফিরদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করেছি। কিছু মানুষ আমাদের এ কথায় সন্দেহ প্রকাশ করে। ইতিমধ্যে আমরা যার সাথে যুদ্ধ করি সে এসে বলে, 'তুমি আমাকে ভীতসন্ত্রস্ত করেছো।' অতএব এখানে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর বাণীর সত্যায়ন রয়েছেঃ "প্রকৃতপক্ষে এদের অন্তরে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয়ই বেশী।"

এটাও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহের একটি। আপনি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর শত্রুদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করবেন। অথচ আপনি আপনার দেশে বসে আছেন। আমার কথা আপনি আপনার দেশে বসে আছেন- আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর হাদিসের প্রতি ইঙ্গিত করে, যা ইমাম বুখারি رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ জাবির رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেছেন, "আমাকে এমন পাঁচটি বস্তু দান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কাউকে দেয়া হয়নি। এক মাস পথ চলার দূরত্ব থেকে শত্রুর মাঝে ভীতি সঞ্চার করার ক্ষমতা প্রদান করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।...." আমরা ভূপৃষ্ঠের এক প্রান্তে রয়েছি আর আমেরিকা অন্য প্রান্তে রয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে তারা ঘোষণা দেয় এই সকল ব্যক্তিরা সন্ত্রাসী। ফলে আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ -এর বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং আমাদের ব্যাপারে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে আল্লাহর

রাসুল ﷺ -এর কথা সত্য হয়েছে। কিন্তু শর্ত হচ্ছেঃ আমাদের দ্বীনের মধ্যে যা এসেছে তা আমরা গ্রহণ করব।

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সর্বশেষ লক্ষ্যঃ এই দ্বীন হল রহমত।

﴿وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا رَحۡمَۃً لِّلۡعٰلَمِیۡنَ﴾

“আর আমরা তো আপনাকে সৃষ্টিকুলের জন্য শুধু রহমতরূপেই পাঠিয়েছি।”[166]

﴿وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا کَآفَّۃً لِّلنَّاسِ بَشِیۡرًا وَّ نَذِیۡرًا﴾

“আর আমরা তো আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।”[167] সুতরাং এই দ্বীন হল রহমত। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যদি চান তিনি এই দ্বীন পৌঁছাবেন তাহলে অবশ্যই তিনি তা পৌঁছে দিবেন। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর ইচ্ছার একটি হল বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রান্তে এই দ্বীন পৌঁছানোর আমানত আমরা বহন করি। বসে থাকা যথাযথ হবে না। রাসুল ﷺ কে যখন রিসালাতের দায়িত্ব দেওয়া হল তিনি ঘুমাতেন না। আমাদের মা খাদিজা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলতেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি ঘুমাবেন না? তিনি উত্তরে বলেছেন, “হে খাদিজা! ঘুমানোর সময় চলে গেছে।” এই হাদিসের তাখরীজ আমরা পাইনি–আল্লাহ ভালো জানেন।

এটা হল রহমত। এই দ্বীন রহমত। আমি আপনি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমরা এই রহমত ঐ সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিব যাতে আমরা তাদের মুক্তির কারণ হতে পারি।

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

“আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার কাছ থেকে তা

[166] সুরা আম্বিয়াঃ ১০৭

[167] সুরা সাবাঃ ২৮

কখনো গ্রহণ করা হবে না। আর সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”[168] এই আয়াত ইহুদীরা জানে না, এই আয়াত খ্রিষ্টানরা জানে না। এই আয়াত আমি এবং আপনি জানি। আমরা মানুষের অবস্থা জানি তাদের জন্য কী লুকিয়ে রয়েছে। তারা যে বিষয়ের উপর রয়েছে যদি তারা এর উপর অটল থাকে তাহলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ ও জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই আমরা তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য কাজ করব। কিন্তু এই সকল ব্যক্তিদেরকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে আমাদের মাধ্যম হওয়া সম্ভব নয়। কারণ আপনি যেমন জানেন, এই সকল তাগুতদের সৈন্যবাহিনী রয়েছে এবং তাদের শক্তি রয়েছে যা আমাদের মাঝে এবং যারা তাদের পিছনে রয়েছে তাদের নিকট পৌঁছানোর মাঝে অন্তরায় হবে। তাই আমাদের শক্তি প্রয়োজন এবং আমাদের প্রস্তুতি প্রয়োজন। ফলে যখন আমরা এই দ্বীন আমাদেরকে বেষ্টনকারী দেশগুলোতে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করি অতঃপর ভিতর থেকে তাগুতদের সৈন্যবাহিনী আমাদেরকে বাধা দেয় তখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। আমরা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -এর নিকট কামনা করি তিনি যেন আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করেন। যখন আমরা এই তাগুতী শক্তি অতিক্রম করব তখন এই রহমত তাদের পিছনে থাকা ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছানো সহজ হবে।

এমনটিই ঘটেছিল আন্দালুসে। যখন সেনাপতিগণ আন্দালুসে প্রবেশ করে তখন আন্দালুসের শক্তি এই রহমতের সামনে অবস্থান করে। কিন্তু আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তারিক বিন যিয়াদ এবং তার সাথে থাকা মুজাহিদ ভাইদেরকে কর্তৃত্ব দান করেন। তারা শক্তিশালী হয়ে এই শক্তির উপর বিজয় লাভ করেন। এরপর তাদের সামনে অনেক শহর বিজয় হয়। ফলে দুই মাসের মধ্যে আন্দালুসের অধিবাসীরা ইসলামকে আলিঙ্গন করে নিয়েছে। যখন উমাইয়া খলিফাহ’র নিকট এব্যাপারে লিখে পাঠানো হয় যে, দুই মাসের মধ্যে আন্দালুসের অধিবাসীরা ইসলামকে আলিঙ্গন করে নিয়েছে তখন তিনি বললেন, এটা কিয়ামত।

অতএব জিহাদের লক্ষ্য হল আমরা এই সকল শক্তিকে অপসারণ করব যেন

[168] সুরা আলে-ইমরানঃ ৮৫

আমরা তাদের পিছনে থাকা ব্যক্তিদের নিকট এই দ্বীন এবং এই রহমত পৌঁছাতে পারি। আর তগুতের অস্তিত্বের সাথে এবং প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং গোয়েন্দা ও গুপ্তচর বিভাগের উপস্থিতির সাথে আমাদের পৌঁছানো সম্ভব নয় যদি না আমরা তাদের অপসারণ করার শক্তি অর্জন করতে পারি। আর দাওয়াহ এবং দা'য়ীরা কোন কিছুই পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না। যুদ্ধ এবং জিহাদের প্রয়োজন আছে। এগুলো হচ্ছে জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। এই বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ** আমাকে সক্ষম করেছেন। আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং আপনাদেরকে বারাকাহ দান করুন!

এরপর যখন সংবিধান প্রণয়ন কমিটি অপরাধসমূহ নির্ধারণ করে তখন তারা এই অপরাধের ব্যাপারে দণ্ড প্রণয়ন করার যথার্থতা তাদের নিজেদের জন্য অর্পণ করে। পরিমাণ নির্ধারণ করার দিক থেকে, সংখ্যা নির্ধারণ করার দিক থেকে অথবা এছাড়াও অন্যান্য দিক থেকে... অর্থাৎ তারা উক্ত অপরাধের ব্যাপারে দণ্ডের প্রকার নির্ধারণ করে।

উদাহরণঃ সালাত পরিত্যাগ করা অপরাধ নয়; অতএব এর কোন শাস্তি নেই। আইন এর কোন সাজা দেয় না। কারণ সংবিধান প্রণয়ন কমিটি অপরাধসমূহ নির্ধারণ করে। নিশ্চিতভাবেই আপনি যখন ইরাকী সংবিধানে অপরাধ সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন তখন আপনি খুঁজে পাবেন না যে, সালাত পরিত্যাগ করা কোন অপরাধ; অতএব সংবিধান প্রণয়ন কমিটি সালাত পরিত্যাগ করাকে কোন অপরাধ হিসেবে গণ্য করে না। এজন্য তারা এমন ব্যক্তির উপর কোন শাস্তি নির্ধারণ করেনি যে সালাত পরিত্যাগ করে। এটা একটি উদাহরণ।

অন্য আরেকটি উদাহরণঃ দ্বীন পরিবর্তন করা–ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্। একজন মুসলিম ইয়াযিদী হয়ে গেল। ইরাকী সংবিধানে এটাকে কোন অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না। কেন? কারণ এটা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আর গণতন্ত্রের ভিত্তিসমূহের একটি হচ্ছেঃ বিশ্বাসের স্বাধীনতা। অর্থাৎঃ মানুষের ইচ্ছানুযায়ী তারা যেকোনো ধর্ম থেকে মত গ্রহণ করতে পারবে। তাই সংবিধান প্রণয়ন কমিটি ধর্ম পরিবর্তন করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে না; সেক্ষেত্রে এমন কোন মুসলিমের উপর কোন শাস্তি নেই যে তার দ্বীন পরিবর্তন করে অন্য ধর্মে চলে যায়। আর রাসুল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিবর্তন করবে তোমরা তাকে হত্যা কর।"

যিনা-ব্যভিচারঃ কয়েকটি শর্ত ব্যতীত যিনাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না। আর এই সকল শর্ত উদ্ভাবন করেছে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি। তারা বলে যিনা স্বয়ং কোন অপরাধ নয়, সত্তাগতভাবে যিনা কোন অপরাধ নয় যখন শর্তসমূহ পূরণ হবে। আর যখন এই সকল শর্ত থেকে কোন শর্ত ত্রুটিযুক্ত হবে তখন ঐ সময় যিনাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে।।

প্রথম শর্তঃ তারা বলে, নারীটি বালেগা হতে হবে।

দ্বিতীয় শর্তঃ তারা বলে, নারীর সম্মতিতে হতে হবে।

তৃতীয় শর্তঃ তারা বলে, উপযোগী স্থানে হতে হবে–সার্বজনীন নৈতিকতার বিবেচনায়।........